শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

৫-১, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট
কলিকাতা-৯

প্রথম মুদ্রণ—অগ্রহায়ণ, ১৩৭০

প্রকাশক—ময়ূখ বসু
গ্রন্থপ্রকাশ
৫-১ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট
কলিকাতা-৯

মুদ্রাকর—শ্রীরঞ্জনকুমার দাস
শনিরঞ্জন প্রেস
৫৭ ইন্দ্র বিশ্বাস রোড
কলিকাতা-৩৭

প্রচ্ছদ-শিল্পী—শচীন বিশ্বাস

আট টাকা

এই লেখকের ঃ

দেবকন্যা ॥ সিন্ধুর টিপ ॥ নীল সিন্ধু ॥ এ-জন্মের ইতিহাস ॥ জনপদ-বধূ ॥ তীরভূমি ॥ নীলাঞ্জনছায়া ॥ স্বপ্নসঞ্চার ॥ দুই নদী ॥ শ্বেত কপোত ॥ পথ (নাটক) ॥ বিদিশার নিশা ॥ নতুন নাম, নতুন ঘর ॥ এই তীর্থ ॥ সীমাস্বর্গ ॥ জলকন্যার মন ॥ তারুণ্যের কাল ॥ কতো আলোর সঙ্গ ॥ এক আশ্চর্য মেয়ে ॥ আপন মানুষ ॥ মধ্যদিনের গান ॥ নবদ্বীপ ॥ কর্ণাটরাগ ॥

উৎসর্গ

ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কথাশিল্পী

শ্রীবলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় (বনফুল)

শ্রদ্ধাস্পদেষু

আজকের কাল পর্যন্ত ধরলে, উপন্যাসে-বর্ণিত জাতিটির সুদীর্ঘ দেড়শো বছরের ইতিহাস এ আখ্যায়িকার পশ্চাৎপটে বিধৃত। এরা বিচিত্র মানসিকতার শিবিরে দাঁড়িয়ে বহিরাগত ও অন্তরাগত দুই প্রবল সামাজিক শত্রুতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে গেছে, কোথাও একক ভাবে, কোথাও সমষ্টিগত ভাবে। বহিরাগত শত্রুতা হচ্ছে, এদের শ্রেণীবিহীন সমাজে শ্রেণীর উত্থান-প্রয়াস ইত্যাদি। এবং অন্তরাগত শত্রুতা হচ্ছে, কুসংস্কারের আনুগত্য প্রভৃতি। শিশুসন্তান-বিসর্জন এদের কাছে এখন ইতিহাস মাত্র, কিন্তু স্ত্রীলোকের বহু পতিগ্রহণ আজও অনেকাংশে বর্তমান। অথচ, প্রখ্যাত নৃতত্ত্ববিদ্ মর্গ্যান-সাহেব যাকে 'পুনালুয়া'-বিবাহ বলেছেন, এ তা নয়। এমন কি মাতৃতান্ত্রিক-সমাজ-উদ্ভূত 'স্ত্রী-স্বাধিকার'ও এ নয়। এদের সমাজ ও যৌন-ধারণার এক বিশিষ্ট রূপ লক্ষ্য করা যায়, যেটা মর্গ্যান বা তাঁর সাক্ষাৎ-শিষ্যরা কোথাও বিশ্লেষণ করেছেন বলে আমার জানা নেই।

কিন্তু, সে আলোচনা থাক। বিশ্বব্যাপী যে Totalitarianism-এর উত্তাল তরঙ্গ প্রবহমান, তাতে করে কতো জাতির যে অবলুপ্তি ঘটবে, তার ইয়ত্তা নেই। সম্ভবত এটাই ইতিহাসের অমোঘ বিধান। ইতিমধ্যেই বহু খণ্ডজাতি অবলুপ্তপ্রায় হয়েছে, আমাদের ভারতবর্ষে—দাক্ষিণাত্যের এই 'টোডাজাতি'ও তার মধ্যে অন্যতম। এদের জীবন-দর্শন বহুলাংশেই গ্রহণীয় নয়, কিন্তু যাঁরা আগামী যুগের জন্য সর্বসংস্কারমুক্ত এক সুস্থ ও বৈজ্ঞানিক তথ্যভিত্তিক বলিষ্ঠ সমাজ-জীবনের স্বপ্ন দেখছেন, তাঁদের দৃষ্টিকোণ থেকে এদের বৈশিষ্ট্য লক্ষ্যভ্রষ্ট হতে পারে না। এবং সেই বিশ্বাসই আমাকে সাহসী করেছে এই অখ্যাত অজ্ঞাত Nomadic জাতিটিকে নিয়ে উপন্যাস-রচনায়। সাফল্য কতখানি লাভ করেছি জানি না, সে বিচার করবেন সহৃদয় পাঠক-পাঠিকা ও সমালোচকবৃন্দ,—আমি আমার আন্তরিকতার কথাটুকুই শুধু সসংকোচে নিবেদিত করলাম।

শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

আদি

মনে হলো, অতিকায় বনস্পতির দল অরণ্য থেকে উঠে এসে তার চার পাশে ভীড় করে দাঁড়িয়েছে! তাদের উপত্যকা থেকে 'দোদাবেতা'র পর্বত-শীর্ষের দিকে তাকালে সবার আগে ঝাঁকড়া-মাথা বহুকালের যে প্রাচীন বনস্পতিটি চোখে পড়ে, মনে হলো, তার শিয়রের কাছে দাঁড়িয়ে ক্রুদ্ধ ক্ষুব্ধ নিঃশ্বাস ফেলছেন, সেই তিনিই! 'টারথারল'দের গাঁও-বুড়ো সেই যে হিন্দুদের গল্প বলতো নানান রকম, সেই সব গল্পের মুনিঋষিরা যেন প্রলম্বিত জটাজাল নিয়ে রক্তচক্ষু মেলে তাকিয়ে আছেন তার দিকে, বলছেন—দে, শীগগির দিয়ে দে!

বনস্পতির দল চার পাশ থেকে যেন সগর্জনে বলতে শুরু করেছেন—আমাদের জিনিস, আমাদের ফিরিয়ে দে!

—'না-না'—বলে চীৎকার করে কেঁদে উঠলো মেয়েটি।

আর সঙ্গে সঙ্গে, হিন্দুদের সেই সব প্রবৃদ্ধ ঋষি-সম্প্রদায়, তাদের উপত্যকা-প্রহরী বনস্পতি-নিচয়, সবাই যেন মিলিয়ে গেল অন্ধকার অমানিশায়! শুধু ঘরের দরজার ফাঁক দিয়ে যেটুকু আকাশ দেখা যায়, সেটুকু আকাশের-গায়ে-লেগে-থাকা-স্তিমিত-চক্ষু নক্ষত্রের-দল,—হঠাৎ যেন চমক ভেঙে জেগে উঠলো, প্রশ্ন করলো—কী হয়েছে?

ঘরের বাইরে থেকে ঘুমন্ত মানুষের প্রশ্বাস শোনা গেল, মনে হলো, নিশীথ রাত্রে মাঠের মাঝখানে ফণা উঁচু করে কতগুলি সাপ যেন প্রাণ ভরে বাতাস টেনে নিচ্ছে!

প্রচণ্ড ভয়ে আর আতঙ্কে মেয়েটি উঠে বসেছে, তার হাত-পা যেন ঠাণ্ডা হয়ে গেছে, বুকের নীচে ফুস্‌ফুস্ দুটো যেন কাজ করছে না,—এই মুহূর্তে চেতনা হারিয়ে বুঝি আবার তার চাটাইখানার ওপরে লুটিয়ে পড়বে মেয়েটি!

কিন্তু, ছোট্ট দরজার বাইরে আকাশের পটে জেগে থাকা বড়ো যে

তারাটি স্নিগ্ধ স্নেহ-ঝরা দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে, সে বললে—ভয় নেই। ভয় কী?

আর তারপরেই যেন রক্ত-চলাচল শুরু হলো মেয়েটির সর্বশরীরে, ফুসফুস্ ছুটো আবার কার্যকরী হয়ে উঠল, শক্তি যেন ফিরে এলো তার ছুটি বাহুতে আর করপল্লবে! সঙ্গে সঙ্গে একটু ঘুরে বসল মেয়েটি, তার পাশটিতে এতক্ষণ ধরে রক্তমাংসের যে ছোট পুতুলটি ঘুমুচ্ছিল, তাকে সন্তর্পণে তুলে নিলো ছুটি হাতে। নিয়ে, বুকের কাছে চেপে ধরলো। যেন বুঝে নিতে চাইলো প্রাণ-স্পন্দন স্তব্ধ হয়ে গেছে কি না! 'বনস্পতি'-রূপ মুনির দল তার কাছ থেকে সত্যিই কি কেড়ে নিয়েছে তার নাড়ি-ছেঁড়া মানিকটিকে?···না-না, ঐ ত সে নড়ছে! ঐ ত সে মুখ ঘষে ঘষে খুঁজে নিয়েছে তার অমৃত-নির্ঝরের উৎস-মুখ!

আঃ! সমস্ত শরীর মন যেন একটা তৃপ্তির তরঙ্গে ভরে গেল মুহূর্তে! বিন্দু বিন্দু সুধা-ক্ষরণের মধ্য দিয়ে যে অব্যক্ত আনন্দ ধ্বনি জেগে উঠছে তার দেহ-মন-প্রাণ-বল্লরীর তারে তারে, তার তুলনা কোথায়? ধীরে ধীরে স্তিমিত নয়নে আবার ধ্যানমগ্ন হয়ে গেল তারকার দল, বাতাসে বাতাসে শিশু ঘাসের সৌগন্ধ আবার উঠলো জেগে! সমস্ত উপত্যকাটি তার বনস্পতিসম্ভার নিয়ে স্তব্ধ বিস্ময়ে দেখতে লাগলো এই দৃশ্য, যেন অরণ্যের আদিবাসী ইরুলার দল 'কুরুম্বা'দের কাছে শক্তি পরীক্ষায় হেরে গিয়ে দূরে ভীড় করে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নিরীক্ষণ করছে কুরুম্বাদের বিজয়োল্লাস।

মাসখানেক মাত্র বয়স হয়েছে পুতুলটার, কিছুক্ষণের মধ্যেই সে আবার ঢলে পড়লো নিদ্রার গহনে। আর তাকে চাদরের পুঁটুলীতে বেশ করে ঢেকে নিয়ে উঠে দাঁড়ালো মেয়েটি। আকারে বর্তুল অথচ মাথায় লম্বা তাদের ঘরখানা ছুভাগে ভাগ করা। ঘরের যে অংশে শিশুটিকে বুকে করে সে ঘুমুচ্ছিল, সে ঘরে সমর্থ নারী বলতে সে একাই; অন্য ঘরে ঘি-তৈরী করার হাঁড়িকুড়ির মধ্যে শুয়ে আছে বাড়ীর পুরুষেরা। ওখানে মেয়েদের ঢুকতে মানা।

তবু পায়ে পায়ে ওদের বেড়ার কাছ পর্যন্ত এলো মেয়েটি। সাপের মতো হিস্ হিস্ নিঃশ্বাস স্পষ্ট শোনা যায়, দুটো সাপ পাশাপাশি ফণা তুলে যেন প্রাণভরে নিঃশ্বাস নিচ্ছে, দুটি সাপ নয়, দুটি সাপের মতো মানুষ—একটি বুড়ো, অন্যটি জোয়ান। একটি তার শ্বশুর, অন্যটি—স্বামী। এক মাস হয়ে গেছে, আর মানুষ দুটি ধীরে ধীরে সাপের মতো হতে শুরু করেছে। সন্তান হলো তার। সন্তান হবার আগে পর্যন্ত স্বামীর আর আহ্লাদের অন্ত ছিল না, শ্বশুরের দন্তহীন গম্ভীর মুখেও হাসির রেখা ফুটে উঠত। স্বামী তাকে সোহাগ করে ডাকতো—ছেলের মা।

খুশীই হতো সে, কিন্তু দিন যত আসন্ন হয়ে আসতে লাগলো শিশু-আবির্ভাবের, ততই মনটা তার অজানা এক আশঙ্কায় ভরে উঠতে থাকলো,—যদি মেয়ে হয়? প্রথম সন্তান মেয়ে হলে তাকে যে ওরা মায়ের বুক থেকে ছিনিয়ে নিয়ে গিয়ে স্বর্গের দ্বারে রেখে আসবে! তারপরে স্বর্গের দ্বার থেকে শিশুটাকে নিজের হাতে তুলে নেবেন স্বর্গের দেবতা। সেই পুণ্যে তাদের সমস্ত জাতটারই নাকি কল্যাণ হবে, মাঠে মাঠে ঘাস হয়ে উঠবে আরও সতেজ, মহিষের দলে মড়ক লাগবে না, পালিত মহিষের দলও যাবে বহুগুণ বর্ধিত হয়ে!

আর তা যদি না হয়, সন্তান-অর্ঘ্য যদি না দেওয়া হয় দেবতার পায়ে? দেবতার রোষে সমস্ত জাতটাই যে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। একথা শুনে সে যুগের কোন্ মেয়ে না ভয় পাবে? এবং তারপরে, যখন সত্যসত্যই মেয়েটির কোলে এলো কন্যা, তখন ভয়টা যেন পাষাণের মতো বুকের ওপর চেপে বসলো! দিন চার পাঁচ পরে, যখন সে নিজে একটু বল পেলো দেহে, তখন স্বামীর সঙ্গে কথা বলতে বলতে ও হঠাৎ একসময় বলে উঠেছিল—মেয়ে আমি দেবো না! তার স্বামী তৎক্ষণাৎ কানে আঙুল দিয়ে আতঙ্কিত কণ্ঠে বলেছিল—বলিস না ও কথা! সর্বনাশ হয়ে যাবে!

সংস্কারকে সংস্কার বলে আজকের মানুষ যতটা চিনতে পেরেছে,

তখনকার দিনে, অর্থাৎ প্রায় দেড়শো বৎসর আগেকার ভারতবর্ষের দক্ষিণ অঞ্চলের পার্বত্য উপত্যকা, নীলগিরি, তাতে বসবাসকারী এই আদিবাসী সম্প্রদায়, এরা তা হৃদয়ঙ্গম করবে কী করে ? যে সময়কার কথা নিয়ে কথারম্ভ করা গেছে, তখন বাংলাদেশ থেকে সতীদাহ প্রথা একেবারে লুপ্ত হয়ে যায়নি, তখনো বাংলাদেশে রথের মেলায় জুয়া খেলে সর্বস্বান্ত হয়ে নিজের স্ত্রীকে পর্যন্ত বিক্রী করে দিতে দ্বিধা করেনি মানুষ !

স্বামীর সর্ববিধ উপদেশ শোনবার পর মেয়েটি কিছুক্ষণ পর্যন্ত নীরব ছিল। তারপরে এক সময় বলে উঠেছিল—কোথায় ওকে নিয়ে যাবে ?

—ওম্ নোড় (স্বর্গে)

—কোথায় ওম্ নোড় ?

স্বামী একটু অবাক হয়েই ওর মুখের দিকে তাকিয়েছিল, বলেছিল, ওম্ নোড় কোথায়, তা-ও জানিস না ? মুকের্তি পাহাড়ের চূড়াট দেখেছিস ? ঐ চূড়াটা পার হলেই—ওম্ নোড়ের দুয়ার ! তোর কুথ্‌টাকে (মেয়েটাকে) শুভদিন দেখে বাবা রেখে আসবে ঐখানে।

আর্তকণ্ঠে মেয়েটি বলেছিল—ও বাঁচ্‌বে !

—বাঁচা না বাঁচা টেরের (দেবতার) হাত ! তিনি তুলে নেবেন।

—ঐটুকু দুধের বাচ্চা, ও খাবে কী ?

—সে-ও টের (দেবতা) দেখবেন।

আতঙ্কিত হয়ে কঁকিয়ে কেঁদে উঠেছিল মেয়েটি। বলেছিল—ও আমার বুকের দুধ না পেয়ে মরে যাবে !

পাথরের মূর্তির মতোই ভাবলেশহীন স্বামীর মুখ, সে বলেছিল—ওসব ভাবলে ত চলবে না ? তোর কুথ্‌টা (মেয়েটা) বড়ো, না, আমাদের জাতের সব মানুষগুলো বড়ো ?

মেয়েটি কান্না থামিয়ে বলেছিল,—আমি যাবো ওর সঙ্গে। যতক্ষণ না দেবতা নিজে এসে ওকে তুলে নেন, ততক্ষণ আমি ওকে কোলে করে বসে থাকবো, ওর খিদে পেলে ওকে খাওয়াবো।

—সর্বনাশ!—স্বামী তখন কানে আঙুল দিয়েছিল, বলেছিল—কোন মেয়েছেলেই ওখানে যেতে পারে না, যেতে দেয়ও না গাঁও-বুড়ো।

—কেন!

স্বামী উত্তর দিয়েছিল—জানিস না, ঐ মুকের্তি-পাহাড়ের চূড়াটা কেমন করে হলো? বুড়োদের কাছ থেকে কখনো শুনিসনি? কে এক মেয়েছেলে তার বাচ্চা-মেয়েটার পিছনে পিছনে ওখানে গিয়ে হাজির হয়েছিল লুকিয়ে লুকিয়ে। কিন্তু, টেরের রাগের ভয় কার না আছে? মেয়েছেলেটার নাক কেটে দেওয়া হয়েছিল। সেই থেকে সে ঐ মুকের্তি-পাহাড়ের 'চূড়া' হয়ে গেছে!

মুকের্তি-পাহাড়ের চূড়া দূর থেকে দেখা যায়। স্বামীর সঙ্গে এসব কথাবার্তা হবার পর যত দিন যেতে লাগলো, যত আসন্ন হয়ে উঠতে লাগলো সেই সর্বনাশা 'শুভদিন', ততই যেন বিভীষিকার মতো দেখা দিতে লাগলো ঐ মুকের্তি-পাহাড়ের চূড়া! জন্ম নেওয়া মাত্রই শিশুর 'শুভদিন' আসে অন্যান্য ক্ষেত্রে। কিন্তু প্রবল বর্ষণ আর দিনক্ষণ বুঝি ভালো না থাকায় তার ব্যাপারে 'শুভদিন' এলো দেরীতে, এই যা রক্ষা। কিন্তু রক্ষাই বা কিসের? তাদের জাতের সর্দারদের অনুশাসন চিরকাল মুখ বুজে সয়ে গেছে মেয়েরা, আজ সে নিজে কিভাবে দাঁড়াবে এর বিরুদ্ধে, আর কেনই বা দাঁড়াবে?

ক্রমাগত নিজের মনে চিন্তা করে চলেছে মেয়েটি, আর শিশুটিকে বুকের কাছে আঁকড়ে ধরে রেখেছে, মুহূর্তের জন্যও ওকে কাছ ছাড়া করতে তার ভয়! কিন্তু আগামী কাল? আগামী কাল সূর্য ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই ত শ্বশুর ওকে তুলে নেবে নিজের কোলে, তারপরে চলতে আরম্ভ করবে স্বর্গের দ্বার, ঐ মুকের্তি-পাহাড়ের দিকে। সেখানে

—ঐ পাহাড় আর বনস্পতি, ওদের আশ্রয়ে রেখে আসবে শিশুটিকে, সেখান থেকে দেবতা ওকে তুলে নেবেন নিজের হাতে।

কিন্তু, কেন নেবেন? দেবতারা কী করবেন তার এই শিশুটিকে নিয়ে? কত নিশ্চিন্তে মায়ের বুকের উত্তাপে বিলগ্ন হয়ে ঘুমিয়ে আছে তার শিশু কন্যা, ও কি জানে ও বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে মায়ের কাছ থেকে?

কী এক দুর্জয় প্রেরণায় উদ্বেল হয়ে ওঠে ওর বুক। প্রতি কাজেরই কোনো না কোনো এক কারণ থাকে। সে কারণ কখনো থাকে প্রত্যক্ষে, কখনো পরোক্ষে, কখনো বাইরে, কখনো ভিতরে। ক্রমেই-দরিদ্র-হয়ে-পড়া এক বাড়ীর বধূ হয়ে এসেছিল মেয়েটি। শ্বশুর আর স্বামী যথাসাধ্য করে, তবু অবস্থা অসচ্ছল হয়ে আসতে থাকে দিনের পর দিন। তাদের জাতের একমাত্র জীবিকা—পশুপালন। আর সেই পশু হচ্ছে—একমাত্র মহিষ। মহিষ ছিল তাদের পাঁচটি। একটি রোগে গেছে, আর দুটি গেছে দেনার দায়ে। সম্পদের মধ্যে এখন মাত্র দুটি মহিষ আছে তাদের। যেটুকু দুধ পাওয়া যায়, তার থেকে মাখনই বা হয় কতটুকু, এবং সেই মাখন গলিয়ে ঘি-এর পরিমাণই বা হয় কত? তাদের জাতের মানুষগুলো অনেকটা যাযাবরের মতো, ধানচাষ করা বা হাঁড়িকুড়ি বানানো, এর কোনোটাই করে না তারা। প্রতিবেশী 'বাদাগা' বা 'কোটা'দের কাছ থেকে তারা ঘি বা মাখনের বিনিময়ে ঐ সব অত্যাবশ্যকীয় জিনিস-পত্র কিনে নিয়ে আসে। কিন্তু, তার স্বামী বা শ্বশুর কতটা আনতে পারছে আজকাল?

আকাশের তারাগুলো যেন একে একে ঘুমিয়ে পড়তে লাগলো। অন্তরালে আকাশের এককোণে কে যেন অতিকায় কোনো মশাল জ্বালবার ব্যবস্থা করছে,—ধীরে ধীরে অন্ধকার ঘুচে গিয়ে আলোর রশ্মি বিচ্ছুরিত হচ্ছে! না-না, আর দেরী নয়, তাকে এখুনি বেরিয়ে পড়তে হবে

পা টিপে, পা টিপে, আস্তে আস্তে, মেয়েটি বেরিয়ে এলো। কোলে তার শিশুকন্যা। বাইরে এসেই সে চারিদিকে একবার ফিরে তাকালো। বুড়ো প্রধানদের ঘরটা প্রায় ওদের পাশেই, যদি জানতে পারে? যদি জানতে পারে সে তার শিশুকন্যাকে নিয়ে পালিয়ে যাচ্ছে, তাহলে হয়ত ভীষণ ক্রোধে ক্ষেপে গিয়ে ডাইনী সাব্যস্ত করে পাথরের টুকরো ছুঁড়ে ছুঁড়ে তাকে মেরেই ফেলবে।

ভয় পেয়ে সে শিশুটাকে বুকের কাছে নিবিড় করে চেপে ধরে, একটু নড়েচড়ে ওঠে শিশুটি, কেঁদেও ওঠে বুঝি!

—চুপ-চুপ!—তাড়াতাড়ি ওকে শান্ত করতে করতে কোনক্রমে প্রধানদের ঘরটা পেরিয়ে গিয়ে থমকে দাঁড়ায় ত্রস্তা হরিণীর মতো।

মনে হলো প্রধানের গম্ভীর কণ্ঠস্বর তার কানে এলো—কে যায়?

দূরের পাহাড়ে-পাহাড়ে যেন ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হতে থাকে—কে যায়—কে যায়?

কিন্তু না, তার মনেরই ভুল। প্রধান জাগেনি, প্রধান টেরও পায়নি। তার নিজেরই মনের আতঙ্ক তার পিছনে পিছনে তাড়া করে আসছে—কে যায় কে যায়?

ওদের জাতের গ্রামগুলো খুব ছোট ছোট। তিনখানা চারখানা কি পাঁচখানা, পাশাপাশি ঝুপড়ি নিয়ে এক একখানি গ্রাম। কিছুটা প্রান্তর, তারপরে পাহাড়, তারপরে হয়ত দুটি কি তিনটি ঝুপড়ি সমষ্টি। মেয়েটি তাদের গাঁ ছেড়ে পাহাড়ী উঁচু নীচু পথ ধরে ছুটতে লাগলো।

খানিকটা উঁচুতে ওঠবার পর সে যখন দম নিচ্ছে, তখন হঠাৎ চোখে পড়ে গেল মুকেত্তি-পাহাড়ের চূড়াটা!

আতঙ্ক যেন দ্বিগুণিত হয়ে উঠলো ওর অন্তরে। বাচ্চাটাকে বুকের ওপর চেপে ধরে সে তাদের জাতের দেবীর নাম উচ্চারণ করলো—'টিয়েক-ভ্রি'।

যেন বলতে চাইলো—ওগো দেবী, ওগো মা, আমার বাচ্চাটাকে তুমি বাঁচাও, ওকে রক্ষা করো।

পাহাড়ের গায়ে-গায়ে, কন্দরে কন্দরে একটা শব্দ কয়েক মুহূর্ত বিঘূর্ণিত হয়ে ফিরতে লাগলো—ঈ—ঈ।

আর তারপরেই পূর্ব দিগন্তে আরক্তিম ছটা জাগলো স্পষ্ট হয়ে। একটা 'টি-টি' পাখী চীৎকার করতে করতে উড়ে গেল বন থেকে বনান্তরে। যেন নির্দেশ দিয়ে গেল পাখীটা—এই দিকে, এই দিকে!

মেয়েটি পাহাড়ী পথের বাঁকটা পেরিয়ে একটা উৎরাই পথে দ্রুত নীচে নামতে লাগলো।

এবার সে তাদের গাঁয়ের সম্পূর্ণ আড়ালে পড়েছে, আর কেউ তাকে দেখতে পাবে না তাদের গাঁ থেকে।

চলতে চলতে ক্লান্ত হয়ে একটা ক্ষীণ ঝরণার ধারে বসলো সে। মেয়েটাকে স্তন্যপান করালো। একটা সারস পাখী কোথা থেকে উড়ে এসে বসলো স্রোতস্বতীর পরপারে, লম্বা আর তীক্ষ্ণ চঞ্চু বাঁকিয়ে বুঝি অবাক হয়ে দেখতে লাগলো মা ও মেয়েকে।

তারপরে গম্ভীর স্বরে ডেকে উঠলো—ক—ক?

অর্থাৎ কে তুমি? ওখানে বসে কী করছো?

ভয় পেয়ে আবার উঠে দাঁড়ালো মেয়েটা। শুরু হলো আবার তার পথচলা।

কিছুক্ষণ পরে আবার একটু ওপরে উঠে উপত্যকার এমন একটা জায়গায় সে পৌঁছলো—যেখান থেকে দুটি পথ দুটি দিকে প্রসারিত হয়ে গেছে।

নীচেও নেমে গেছে তৃতীয় একটা পথ, যেটা ধরলে সে 'বাদাগা' বা 'কোটা'দের গাঁয়ে গিয়ে পড়তে পারে। কিন্তু তারা ত তাদের এই 'টোডা' জাতের রীতিনীতির বিরুদ্ধে যাবে না কখনো, তারা যে 'টোডা'দের বন্ধু। তাকে ধরে আবার তাকে নিয়ে গিয়ে ফিরিয়ে দিয়ে আসবে তাদের গাঁয়ে—তার স্বামী আর শ্বশুরের আশ্রয়ে।

মেয়েটি ভয় পেয়ে অন্য পথটি আশ্রয় করলো এবার। এ পথে পড়বে আরও টোডা-গ্রাম, সেখানকার মানুষরাও তাকে দেখতে পেলে ছাড়বে না, ধরে বেঁধে ঠিক পাঠিয়ে দেবে শ্বশুরের কাছে। তাহলে কী করবে সে? কার ওপর সে ভরসা রাখবে?

ভাবতে ভাবতেই এগিয়ে যাচ্ছিল মেয়েটি, হঠাৎ এক সময় কার বা কাদের পায়ের শব্দে থমকে দাঁড়ালো। তারপরে একটু সরে গাছের আড়ালে যাবে কি যাবে না স্থির করতে করতেই গোটা কয়েক মহিষকে চালনা করে তার দৃষ্টিপথে এসে পড়লো লোকটি। তাকে দেখে সে-ও বুঝি চমকে গেল, মহিষগুলোকে এগিয়ে যেতে দিয়ে সে ধীরে ধীরে কাছে এসে দাঁড়ালো তার; লোকটি তার স্বামীর বয়সীই হবে, লম্বা-লম্বা চুল মাথায়, কম্বলের মতো মোটা একটা চাদর জড়ানো সর্বাঙ্গে, হাতে ছোট্ট একটা পাঁচনবাড়ি।

লোকটি অবাক হয়ে বললে—টুরা!

মেয়েটির নাম টুরাই বটে।. তাহলে বুঝতে হবে, তাকে সে চিনতে পেরেছে, এতদিনের কথা হয়ে গেছে, তবু মনে রেখেছে তাকে।

হঠাৎ আশার একটা ক্ষীণ দীপশিখা জ্বলে উঠলো মেয়েটির অন্তরে। সে চাপা কণ্ঠে আগ্রহের সঙ্গে বলে উঠলো—আমাকে তোমার ঘরে নেবে?

বিস্ময়ের কিছু নেই, গিরি-কন্দর-নিবাসী আদিবাসী তারা, তাদের মধ্যে অহেতুক সংকোচ আর লজ্জা নেই, এ ধরনের প্রস্তাবের দিক থেকেও তারা সহজ সরল এবং ঋজু।

লোকটি কিন্তু ওর কথা শুনে আরও অবাক হলো। সে বললে—তোর কোলে ওটা কী?

ছলছল চোখে মেয়েটি বললে—আমার বাচ্চা।

—মুখ্ (ছেলে)?

—না, কুখ্ (মেয়ে)।

লোকটির চোখ দুটি বিস্ফারিত হলো, সে বললে—কোথায় চলেছিস ওকে নিয়ে?

—পালাচ্ছি।

—কোথায়?

—যেখানে লুকিয়ে থাকতে পারবো।

—কেন?

মেয়েটি এবার স্পষ্টতঃই কেঁদে ফেললো, বললে—ওরা আমার বাচ্চাকে মেরে ফেলবে।

—কেন?

—এ যে কুখ্! (মেয়ে)

—প্রথম সন্তান?

—হ্যাঁ।

লোকটি মিশ্রিত বিস্ময় ও আতঙ্কে বলে উঠলো—কী সর্বনাশ! ও ত টেরের (দেবতার) জিনিস! দে আমার কোলে, আমি প্রধানের কাছে দিয়ে আসি।

—না-না!—যেন বাঘিনীর মতোই গর্জন করে একটু সরে দাঁড়ালো মেয়েটি।

লোকটি বললে—সে কী? তুই নিয়ম মানবি না? না মানলে আমাদের জাতটাই যে শেষ হয়ে যাবে।

—হোক শেষ!—মেয়েটি দুঃসাহসিনীর মতোই বলে উঠলো,—আমার বাচ্চাকে আমি কিছুতেই দেব না।

লোকটি নির্বাক বিস্ময়ে ওর দিকে তাকিয়ে থাকে ফ্যাল ফ্যাল করে। তাদের জাতের মধ্যে একটা প্রথা আছে, দারিদ্র্য-কষ্ট অসহ্য হয়ে পড়লে অনেকে তাদের স্ত্রীকে কিছু দিনের জন্য বাঁধা দিয়ে বসে। ঋণ শোধ করে পরে আবার স্ত্রীকে ফিরিয়ে নিয়ে যায় স্বামী। টুরার ক্ষেত্রেও তাই হয়েছিল মাস ছয় সাত আগে। তার শ্বশুর এই লোকটিকেই একদিন এনেছিল তাদের বাড়ী, তার স্বামী-শ্বশুরের সঙ্গে অনেকক্ষণ ধরে নিভৃতে আলাপ করেছিল লোকটি। কথা ছিল, মাস পাঁচ-ছয় তার ঘরে গিয়ে থাকবে টুরা, বিনিময়ে ভালো একটা মহিষ

দেবে সে তার স্বামী-শ্বশুরকে। কিন্তু, লোকটি চলে যাবার পরে তার স্বামী যখন তার কাছে এসে বসলো, তার মুখের দিকে তাকিয়ে টুরারই বুকটা ব্যথায় টনটন করে উঠেছিল। মুখখানা তার পাংশু হয়ে গেছে, চোখ তুটিও যেন ছলছল করছে। বলেছিল—তুই কি সত্যিই চলে যাবি ?

টুরা বলেছিল—বারে, আমি যাব কেন ? তোমরাই ত পাঠাচ্ছ।

স্বামী আর কিছু বলেনি, মুখ নীচু করে নিঃঝুম হয়ে বসে ছিল।

আর, তার সেই সেদিনের অমন করে বসে থাকার ভঙ্গিটা দেখতে দেখতে তার স্বামীর বড়ো ভাইয়ের কথা মনে পড়ে গিয়েছিল হঠাৎ। তার শ্বশুরের ছিল তুই ছেলে। আসলে বড়ো ছেলের সঙ্গেই বিয়ে হয়েছিল টুরার। ওদের জাতের মধ্যে বড়ো ভাই-ই বিয়ে করে, বাকী ভাইগুলো সাধারণ নিয়মেই মেয়েটির স্বামী হয়ে যায়। এই-ই ওদের চিরাচরিত প্রথা। টুরার যে সত্যিকার স্বামী, অর্থাৎ তার শ্বশুরের বড়ো ছেলে, বুনো মহিষকে ধরতে এবং পোষ মানাতে ছিল বিশেষ কুশলী। সেই সুগঠিত বাহু তুটি, অদম্য সাহস আর কেমন যেন বন্য স্বভাবের মানুষ, তার কথা কখনো-সখনো মনে পড়ে যায় বইকি টুরার। তাদের জাতের প্রধান তুটি শাখা,—টারথারল, আর টিভালিয়ল। এই টিভালিয়ল গোষ্ঠীর একটি মানুষ ছিল সেই বুনো লোকটির ঘনিষ্ঠ বন্ধু, মহিষ ধরার কাজে সে ছিল সমান কুশলী। পাথরের বড়ো গোলাকার চাঁই যোগাড় করে সেগুলি গড়িয়ে গড়িয়ে ছুঁড়ে ছুঁড়ে এক রকমের খেলার প্রথা আছে তাদের জাতের পুরুষদের মধ্যে, সেই খেলাতেও তুই বন্ধু ছিল সবার সেরা। তুই বন্ধুর মধ্যেই ভাগাভাগি হার জিত চলতো। টিভালিয়লদের সেই লোকটি যেমন ছিল তেমনি আছে, কিন্তু তার শ্বশুরের বড়ো ছেলে আর বেঁচে নেই। বুনো মহিষ ধরতে গিয়ে পাথর হড়কে পড়ে যায়, আর সেই অবস্থায় উঠে বসবার আগেই ক্রুদ্ধ বুনো মহিষের পায়ের চাপে আর সিংয়ের গুঁতোয় তার নাড়িভুঁড়ি সব ছিঁড়ে যায়, মাথাও ভেঙে যায়। তার

পরও খানিকক্ষণ বেঁচে ছিল সে। টুরাকে সবাই নিয়ে গিয়েছিল দেখাতে।

তার দিকে স্তিমিত চোখ দুটি ফিরিয়ে ঠোঁটের কোণে হাসি এনে বলেছিল—চললাম। 'পুরুসুৎপুমি' আর করা হলো না।

'পুরুসুৎপুমি'ও তাদের মধ্যেকার একটা প্রথা। তীর ধনুক নিয়ে একটা অনুষ্ঠান করতে হয়। যে সেটা করবে সে-ই হবে বধূর সব সন্তানের জনক। মেয়েটি যতই পতি গ্রহণ করুক না কেন, তার সন্তান ওই অনুষ্ঠানকারীরই সন্তান বলে সমাজে পরিচিত হবে। কোন সন্তান তখনও আসেনি টুরার পেটে, তবু লোকটির সখের অন্ত ছিল না। বলত—আমিই করব 'পুরুসুৎপুমি'। সে সখ লোকটির আর মেটেনি। শ্বশুরের ছোট ছেলেই তারপরে হয়ে দাঁড়ালো তার একমাত্র স্বামী। এই স্বামীরই ঔরসজাত কন্যা এখন তার বুকে ; কিন্তু 'পুরুসুৎপুমি'ও করা হলো না, কিছুই করা হলো না,—কন্যা হয়ে যেতে বসেছে দেবতার বলি।

তার এই স্বামী সেদিন তাকে অন্য ঘরে আর যেতে দেয়নি, চরম দারিদ্র্য স্বীকার করেও সে তার স্ত্রীকে কাছে রাখবার চেষ্টা করেছে, কখনো বলেছে—আমি বনে যাব, বুনো মোষ ধরে নিয়ে আসবো।

—একা ?

—না দাদার সেই বন্ধু—বিম্বুর সঙ্গে।

—বিম্বু কোথায় থাকে ?

হাত দিয়ে দূরে দেখাতো, বলতো—ওই দূরে—পাহাড়ের কোলে—একা একটা ঘরে থাকে।

—দ্বিজান্ (বউ) নেই ?

—ছিল। বাঁধা দিয়েছে একটা লোকের কাছে, আজ বছর দুই হয়ে গেল।

—আনেনি ফিরিয়ে ?

—কী করে আনবে ? পয়সা জমায় ? না, কি 'এড়' (মোষ) ধরে ? একটা মোষ আছে ঘরে, সেই দিয়েই যা পায় তা-ই খায়, তাতেই খুশী। বলে, বেশীতে দরকার কী ? বেশ আছি। মোষ পর্যন্ত ধরতে যায় না, বুঝলে ? বলে, কে আর আছে ? কার সঙ্গে ধরতে যাবো ?

এই সব ছবি টুরার চোখের সামনে কয়েক মুহূর্তের জন্য ভেসে ওঠে, আবার মিলিয়ে যায়। লোকটির কথায় এক সময় যেন চমক ভাঙে টুরার। লোকটি বলে—আমার ঘরে তোকে আমি নিতে রাজী।

—রাজী !

—হ্যাঁ।

—তবে চল্।

লোকটি বলে—কিন্তু, বাচ্চাটাকে নেবো না। তাকে তুই ফিরিয়ে দিয়ে আয়।

—কখনই না।

—তা হলে মুশকিল।

মেয়েটি বললে—আমি চললাম। না হয় নীচে নেমে ঐ বুনো কুরুম্বাদের কাছেই গিয়ে থাকবো।

—কী সর্বনাশ ! ওরা যে তোর 'কুখ্'কে (মেয়েকে) জ্যান্ত খেয়ে ফেলবে।

—বাজে কথা !

—নারে, ওরা যে রাক্ষস !

টুরা বলে—না হয় ওদের সঙ্গে মিশে আমিও রাক্ষস হয়ে যাবো। রাক্ষস ত আর রাক্ষসকে খাবে না !

—না না, তা হয় না।

টুরা বলে—তাহলে আমি করবো কী বলতে পারিস ?

লোকটি বললে—একটা কাজ কর। কুখ্টাকে (মেয়েটাকে)

না হয় কোথাও লুকিয়ে রেখে আয়। তারা ওকে বড় করতে থাকুক। তুই আমার কাছে এসে থাক। লোকে ওর কথা জিজ্ঞেস করলে বলিস, তাকে তুই নিজে রেখে এসেছিস মুকের্তি-পাহাড়ের কাছে।

—ওখানে যে মেয়েদের যেতে বারণ! ওখানে গেছি শুনলে আমাকে ডাইনী বলে ঢিল দিয়ে মেরে শেষ করে ফেলবে।

লোকটি একটুক্ষণ চুপ করে থেকে কী যেন চিন্তা করলো, তারপরে বললে,—ঠিক আছে। আমি-ই বলবো। বলবো, বাচ্চাটাকে আমি-ই রেখে এসেছি মুকের্তি-পাহাড়ে।

তবু নিশ্চিন্ত বোধ করল না টুরা, বললে—কিন্তু, কোথায় লুকাব বাচ্চাটাকে?

লোকটি আবার একটু চিন্তা করলো, তারপরে বললে—এক কাজ কর। ঐ পাহাড়ে বিম্বু একা থাকে, জানিস ত? তার কাছে রেখে আয়।

শিউরে উঠে টুরা বললে—তারপর!

—তারপরে আবার কী! মাসে মাসে বাচ্চাটাকে গিয়ে দেখে আসবি। বেশী দূরে ত নয়।

—না না, আমি তা পারব না!—টুরা বলে ওঠে—ওকে এক দণ্ডও আমি ছেড়ে থাকতে পারব না।

লোকটি, তার নাম—সুঞ্জা—বললে,—পাগলামী করিস না, যা বলছি তাই শোন। এ ব্যবস্থায় তোর বাচ্চাটাও ভাল থাকবে, তুই-ও ভাল থাকবি।

—না না, সবাই জানতে পারবে।

সুঞ্জা বললে—জানুক না। বিম্বুকে কেউ ঘাঁটাতে সাহস করবে না। ও যেমন জোয়ান, তেমনি একরোখা, তেমনি দুর্দান্ত,—ঠিক একেবারে কুরুম্বাদের মতো। ও যদি তোর 'কুখ্'-(মেয়ে)কে রাখতে রাজী হয় ত ব্যাস, কারুর সাধ্য নেই তোর কুখ্‌টাকে এসে ছুঁতে পারে।

ওর কথাও শেষ হয়, আর সঙ্গে সঙ্গে টুরা করে কী, উপত্যকার পথ ছেড়ে দিয়ে বন্ধুর পার্বত্য-পথ ধরে ছুটতে আরম্ভ করে।

বিস্ময়ে কয়েক মুহূর্ত কথাই বলতে পারে না সুঞ্জা, তারপরে চমক ভাঙতে চীৎকার করে সে বলে ওঠে—যাচ্ছিস কোথায় অমন করে! এই টুরা!

টুরা ততক্ষণে লঘু পায়ে অনেকটা উঠে গেছে, ঘোরানো পাহাড়ী পথের বাঁকে অদৃশ্য হতে হতে সে বলে ওঠে—বিম্বুর কাছে।

—কখন ফিরবি?

—জানি না।

—আমি এখানে দাঁড়িয়ে থাকবো?

—না।

—তাহলে? আমার ঘর কাছেই। আসিস কিন্তু।

উত্তরে টুরা কী বলে যে ছায়ার মতো মিলিয়ে গেল, তা বোঝা গেল না। শুধু ওদের উত্তর-প্রত্যুত্তরগুলো যত উঁচু হচ্ছিল, ততই সৃষ্টি করছিল বিচিত্র প্রতিধ্বনির।

টুরা মিলিয়ে যেতে সুঞ্জা একা পাথরের ওপর চুপচাপ বসে থাকে। মহিষগুলি যথেচ্ছ চরতে থাকে এদিক-ওদিক।

পাহাড়ী পথ পার হয়ে বিম্বুর কুটিরের সামনে টুরা যখন গিয়ে পৌঁছল, তখন আর তার দেহে যেন এতটুকু শক্তিও আর অবশিষ্ট নেই। পুঁটলীশুদ্ধ ঘাসের ওপর শুইয়ে দিয়ে টুরাও এলিয়ে পড়ে তার পাশে। চোখের সামনে যেন তার অনেকগুলো সরলরেখা সমান্তরাল ভাবে থর্‌থর্ করে কাঁপতে থাকে, আর তারপরে খণ্ড খণ্ড হয়ে ভেঙে যেতে থাকে। সেই সব কালো কালো সরলরেখাগুলো ভেঙে গিয়ে কিলবিল করতে থাকে বিশ্রী ভাবে। আর সেই অসহনীয় দৃশ্য দেখতে দেখতে যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে ওঠে টুরা। অস্পষ্ট কণ্ঠে বলে ওঠে—মাগো!

আর তারপরেই খণ্ড খণ্ড রেখাগুলো কিলবিল করতে করতে হঠাৎ

জমাট হয়ে এক অন্ধকারে পরিণত হলো। ঘন, পুঞ্জীভূত আর নিশ্ছিদ্র অন্ধকার!

অন্ধকার থেকে আলোয় যখন ফিরে আসে তার চেতনা, তখন সে বিম্বুর ঘরে চাটাইয়ের ওপরে শুয়ে আছে। বিম্বু নামধারী সেই বলিষ্ঠ বুনো স্বভাবের লোকটি তার পাশে বসে আছে তার মুখের দিকে তাকিয়ে।

প্রথম কথাই যেটা তার মনে এলো, সেটা হচ্ছে,—তার মেয়ে! তার মেয়ে কোথায়!

পাশেই কাপড়ের পুঁটুলীর মধ্যে হাত পা নাড়ছে তার শিশুকন্যা, অল্প একটু চেঁচিয়ে উঠলো, আর খুঁজতে লাগলো তার ক্ষুধা নিবারক অমৃত-উৎস!

মেয়েকে সে চট্ করে বুকের কাছে টেনে নেয়। তারপরে ধীরে ধীরে উঠে বসে।

বিম্বু বলে—আমার ঘরে কে পাঠালো?

—কেউ না।

—এলি যে?

—মেয়েকে বাঁচাতে।

তার মেয়ে যে মুকের্তি-পাহাড়ে দেবতার বলি হবে, এ বোধ হয় জানতো বিম্বু, কানাঘুষোয় শুনেছিল, তাই সে বললে—পারবি?

—তুমি যদি সাহায্য করো।

—কেন করবো সাহায্য?

টুরা ওর দিক থেকে একটু ফিরে বসে কন্যাকে স্তন্যপান করাচ্ছিল। ঘাড় ফিরিয়ে ওর দিকে তাকিয়ে বললে—তোমার কাছে যদি থাকি?

—ত্বিজান্ (বউ) হয়ে?

—হ্যাঁ।

বিম্বু বললে—তোর স্বামী তা মানবে কেন?

—একটা কি ছুটো মোষ দিয়ে দাও ওদের।

—হুঁ!—বিষ্ণু বললে—আছেই আমার একটা মাত্র মোষ। ঠিক আছে, সে না হয় বনে গিয়ে বুনো ছুটো মোষ ধরে এনে পোষ মানিয়ে দেবো। পোষ মানাতে আমি ওস্তাদ, জানিস ত?

—শুনেছি, দেখিনি।

—এইবার দেখবি।

—কিন্তু, মেয়ে?

বিষ্ণু বললে—মেয়েকে ওরা খুঁজে বার করবেই, জোর করে নিয়ে যাবার চেষ্টা করবে।

—তাহলে?

বিষ্ণু বললে—আমি ঠিক লুকিয়ে রাখব। কিন্তু 'টেরে'র (দেবতার) বিরুদ্ধে মন শক্ত করে রুখে দাঁড়াতে পারবি ত?

চোখ ছুটি উজ্জ্বল হয়ে ওঠে টুরার, সে বলে—নিশ্চয়ই পারব।

বিষ্ণু উঠে দাঁড়ায়, বলে—দেখি, কে এবার মেয়েকে ছিনিয়ে নেয় মায়ের বুক থেকে!

সুঞ্জা সেই থেকে সেই যে বসে আছে, আর ওঠেনি। তার ধারণা মেয়েকে বিষ্ণুর কাছে রেখেই তার ঘরে নেমে আসবে টুরা।

কিন্তু বেলা ক্রমশ বাড়তে থাকে, সূর্য উঠে আসে মাথার ওপরে, তবু এলো না টুরা। এলো দল বেঁধে প্রধানকে সঙ্গে করে টুরার স্বামী আর শ্বশুর।

বললে—কোথায় গেছে, জানিস?

—কে?

—টুরা?

—জানি না।

কে একজন বললে—এই দিকেই এসেছে।

সুঞ্জা উঠে দাঁড়ালো, বললে—এসেছে ত এসেছে! আমি জানি না।

টুন্নার স্বামী এসে সুঞ্জার হাত ধরে, বলে—দ্বিজান (বউকে) দেবো তোকে, একটা 'এড়' (মোষ) দিস্। দু'মাস পরে ছাড়িয়ে আনব।

—যাঃ যাঃ, তোর কথায় বিশ্বাস নেই। সেবারও ত বলেছিলি, দিয়েছিলি তুই?

—এবার কথার নড়চড় হবে না। সন্ধানটা দে।

অগত্যা সন্ধানটা বলে দেয় সুঞ্জা। সমস্ত দলটা পাহাড় ভেঙে উঠতে থাকে। সুঞ্জাও সঙ্গে সঙ্গে আসে। প্রধান বলে—সাবধান, বিম্বুকে কেউ চটিও না। বুনো 'এড়' (মোষ) ধরতে আমাদের গাঁয়ে ও-ই একমাত্র ওস্তাদ। ও না থাকলে মোষ পাবো না আমরা। আর জানোই ত, কী তাহলে হবে! মোষের অভাবে আমাদের দুধ জুটবে না। আর দুধ না জুটলে টোডাদের আর রইল কী? দুধই ত আমাদের সম্বল।

কে যেন বলে উঠল—কিন্তু, তাহলে এতবড়ো অন্যায়টা সহ্য করে যাব?

—কে বলেছে সহ্য করতে?—প্রধান বলে ওঠে—ওকে বুঝিয়ে বলতে হবে। বিম্বু ত অবুঝ ছেলে নয়।

কিন্তু, কার্যক্ষেত্রে দেখা গেল, বিম্বু একটা জিনিস কিছুতেই বুঝতে চাইছে না। বাচ্চা মেয়েটাকে সে কিছুতেই দেবে না। বল্লম যোগাড় করেছে বোধ হয় 'কুরুম্বাদের' কাছ থেকে, সেই তীক্ষ্ণ বল্লম আর কোমরের বাঁকা ছুরিখানা, এই নিয়ে সে অদ্ভুত ভঙ্গীতে এসে দাঁড়ালো ওদের সামনে। বললে—প্রধানমশাই এসেছেন, সঙ্গে গাঁও-বুড়োও রয়েছেন, আপনাদের সামনে 'টিয়েক্-জ্রি' দেবীর নামে দিব্যি করে বলছি, এক মাসের মধ্যে দুটো ভালো বুনো মোষ জোগাড় করে এনে আমি দেবো টুন্নার শ্বশুর আর স্বামীকে। তার বদলে টুন্না আমার

কাছে থাকবে, যতদিন মেয়ে না একটু বড় হচ্ছে। মেয়ে যখন মায়ের দুধ খাওয়া ছাড়বে, তখন টুরা ফিরে যেতে পারে, যদি সে ইচ্ছা করে।

প্রধান চীৎকার করে বললে—মঞ্জুর। কিন্তু, বাচ্চাটাকে ফিরিয়ে দিতে হবে।

—না।

জনতা প্রচণ্ড কোলাহল করে উঠল, তারা বললে—বাচ্চাটা ঘরে আছে, ঘর থেকে বার করে আনো।

বল্লম হাতে রুখে দাঁড়ালো বিম্বু, বললে—আয় দেখি কে আসবি! একেবারে শেষ করে ফেলব।

প্রধান সবাইকে থামিয়ে দেয়। বলে—আমাদের জাতের মধ্যে মানুষ খুন করার রীতি নেই।

তারপরে চীৎকার করে বিম্বুর উদ্দেশে বলে ওঠে—তুই কি কুরুম্বাদের মতো রাক্ষস হয়ে গেলি যে, মানুষ খুন করতে চাস?

কী মনে করে বিম্বু হাতের বল্লমটা নামিয়ে রাখলো। হঠাৎ-ই তার চোখ পড়লো মুকের্তি-পাহাড়ের চূড়ার দিকে। দীপ্ত সূর্যের বিভায় ঝলমল করছে পর্বত-শীর্ষ। ওরা বলে দেবস্থান। কতো শিশু যে মায়ের বুক থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ঐ দেবলোকে বিলগ্ন হয়ে গেছে, তার ইয়ত্তা নেই! সেইসব হারানো শিশুদের মুখগুলো যেন ঠিক্‌রে পড়া রোদের কণার সঙ্গে মিশে নির্বাক বিস্ময়ে তাকিয়ে আছে তাদের উপত্যকার দিকে! দলছাড়া যাযাবর সাদা মেঘ যেন হঠাৎ সেই দৃশ্য দেখে থমকে থেমে পড়েছে চূড়ার কাছে।

উদ্দাম জনতার কোলাহল যেন বহু যুগ পার হয়ে আবার তার কানে এসে বাজলো—ফিরে দে ফিরে দে বাচ্চাটাকে—নইলে সমস্ত জাতটার সর্বনাশ হবে, মড়ক লাগবে, মহামারী আসবে!

মুখ ফিরিয়ে তার ঝুপড়ীর দিকে একবার দৃষ্টিপাত করল বিম্বু।

দৈন্যদশাপ্রাপ্ত ক্ষীণ বেড়ার মধ্যে মা তার মেয়েকে বুকে করে বসে আছে, তারই ওপর একান্ত নির্ভরশীলা।

বল্লমটা আবার শক্ত করে ধরলো বিম্বু, বললে—তোমরা ফিরে যাও, বাচ্চা দেবো না।

রুখে দাঁড়ালো টুরার শ্বশুর, বললে—ব্যাপারটা ভালো করলে না—এর প্রতিফল পেতে হবে।

সমগ্র জনতা সম্মিলিত কলরবে প্রতিধ্বনি করে উঠলো—প্রতিফল পেতে হবে।

টুরার শ্বশুর বললে—বিম্বু, তুই আমার বড়ছেলের বন্ধু ছিল, তোর কি এটা উচিত কাজ হচ্ছে?

বিম্বু তবু পাথরের মত নিশ্চল নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে রইলো।

জনতার মধ্য থেকে আরেকজন চীৎকার করে বললে—মানুষ খুন করার নিয়ম নেই, কিন্তু সামাজিক শাস্তি দেবার নিয়ম আছে, প্রধানমশাই চুপ করে আছেন কেন? শাস্তি দিন!

আবার উঠলো জনতার কোলাহল—শাস্তি দিন!

পাহাড়ের যে অংশে দাঁড়িয়ে ওরা জটলা করছে, তার নীচেই সুঞ্জার মহিষগুলো ইতস্ততঃ চরে বেড়াচ্ছিলো, ওদের চীৎকারে তারাও মুখ তুললো, উৎকর্ণ হয়ে তারাও বুঝি জানতে চেষ্টা করছে, শান্তির ছায়া-ঘেরা এই বিস্তৃত উপত্যকায় হঠাৎ চঞ্চলতা জাগলো কেন; দুঃসাহসী ডোরাকাটা বাঘ কি চলে এসেছে অরণ্যভূমি থেকে; বসিয়েছে কি তার তীক্ষ্ণ নখর কারুর বক্ষদেশে? মহিষগুলো পরস্পর কাছ-ঘেঁষাঘেঁষি করে দাঁড়িয়ে রইলো।

সুঞ্জা বোধ হয় কাউকে বোঝাতে গিয়েছিলো, সামাজিক শাস্তির দরকার কী, দেবতাই শাস্তি দেবেন।

প্রচণ্ড প্রতিবাদের ঝড় উঠলো সে কথায়। কয়েকজন সমস্বরে চেঁচিয়ে উঠলো—তাহলে সমাজ-সমাজ করা কেন? দিতেই হবে সামাজিক শাস্তি।

কিন্তু, কাকে ; বিস্তুকে না টুরাকে ?

সেই মুহূর্তে, সেই সংকীর্ণ পার্বত্যপথের ধারে জরুরী সভা বসলো ওদের। কিছুক্ষণ বাদ-প্রতিবাদ কথা-কাটাকাটির পর স্থির হলো, টুরাকেই সমাজচ্যুত করা হবে।

চীৎকার করে উঠলো টুরার শ্বশুর—ও ডাইনী, ওকে ডাইনী সাব্যস্ত করা হোক।

আবার তুমুল চীৎকার উঠলো জনতার মধ্যে—ডাইনী, ডাইনী !

সুঞ্জা কী যেন বলতে গিয়েছিলো এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই ওর পার্শ্ববর্তীরা ওর মুখ চেপে ধরলো, বললে—তুই চুপ কর।

টুরার স্বামী নিশ্চল প্রস্তর স্তূপের মতো বসে আছে একধারে, তাকে গিয়ে দুহাতে নাড়া দিলো সুঞ্জা, বললে, তুই কিছু বলবি না !

মুখ তুললো সে, নির্বোধ নিরীহ পশুর মতোই দুটি চোখের দৃষ্টি, বললে—কী বলব ? আমার কথা শুনবেই বা কে ?

ওর কানের কাছে ফিস্‌ফিস্ করে বলে উঠলো সুঞ্জা—তোর দ্বিজান (বউ), তুই বলবি না ?

ফ্যালফ্যাল করে তেমনি ভাবেই সে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে রইলো সুঞ্জার দিকে, বললে—আমার দ্বিজান (বউ) আর ত নয়। শুনলে না, গাঁও-বুড়োদের রায় ! ও এখন বিস্তুর দ্বিজান (বউ)। আমরা বিস্তুর কাছ থেকে দুটো মোষ পাবো শুধু !

সুঞ্জা একটু অসহিষ্ণু কণ্ঠে বলে উঠলো—মোষ দুটোই বড়ো হয়ে উঠলো তোদের কাছে, দ্বিজান (বউ) নয় ! গাঁও-বুড়োকে গিয়ে বল, তোমার মত বদ্‌লে নাও, দ্বিজান আমি দেবো না।

দুটি চোখের নির্বাক দৃষ্টি আবার ওর দিকে তুলে ধরলো লোকটি, সবই যেন সে নতুন কথা শুনছে। ধীরে ধীরে কী যে হয়ে যাচ্ছে সব ! মা বলে, মেয়েকে দেবো না দেবতার কাছে। লোকগুলো বলে, গাঁও-বুড়োর সঙ্গে গিয়ে ঝগড়া কর্ ! দুটো মোষের থেকে নাকি বউটার দাম বেশী ! সবই যেন কেমনতরো উল্‌টোপাল্‌টো কথা !

চুপচাপ ভাবছে বসে বসে টুরার স্বামী, সুঞ্জাও নীরব হয়ে দাঁড়িয়ে আছে ওর সামনে, এমন সময় সমুদ্র-কল্লোলের মতো আবার গর্জন উঠলো জনতার মধ্যে—ডাইনী, ডাইনী!

চম্‌কে দুজনে তাকালো ওপরের দিকে,—টুরা কি খুপড়ীর ভিতর থেকে বাইরে এসে দাঁড়িয়েছে?

না, তা নয়, দাঁড়িয়ে আছে নির্ভীক সৈনিকের মতো বিম্বু একাই। একটি মাত্র মানুষ, ওকে ক্ষেপে গিয়ে শেষ করে ফেলতে সমগ্র জনতার লাগবে মাত্র কয়েকটি মুহূর্ত। তবু, ওকে ভয় করছে সবাই, তবু ওকে ঘাঁটাতে সাহস করছে না কেউ! কারণ বুনো মহিষ ধরে এনে দেবার ব্যাপারে বিম্বুই একমাত্র অবলম্বন তাদের সমগ্র জাতের মধ্যে। এবং মহিষ পাওয়ার অর্থ সম্পদ লাভ, মহিষ পাওয়ার অর্থ অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্য, মহিষ পাওয়ার অর্থ উপবাস থেকে বেঁচে ওঠা!

তবু কিন্তু সেদিনের সেই রুখে-দাঁড়ানো-জনতা সহজে নতি স্বীকার করেনি। পর্বতের শিরে শিরে বাত্যার আঘাতের মতো বারংবার ওরা নির্ঘোষ ঘোষণা করছে—টুরা ডাইনী, ওকে বার করে দে, আমরা সামাজিক শাস্তি দেবো, অর্থাৎ পাথর ছুঁড়ে ছুঁড়ে ডাইনীটাকে আমরা মেরে ফেলব।

তাদের তৃষিত উপত্যকা বহুদিন পরে আবার পান করুক মনুষ্য-শরীরের রুধিরধারা! কয়েকটি মানুষের সমষ্টি মাত্র নয়, যেন দারিদ্র্যখিন্ন সমগ্র উপত্যকা সেদিন ফেটে পড়েছিলো ক্ষুধিত চীৎকারে—রক্ত দে—রক্ত দে—ডাইনীর রক্ত পান করে শান্ত হোক আমাদের তৃষ্ণা!

ক্ষমা নেই, দয়া নেই, মায়া নেই, সংস্কারাচ্ছন্ন কয়েকটি পৃথিবীর জীব, উদগ্র হিংস্রতায় ভয়াল উত্তাল হয়ে উঠে দাঁড়িয়েছিলো সেদিন। এবং সেদিনকার সেই জনতার ভয়াল মূর্তি দেখে বিম্বুর মতো বন্য স্বভাবের মানুষটিরও কেঁপে উঠেছিলো বুক।

এবার আর শিশুটিকে নয়, এবার ওদের চাহিদা শিশুটির মা,—টুরা!

তাদের জাতের মধ্যে নারীর সংখ্যা অল্প, আর সেইজন্য নারীর প্রয়োজন ত ওদের সংসারে কম নয়! সংখ্যায় নারী অল্প বলেই এক ঘরের সব ভাই মিলে একটি নারীকে বিবাহ করে। সংখ্যায় নারী অল্প বলেই নারী পুরুষের সম্পত্তির মধ্যে গণ্য, সংখ্যায় নারী অল্প বলেই অভাবের তাড়নায় ওরা স্ত্রীকে ভিন্ন পুরুষের কাছে গচ্ছিত রেখে উদর পূর্তির সংস্থান করে। নারীর মুল্য সমাজের কাছে এতখানি হওয়া সত্ত্বেও সংস্কারের প্রভাবে মানুষ মুহূর্তে সেই নারীর প্রতিই মারমুখী হয়ে উঠলো। (যেকালে আমরা বঙ্গদেশের বুকে সতীদাহ রূপ সামাজিক কুপ্রথা পূর্ণভাবে দমন করতে পারিনি, আমি বলে যাচ্ছি এ আখ্যায়িকার মাধ্যমে সেই কালেরই কথা।)

ক্রুদ্ধ জনতা সেদিন বিম্বুর হাত থেকে তার বল্লম পর্যন্ত ছিনিয়ে নিতে দ্বিধা করলো না। বিম্বু চীৎকার করছে, চড়চাপড় ঘুঁষি চালাচ্ছে সে উন্মাদের মতো, গাঁও-বুড়োরা শান্ত হতে বলছে সবাইকে, কিন্তু কে শোনে কার কথা? জনতার মনে তখন দুর্ভিক্ষের বিভীষিকা, মহামারীর বিভীষিকা; মনশ্চক্ষে তারা যেন দেখতে পাচ্ছে একটি নারীর কৃতকর্মের ফলে তাদের মানুষগুলো খেতে না পেয়ে মারা যাচ্ছে, একটি নারীর ভুলের জন্য তাদের অতি যত্নের মহিষগুলো একের পর এক শেষ হয়ে যাচ্ছে।

এই-ই ছিলো সেদিন তাদের বিশ্বাস, ডাইনীর রক্ত উপত্যকার বুকে না পড়লে তাদের জাতটাই নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।

বিম্বুর ক্ষুদ্র খুপরীটা মুহূর্তের মধ্যে ভেঙেচুরে পড়লো বলা চলে। কে বা কারা যে বেড়াগুলো খসিয়ে ফেললো, তার হিসাব কে দেবে?

মুহূর্তে বিম্বুর কুটির একটি ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে, বিম্বু পাগলের মতো এর মাথার চুল টেনে দিচ্ছে, ওর গায়ের কম্বল খুলে ফেলছে, কিন্তু কজনকে সে ঠেকাবে একা? তার কুটিরের ভগ্নস্তূপটাকে চারিদিক থেকে ঘিরে ফেলেছে হিংস্র কয়েকটি মানুষ।

কিন্তু যে-দুটি ভয়ার্ত প্রাণীকে ঘিরে এই সব আয়োজন, সে বা

তারা কোথায়? বেড়ায় চাপা পড়লো না কী? তন্নতন্ন করে খুঁজে দেখলো সবাই, কিন্তু কোথায় কে? টুরাও নেই, তার শিশুকন্যাও নেই।

সর্বনাশ! গেলো কোথায়?

বিস্তুর ঘরটা পাহাড়ের এমন একটা যায়গায়, যার পিছন দিকেই বিরাট একটা খাদ। সেই খাদের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করলো না ত মেয়েটা!

মুহূর্তে সমস্তটা দল উন্মুখ হয়ে এসে খাদের ধারে দাঁড়ালো। দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলো নীচের দিকে। দেখতে দেখতে হঠাৎ-ই চোখ পড়লো একজনের। সে বলে উঠলো—ঐ যে ডাইনী! তাকিয়ে দেখ।

আতঙ্কে সর্বশরীর ওদের শিউরে উঠল দৃশ্যটি দেখে। গাঁও-বুড়োদের একজন বললে—ডাইনী! ডাইনী বলেই এটা করা ওর পক্ষে সম্ভব হয়েছে!

নীচে, খাদের অনেক নীচে, শিশুকন্যাকে বুকের ওপরে শক্ত করে বেঁধে নিয়ে অসীম দুঃসাহসিকতায় খাদের মধ্যে কোথাও পাথর ধরে, কোথাও বা গাছের শিকড় ধরে, কোথাও বা তরুলতাকে আশ্রয় করে, টুরা নেমে গেছে নিঃসীম অরণ্যের মধ্যে, যেখানে বুনো মোষ ঘুরে বেড়ায়, ঘুরে বেড়ায় গাছ-চড়া চিতাবাঘ, আরও কতো কী সব হিংস্র প্রাণী! তার ওপরে আছে বুনোস্বভাবের দুর্ধর্ষ কুরুম্বার দল।

সুপ্পা চীৎকার করে উঠলো ওপর থেকে—টু-রা!

পরক্ষণেই দুদিক থেকে দুটি লোক চেপে ধরলো ওকে, বললে—খবরদার, ডাকিস না ওর নাম ধরে। ও ডাইনী।

উৎসাহী জনতার একাংশ বললে—এইত এতো পাথর রয়েছে এখানে পড়ে, ছুঁড়ে মারো ওর দিকে। বাঘের মুখে যাবার আগে আমরাই ওকে শেষ করব।

প্রস্তাব শুনে আবার রুখে দাঁড়ালো বিস্তু, বললে—খবরদার!

কিন্তু, কে শোনে তার কথা! উন্মত্ত জনতা ততক্ষণে পৈশাচিক হিংস্রতায় মত্ত হয়ে উঠেছে! বাধা দেওয়া নিষ্ফল জেনে আর সেখানে দাঁড়ালো না বিন্থু, খানিকটা পুবে সরে গিয়ে সে একটু নীচে নেমে গেলো।

নেমে গিয়ে একটা গাছের ডাল আশ্রয় করে সে অদ্ভুত ক্ষিপ্রতার সঙ্গে লাফ দিয়ে পড়লো একটা বড়ো পাথরের ওপর। পাথরের খাঁজ ধরে ধরে সে নীচে নেমে গেলো আরও কিছুটা দূর পর্যন্ত। তারপরে গাছের শিকড় আর তরুলতা আশ্রয় করে সে খাদের মধ্যে আরও অগ্রসর হতে লাগলো। টুরাকে ধরতেই হবে যেমন করে হোক!

ওদিকে ছায়া-ঘেরা খাদের মধ্যে তখন একটা চাপা কানাকানি শুরু হয়ে গেছে। দমকা হাওয়া লেগে দুলতে লাগলো তরুলতারা, কাঁপতে লাগলো গাছের ডালগুলো। পাথরে পাথরেও বুঝি তখুনি ইসারা হয়ে গেলো পরস্পরের মধ্যে! ওপর থেকে পাথরের টুক্‌রো আসছে, আর বড়ো-বড়ো পাথরের গায়ে লেগে সেগুলো ঠিক্‌রে পড়ছে অন্য দিকে। হাওয়ায়-হাওয়ায়-আন্দোলিত-তরুশ্রেণীর-ডালপালায় পাথর লেগেও লক্ষভ্রষ্ট হচ্ছে, আর তাই দেখে, সমগ্র অন্ধকার খাদ জুড়ে লতায় পাতায় একটা খুশীর হিল্লোল বইতে লাগলো! অতিকায় শিকড়গুলো মাটি ঝরিয়ে দিতে লাগলো, মাটি ঝরে ঝরে ধোঁয়ার মতো দেখাতে লাগলো খাদের শূন্যতা!

ওপরে, হঠাৎ-ই সব প্রস্তর ছোঁড়ার উদ্যম এক সময় থেমে গেলো। কে যেন ভয় পাওয়া অস্ফুট কণ্ঠে বলে উঠলো—কুরুম্বা!

এক সঙ্গে বহু ভয়ার্ত দৃষ্টি গিয়ে পড়লো খাদের দিকে। একটা জায়গায় লতাপাতার আড়াল থেকে ঝিক্‌মিক্ করে উঠলো অনেকগুলো বল্লমের ফলা। কয়েক জোড়া বন্য ঘোলাটে দৃষ্টিও চোখে পড়লো ওপর থেকে। পাহাড়ের এরা অরণ্যের ঐ হিংস্র জীবদের রীতিমত ভয়ের চোখে দেখে। প্রধান ভয়ার্ত লোকগুলোকে ফিরে যেতে

বললেন। বললেন—ডাইনীর ভার দেবতা নিজের হাতে নিয়েছেন। এবার ডাইনীরও নিস্তার নেই, বাচ্চাটারও নিস্তার নেই।

কে যেন বললে—গেল কোথায় ডাইনীটা ?

—দেখতে পাচ্ছি না।

—তবে কি পাথরের ঘায়ে মারা গেলো ?

—তা যেতে পারে।

—তাহলে ত বাঁচা গেল। চলো হে, ঘরে চলো।

কে যেন বললে—কিন্তু বিম্বু ? ও যে খাদের ভিতরে নেমে গেলো !

এক মুহূর্ত থম্‌কে দাঁড়ালো লোকগুলো। তাইত, বিম্বুর কী হবে ? কুরুম্বারা ওকে যদি মেরে ফেলে !

—ওরও হাতে বল্লম আছে।

—কিন্তু, ও একা, আর ওরা অতোগুলো ! বিম্বু কি পারবে ওদের সঙ্গে !

কুরুম্বারা অপেক্ষাকৃত সমতলবাসী, বনে বনেই ওদের বাস, আজ ওরা অনেক সভ্য হয়েছে সভ্যতার কিছু সংস্পর্শে এসে, কিন্তু যখনকার কথা বলছি, তখন ওরা ছিল আরও বন্য, আরও দুর্ধর্ষ। বিশেষ করে উপত্যকাবাসী নিরীহ টোডাদের কাছে ওরা ছিল বিভীষিকা, বলা যেতে পারে।

কুরুম্বারা গহীন বনে কুটির তৈরী করে বাস করে, তীর ধনুক আর বল্লম নিয়ে ওরা শিকার করে, বুনো শুয়োর, হরিণ, এমন কি সময় সময় বুনো মোষ পর্যন্ত। তীর আর বল্লমের ফলায় প্রয়োজন মতো ওরা বিষ মাখিয়ে নেয়, যখন বুনো হাতির পাল বা বাঘের হাত থেকে আত্মরক্ষার প্রশ্ন আসে। মাথায় শক্ত শক্ত ছোট ছোট চুল, দেহের বর্ণ সাধারণতঃ মিশ কালো, নাক মোটা-মোটা চ্যাপ্‌টা ধরণের, নীচের ঠোঁট পুরু, টোডাদের তুলনায় বেঁটে। কটিদেশে ফালি কাপড় জড়ানো, হাতে বল্লম, দুটি চোখে বন্য দৃষ্টি ; গাছপালার ফাঁক দিয়ে

সেই রকম দুটি মূর্তি যখন অকস্মাৎ চোখে পড়ে গেল টুরার, তখন সব ভুলে সে আর্তচীৎকার করে উঠল ভয়ার্ত তীক্ষ্ণ স্বরে। কুরুম্বারা নরখাদক নয়, কিন্তু টোডাদের প্রবল বিশ্বাস, ওরা যাদু জানে। আর যাদু যারা জানে, তারা কী-ই বা না করতে পারে?

যাদুকররা তখন বেরিয়েছিল শিকারে। দুটি তরুণ যাদুকর-কুরুম্বা। ঘুরতে ঘুরতে বনান্তরালে যখন তারা এসে পৌঁছেছে, তখন কী এক অজানিত কোলাহলের শব্দে তারা মুহূর্তে সচকিত হয়ে উঠলো। বন থেকে হাতির পাল বেরুলে গাঁয়ের লোকেরা যেমন হৈ হৈ রৈ রৈ শব্দ করে, ঠিক তেমনি। বনস্পতির শিরে শিরে ঝড় এসে যখন খেলা করে, তখন বনে-বনে, গাছে-গাছে শিরশির-সরসর মড়মড় শব্দ হতে থাকে একটানা, আর তারা দূর থেকে নিজেদের ঘরের বাঁধন শক্ত করতে করতে বুক-কাঁপা ভয় নিয়ে সেই শব্দ শোনে কান পেতে।

অপেক্ষাকৃত তরুণ কুরুম্বাটির মনে হলো, সে যেন ঠিক সেইরকম বনে-ঝড়-লাগা শব্দ শুনছে। বড়োটির হাত ধরে সে থম্‌কে দাঁড়ালো, তারপরে দৃষ্টি মেলে তাকাতে লাগলো চারিদিকে।

বড়োটির মনে হচ্ছিল, নির্ঘাৎ পাহাড় থেকে নেমেছে বুনো হাতির পাল, গাঁয়ের লোক সেই হাতির দলটাকে তাড়াচ্ছে। ঠিক কোন্ দিক থেকে যে শব্দটা আসছে ধাবণা করতে না পেরে, বড়োটি করলো কী, ছোটটির হাতে চাপ দিয়ে ইঙ্গিত করে লঘু আর অভ্যস্ত পায়ে গাছের ডালপালা ধরে পাহাড়ী বন্ধুর পথ ধরে ওপরে উঠতে লাগলো।

ছোট ছোট টিলার মতো পাহাড়, তার পরপারে খাদ আর গভীর অরণ্য, তার ওপারে বিশাল পর্বতশ্রেণী আকাশের বুকে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। ওরা দৌড়ে দৌড়ে একটা টিলার মাথার ওপরে উঠতে লাগলো। টিলায় উঠে শব্দটা আরও পরিষ্কার শুনতে পেলো ওরা। যেন বাঁদিক থেকে আসছে শব্দটা। কিন্তু, কেমনতরো শব্দ?

বড়োটি কান খাড়া করে শুনতে লাগলো। হাতির পাল তাড়াবার

শব্দ এ তো নয়। ছোটটির কানেও বেসুরো শোনালো শব্দটা। তরুশ্রেণীর ঝাঁকড়া-মাথায়-লাগা ঝড়ের প্রমত্ততার ধ্বনিও ত এ নয়! তবে?

ওরা শব্দ লক্ষ্য করে, বাঁদিকে টিলার উপলবন্ধুর পথ ধরে চলতে লাগলো।

চলতে-চলতে-চলতে একজায়গায় এসে থমকে দাঁড়ালো ওরা। শব্দটা আরও স্পষ্ট। এবার ওরা নামতে লাগলো অপেক্ষাকৃত ঢালু অরণ্যভূমিতে। শ্যাওলাপড়া ছাতাপড়া সব বড়ো বড়ো প্রাচীন বৃক্ষরাজি, আর নীচে নীচে সব ঝোপ, তাড়া খেয়ে একটা শেয়াল একটা ঝোপ থেকে দৌড়ে গেল অন্য ঝোপে।

মাথার ওপরকার পাহাড় একটা জায়গায় নীচু হয়ে এসেছে। এবং যেখানটায় নীচু হয়ে এসেছে, সেখানটায় কোনদিন বৃষ্টি হয়ে পাহাড়ে ধ্বস নেমে থাকবে। গাছপালা শূন্য হয়ে জায়গাটা এবড়োখেবড়ো পাথরে পাথরে ভর্তি হয়ে আছে। আর সেই ভগ্নস্তূপটাকে ঘিরে ঋজু হয়ে প্রহরীর মতো দাঁড়িয়ে আছে সোজা-সোজা ঝাঁকড়া-মাথা গাছগুলো।

এই রকম ঝাঁকড়া-মাথা সোজা-দাঁড়িয়ে-ওঠা গাছগুলোর একটি গাছের গুঁড়ির আড়ালে এসে দাঁড়ালো ওরা দুজন। আর অবাক হয়ে দেখতে লাগল অভূতপূর্ব এক দৃশ্য।

পাহাড়ের ধ্বস যেখানে নেমেছে, ঠিক তার ওপরে গায়ে-কম্বল-জড়ানো লম্বা লম্বা চেহারার লোকগুলো জড়ো হয়ে চীৎকার করে ঢিল ছুঁড়ছে, আর নীচে,—ধ্বসের মধ্য দিয়ে গাছের ঝুলে-পড়া শিকড় আর লতাগুল্মের সাহায্য নিয়ে আরেকটি প্রাণী আসছে নেমে। কম্বলের পুঁটুলী শক্ত করে ধরা, অন্য হাতে শিকড়, কি ডাল, কি পাথরের সরু মুখ,—এই সব আশ্রয় করে তাড়া-খাওয়া নিরীহ ভয়ার্ত পশুর মতো পালিয়ে আসবার চেষ্টা করছে।

ওপর থেকে ছুঁড়ে-ফেলা একটা পাথরের টুকরো হঠাৎ এক সময়

এসে লাগলো পলায়নপর প্রাণীটির মাথার ওপরে। সঙ্গে সঙ্গে মাথাটা তার টলে গেল, এবং শিকড়ের অবলম্বন থেকে হাত তার খুলে গেল, টুরা গড়িয়ে এসে ঝুপ করে পড়লো ধ্বস-ভাঙা স্তূপটার ওপরে, তারপরে সেখান থেকে গড়াতে গড়াতে একটা ঝোপের মধ্যে গিয়ে পড়লো। এবং এত যে কাণ্ড, আশ্চর্য,—ডান হাত দিয়ে প্রাণপণে জাপ্‌টে-ধরা কাপড়ের পুঁটুলীটি সে কিন্তু ছাড়েনি।

ছোটটি অস্ফুট স্বরে কী যেন বলে উঠলো, তারপরে ছুটে যেতে গেল সেই দিকে, কিন্তু বড়োটি তার হাত ধরে আবার তাকে ইঙ্গিত করলো, বললো—না।

ইতিমধ্যে কী যে হলো ওপরের পাহাড়ে, সব কোলাহল মুহূর্তে স্তব্ধ হয়ে গেল। এবং তারপরে সবিস্ময়ে ওরা লক্ষ্য করে দেখলো, জায়গাটা একেবারে খালি হয়ে গেছে, একটি প্রাণীও আর নেই ওখানে।

কয়েক মুহূর্ত ওরা পরস্পরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করলো, তারপরে দুজনেই সন্তর্পণে ছুটে গেল তাড়া-খাওয়া প্রাণীটির দিকে। দু'ধারে বন আর লতাগুল্ম, তার মাঝখানে একটি ঝর্ণা-পথ শুকিয়ে আছে, সেই বিশুষ্ক পথের ওপরে কিছুদূর পর্যন্ত নেমে এসেছে পাহাড়-ভাঙা ধ্বস,—আর ধ্বসের মাটি আর কুচোপাথর যেখানে এসে শেষ হয়েছে, ঠিক সেখানে গড়িয়ে এসে পড়েছে প্রাণীটি। ওরা চমকে এই এতক্ষণ পরে বুঝতে পারল, যাকে ওরা পলায়নপর পশু মনে করেছিল, সে পশু নয়, মানুষ। পাহাড়ের ওপরকার লম্বা লম্বা সাদা মানুষই বটে। মাথার লম্বা লম্বা চুল জট্ পাকিয়ে আছে, আর তার সঙ্গে মিশেছে টক্‌টকে লাল রক্ত। মাথাটা কেটে গিয়ে রক্ত পড়ছে, সেই রক্তের ধারা রগের পাশ দিয়ে গালের ওপর নেমে এসেছে টপ্‌টপ্‌ করে, তারপরে গাল ছাড়িয়ে চলে এসেছে বুকের ওপরে। ঘাড় গুঁজে মুখখানা ঝুলে পড়েছে বুকের দিকে। পরনের লম্বা কম্বলটা একটু খুলে গেছে, বুকের অংশটুকু থেকে সম্পূর্ণ সরে গেছে আবরণ, মুখখানা

তামাটে হলেও বুকের অনাবৃত অংশটুকু ধবধবে ফরসা দেখাচ্ছে ওদের দুজনের অনভ্যস্ত চোখে। এবং দেখার সঙ্গে সঙ্গেই দুজনে সচকিত হয়ে উঠলো দ্বিগুণ চমকে। মানুষটি পুরুষ নয়, মেয়েমানুষ !

ততক্ষণে তার ডানহাতে শক্ত-করে-ধরা পুঁটুলীটা কাঁপতে সুরু করেছে, আর তার মধ্য থেকে ক্ষীণ একটা স্বরও ফুটে উঠছে।

কয়েক মুহূর্তের ব্যাপার মাত্র। ওরা ত্বরিত পায়ে ছুটে এসে দাঁড়ালো মেয়েটির কাছে। মেয়েটির বাঁ-হাতের কনুই থেকেও ঝরঝর করে ঝরছে রক্ত। নিস্পন্দ নিথর হয়ে আছে মেয়েটি, তবু কিন্তু বাচ্চাটাকে সে ছাড়েনি।

অবাক হয়ে ভাবছিল ছোটটি, পাহাড়ের মানুষ পাহাড়ের মানুষকে ঢিল ছুঁড়ে মারছিল কেন ?

বড়োটি ওকে ইঙ্গিত করলো। বোঝালো, আর সময় নেই। মেয়েটা বোধ হয় অজ্ঞান হয়ে গেছে, বাচ্চাটাকে তুই ধর। আমি মেয়েটাকে ধরছি। টিলার পথে নয়, এই ঝর্ণার পাকদণ্ডি পথে নেমে যাই কিছুদূর পর্যন্ত, তারপরে আমাদের অভ্যস্ত বনপথ ধরে গাঁয়ে ফেরা যাবে'খন।

এ সবই তাদের ভাষায় তারা বলাবলি করলো। এবং তারপরে তারা তৎপর হয়ে উঠলো তাদের করণীয় কর্মে।

কিন্তু অজ্ঞান হয়ে পড়লেও এমন শক্ত করে বাচ্চাটাকে ডানহাতে ধরে আছে বাচ্চাটার মা যে, ছাড়ায় কার সাধ্য ! যেন পাথরের হাত।

অতি কষ্টে দুজনে মিলে সেই বজ্র বেষ্টনী থেকে বাচ্চাটাকে ছাড়িয়ে আনলো। ক্ষীণকায় এক শিশু। ক্ষীণস্বরে কাঁদছে, কাঁদবার শক্তিও তার বুঝি শেষ হয়ে আসছে। বড়োটি ছোটটিকে বললে—তুই বাচ্চাটাকে নিয়ে দৌড় দে। আমি মেয়েটিকে নিচ্ছি।

যেমন কাপড়ে জড়ানো ছিল তেমনি কাপড়ে জড়ানো অবস্থাতেই বাচ্চাটাকে হাতে তুলে নিলো ছোটটি। নিয়ে ঝর্ণার বিশুষ্ক পাকদণ্ডি

পথে কিছুদূর পর্যন্ত এঁকেবেঁকে নেমে এসে, অকস্মাৎ বাঁদিককার অরণ্যপথে অদৃশ্য হয়ে গেল।

আর বড়োটি মূর্ছিত মেয়েটিকে তুলে নিয়েছে কাঁধে, একহাতে বল্লম, অন্য হাতে মেয়েটি,—এইভাবে সোজা দাঁড়িয়ে সেও নেমে যেতে লাগল পাকদণ্ডীর পথে। ডানহাতে বল্লম, বাঁ-হাতে মেয়েটিকে ফেলেছে সে কাঁধের ওপর, মূর্ছিত মেয়েটি মাথা আর হাত দুটি লুটিয়ে দিয়েছে নীচে, টপটপ রক্ত ঝরে পড়ছে পথের ওপর।

বিশুষ্ক ঝর্ণার পথে ফোঁটা ফোঁটা রক্ত দিয়ে বিচিত্র আলপনা রচনা করতে করতে একসময় হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে গেল তারা।

বিস্থু সেই রক্তের ফোঁটাকে অনুসরণ করে করে কিছুদূর পর্যন্ত আসতে পারলো। কিন্তু তারপর ?

আরও নীচে নেমেছে, না, ডাইনে কিংবা বাঁয়ে অরণ্যের মধ্যে প্রবেশ করেছে ? একবার মনে হলো, বাঁদিকের অরণ্যে, বৃক্ষমণ্ডলীর নীচেকার ঘাসে-ঘাসে রক্ত দেখা গেল কয়েকটা জায়গায়, কিন্তু আর নেই। ডানদিকে বাঁদিকে নির্দিষ্ট কোনো পথ নেই। লতাগুল্ম আর গাছের ডাল সরিয়ে বাঁদিকে কিছুদূর পর্যন্ত এলো বিস্থু, একবার ডেকে উঠলো—টুরা, টুরা !

দূরের পাহাড়ে ডাকের সেই ধ্বনি লেগে ক্ষীণ প্রতিধ্বনি শোনা গেল—রা-রা !

না, কোনো সাড়া নেই।

বিস্থু বাঁ-দিক ছেড়ে চলে গেল ডানদিকের অরণ্যে। তার মনে প্রশ্ন জাগছে অনুক্ষণ—রক্ত কেন ? হায়নায় ধরে নি ত বাচ্চাটাকে ? যদি ধরে থাকে, তবে ? টুরা পাগলের মতো নিশ্চয় ছুটেছে বনের মধ্য দিয়ে। বনে বিপদ কি কম ? জন্তু-জানোয়ার আছে, সাপ আছে।

কিংবা ডানদিকে চলতে চলতে হঠাৎ এক সময় দাঁড়িয়ে পড়ল

বিম্বু—কুরুম্বারা ধরে নিয়ে যায়নি ত টুরাকে ? কিন্তু, তাহলেই ব রক্ত কেন ? বল্লমের ফলা দিয়ে খুঁচিয়ে মেরে ফেলেনি ত টুরাকে ?

চীৎকার করে উঠতে ইচ্ছা করলো বিম্বুর। চীৎকার করে ডাকতে ইচ্ছা করলো তার নিজের লোকজনদের। কিন্তু, তারা ত আসবে না। তারা ডাইনী সন্দেহ করে ঢিল ছুঁড়ে মেরে ফেলতে পারে নিজেদের জাতের মেয়েদের, কিন্তু বাইরের শত্রুদের বিরুদ্ধে একজোট হয়ে রুখে দাঁড়াবে না। বরং শত্রুর ভয় থাকলে স্থান থেকে স্থানান্তরে চলে যাবে, তবু ফিরে দাঁড়িয়ে ঘর রক্ষা করবে না।

বিম্বু পাগলের মতো আবার ডাকতে লাগল,—টুরা টুরা !

প্রতিধ্বনি তেমনি দূর থেকে ভেসে আসতে লাগল—রা-রা !

সাড়া নেই, সাড়া নেই, কোথাও সাড়া নেই !

অস্থির হয়ে উঠেছে বিম্বু, কোথায় এখন যাবে সে ? কুরুম্বাদের গ্রামে ?

কোথায় কুরুম্বাদের গ্রাম ? তাদের গ্রাম কেউ দেখেনি কখনো, কোথায় কতদূরে, বনের কোন্ গহীন অংশে যে তারা বাস করে, সে বৃত্তান্ত তাদের কাছে সম্পূর্ণ অজানা।

বনের মধ্য দিয়ে তবু আন্দাজে-আন্দাজে ছুটতে লাগলো বিম্বু। তার এটুকু শোনা আছে, বনের মধ্য দিয়ে লঘু পায়ে এমনভাবে চলাফেরা করে কুরুম্বাদের দল যে, পায়ে-পায়ে যে পথের রেখা পড়বে, তা-ও পড়ে না ! এমন তাদের গতি যে চট্ করে তাদের দেখা পাবারও উপায় নেই ! এই তাদের দেখছ, এই নেই ! মুহূর্তে যেন ছায়ার মতো মিলিয়ে গেছে তারা। সাধে কি আর ওদের নাম দেওয়া হয়েছে যাতুকর ?

কতো দণ্ড পল অনুপল যে কেটে গেল কে জানে, বিম্বু একসময় ক্লান্ত পায়ে এসে দাঁড়ালো সেই বিশুষ্ক ঝর্ণার পথটায়। রক্তের দাগগুলো আর বিশেষ নজরে পড়ে না, কে যেন শুকনো পাতা বুলিয়ে যত্ন করে মুছে নিয়েছে। ব্যাপারটা দেখতে দেখতে যতো ওপরে

উঠতে লাগলো, ততই বিস্মিত হতে লাগলো বিম্বু। এক বিন্দু রক্তের দাগও নেই। সেই গল্‌গল্‌-করে-রক্ত-ঝরার-দাগ ছিলো যেখানে ধ্বসের শেষ প্রান্তে, সেখানে লক্ষ্য করলে রক্তের চিহ্ন সামান্য দেখা যায়,—কালো কালো কয়েকটা রেখার সমষ্টি এখনো লেগে আছে পাথরের গায়ে।

সেই দাগ উবু হয়ে বসে লক্ষ্য করতে করতে হঠাৎ ধ্বক্‌ করে উঠলো বুকের ভিতরটা। সঙ্গে সঙ্গে হাতের বল্লমটা শক্ত করে ধরলো বিম্বু। গাছের পাতা দিয়ে রক্ত মোছেনি কেউ, ধারালো জিভ দিয়ে চেটে চেটে খেয়ে গেছে রক্ত। তাহলে নির্ঘাৎ হায়না—ক্ষুধার্ত হায়না।

সতর্ক দৃষ্টিতেই বনের এদিক ওদিক তাকাতে লাগলো বিম্বু ; এক সময় হঠাৎ তার মনে হলো, কে যেন ঠিক তার নাম ধরে ডাকছে। চাপা গলায় সতর্ক কণ্ঠে একজন আরেকজনকে সাবধান করে দেবার জন্য যেমন নাম ধরে ডাকে, তেমনি কে বা কারা যেন ডাকছে—বিম্বু ?

হঠাৎ একসময় ওপর দিকে দৃক্‌পাত করলো বিম্বু। পাহাড়ের ওপরে দুটি লোক—একটি সুঞ্জা, অপরটিকে ঠিক চেনা যাচ্ছে না।

তারা আবার ডাকলো—বিম্বু ?

বিম্বু মুখ তুলতেই সুঞ্জা চাপা গলায় সাবধানী ভঙ্গীতে বললে—উঠে আয়, উঠে আয় বিম্বু !

অসীম বিরক্তি, বিতৃষ্ণা আর রাগে যেন জ্বলে উঠলো সর্বশরীর। বন্যদের মতো গর্জন করে উঠলো—কেন ?

সুঞ্জা বললে—ভীষণ কাণ্ড হয়েছে এখানে। উঠে আয়।

বিম্বু বললে—টুরাকে পাওয়া গেছে ?

উত্তরে সুঞ্জা কী যে বললে ঠিক বোঝা গেল না। কিন্তু, বিম্বুর প্রশস্ত বুকখানার ভিতরে হৃদপিণ্ডটা যেন সজোরে ফেটে পড়বার উপক্রম করছে।

তার মনে হলো, নিশ্চয়ই পাওয়া গেছে টুরাকে, নিশ্চয়ই টুরা !

খাড়া যে ওপরে উঠে যাবে, এমন উপায় নেই। বিম্বু তাই ছুটতে লাগলো অন্যদিকে। লতাতন্তু দিয়ে ঘেরা একটা প্রকাণ্ড চ্যাপটা পাথর ; সিঁড়ির চাতালের মতো সেই পাথরটায় উঠে আবার গাছের ঝুলে-পড়া শিকড় ধরে বুনোদের মতো ঝুলতে ঝুলতে খানিকটা ওপরে একটা পাথরের ফাঁকে পা রাখলো বিম্বু। সেই ফাঁকে পা রেখে মাথা উঁচু করলো। দুদিকে দুটি পাথরের চাঁই। সেই চাঁই দুটির ছুঁচলো মাথায় দুটি হাতের ভর রেখে শরীরটাকে শূন্যে তুলে দিয়ে স্পর্শ করলো অদূরের আরেকটা চ্যাপটা পাথরের ওপর, অপেক্ষাকৃত উঁচু জায়গায়। শরীরটাকে দোলাতে দোলাতে অবশেষে লাফ দিয়ে পড়লো সেই পাথরের ওপর। এখান থেকে ওদের উপত্যকায় উঠে পড়া কঠিন নয়। সোপানের মতো পর পর কয়েকটা ধাপ উঠে যেতে হয়। তারপর আবার খানিকটা খাড়াই। আবার গাছের শিকড় অবলম্বন করে শরীরটাকে তোলা। এবারে তুলতে পারলেই নিশ্চিত শ্যামল উপত্যকা তাকে যেন দুই স্নিগ্ধ হাতে বেষ্টন করে ধরবে।

ওপরে উঠে এসে শ্যামল ঘাসের ওপর বসে হাঁপাতে লাগল বিম্বু। কিন্তু বেশীক্ষণের জন্য নয়। নীচেকার হাওয়ায় কেমন যেন একটা শ্বাসরোধী ভাব আছে ; গরমও যথেষ্ট, শরীরটাতে যেন জ্বালা ধরিয়ে দেয়। চোখ জ্বালা করে, হাতের তালু জ্বালা করে, সারা শরীরে গরম হাওয়া এসে যেন চিকন চিকন বেতের ডগার মতো বাড়ি মারতে থাকে।

আর, এখানে? হাওয়া কতো ঠাণ্ডা, ঘাসের নরম নরম ডগাগুলো কতো কোমল! মা যেমন শিশুকে জড়িয়ে ধরে দুটি হাতে অসীম মমতায়, ঠিক তেমনি স্নিগ্ধ স্পর্শে শরীরের সব জ্বালা সব ক্লান্তি যেন মুহূর্তে দূর করে দেয়।

ওকে দূর থেকে দেখতে পেয়েই বোধ হয় সুঞ্জা ছুটতে ছুটতে ওর কাছে এলো। গায়ে কম্বলটা জড়ানো, মাথার বড়ো-বড়ো চুল হাওয়ায় উড়ছে। এসে বললে—বিম্বু, লাগেনি ত?

—কী লাগবে ?

সুঞ্জা একটু যেন অবাকই হলো, তারপর বললে—কুরুম্বারা তোকে মারেনি ?

—কোথায় কুরুম্বারা ! দেখতেই পেলাম না।

বলতে বলতে উঠে দাঁড়ালো বিম্বু, তারপর বললে—টুরাকে পেয়েছিস তোরা ? কোথায় টুরা ?

—টুরা !—দ্বিগুণ অবাক হয়েই ওর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল সুঞ্জা।

ওর চোখের ঐ নির্বোধ দৃষ্টি দেখে বিম্বু আরও অসহিষ্ণু হয়ে উঠলো, ওর দুটি কাঁধে দুটি হাত রেখে বললে—কী করেছিস তোরা টুরাকে ? সত্যি বল।

সুঞ্জা বললে—টুরা মরে গেছে।

—কে বললে ?

সুঞ্জা বললে—ফোরি।

বিম্বু অনুভব করলো, তার বুকের ভিতরটা যেন এক অসাড় প্রস্তর-খণ্ডে পরিণত হয়েছে। ফোরি যে লোকটির নাম, সে হচ্ছে ওদের জাতের মধ্যে বোধ হয় সব থেকে বয়স্ক ব্যক্তি, কেউ কেউ বলে, একশোরও ওপর ওর বয়েস ; কেউ বলে, না না, অতো হবে না, খুব বেশী হলে আশী।

ফোরি নিজে কিছু বলতে পারে না, একটু মাথা-পাগলা গোছের লোক, স্থবির। হাঁটা-চলা বেশী করতে পারে না, তবু এক জায়গায় বসে থাকবার লোক সে নয়, বয়সের ভারে নুয়ে পড়লেও গুটি গুটি সে এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়ায়। মুখের চোয়ালটা বড়ো, চোখ দুটিও বড়ো-বড়ো, সারা মুখ-মাথা বড়ো-বড়ো চুলে ভর্তি, সব সাদা। কিছুদিন হলো মাথার আর মুখের চুল ঝরে ঝরে যাচ্ছে।

মুখখানা আজকাল ওর আরও ভীষণ দেখায়। তাছাড়া, বিড়বিড় করে আপন মনে যে-সব কথা বলে, তাতে করে এইসব সরলপ্রাণ

সংস্কারাচ্ছন্ন মানুষগুলো ভীত না হয়ে পারে না। ওকে তাই সকলেই যতদূর পারে পরিহার করে চলে।

বিস্মু রুদ্ধ কণ্ঠে প্রশ্ন করে—ফোরি জানলো কী করে?

শুঙ্গা বললে—কী বলছিস! ফোরি জানবে না? ও যখন জঙ্গলের ধারে যায়, সব জানতে পারে।

ওদের উপত্যকাটি শ্যামল ঘাস আর লতাগুল্মে ঢাকা—যে-দিকে তাকাও ঢেউখেলানো প্রান্তর, পাহাড়ে অথবা অরণ্যে গিয়ে মিশেছে। আর আছে নদী; পশ্চিম দিকটা ছেড়ে গিয়ে আর তিনদিকই বেষ্টন করে আছে দুটি নদী, অবশ্য পাহাড়ের নীচে, সমভূমির সীমানায়। একটি নদীকে ওরা বলে মোয়ার, অন্য নদীকে বলে সিরুভবানী। কতো পাহাড়ী ঝর্ণা উপলবন্ধুর পথ পার হয়ে ঝাঁপ দিয়ে পড়ছে এই মোয়ার নদীতে, কিংবা সিরুভবানীতে।

এমনি এক ঝর্ণার ধারে কয়েকটা সোজা-উঠে-যাওয়া ঝাউ গাছ আছে, সেই গাছের ছায়ায় গিয়ে প্রায়ই বসে থাকে ফোরি। দুটি গাছে তীক্ষ্ণ পাথর খণ্ডের মুখ ঘষে ঘষে কী-সব আঁকিবুঁকি টানে, আর বিড়বিড় করে বকে। ওর সঙ্গে থাকলে এক কথা, নইলে একা একা সেই ঝাউগাছগুলোর তলায় যেতে পর্যন্ত ভয় করে সবার। দুটি ঝাউ গাছে, নীচে থেকে ওপর পর্যন্ত, সাদা সাদা পাথরের দাগ, কাটা-কাটা হয়ে এমনভাবে বসে গেছে যে, অন্ধকার রাত্রে একটু দূর থেকে মনে হয়, হিংস্র দাঁত বার করে তাদের দিকে লোলুপ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে দুটি ঝাউ গাছ নয়—দুটি শয়তান!

ফোরির কার্যকলাপ বিস্ময় হয়ে দেখা দেয় সবার চোখে। জঙ্গলের ধারে, অর্থাৎ ঐ ঝাউ দুটির তলায় যখন সে যায়, তখন সে সবার সব কথা জানতে পারে, এই-ই হয়ে গেছে লোকের বিশ্বাস।

কিন্তু, এই ফোরি যখন তার নিজের ঘরে থাকে, তখন সে অনেকটা সহজ মানুষ। তার নিজের 'টু-এল্' বা গোয়াল ঘর আছে, তাতে ওর মোষগুলো থাকে। নিজে ততটা পরিচর্যা করতে পারে না,

পাশের লোকেরা দেখাশোনা করে, 'বাদাগা' আর কোটাদের কাছে দুধ বিক্রী করে ওর যা যা দরকার তা এনে দেয় দুধের বিনিময়ে। এই ভাবে দিন কেটে যায় ফোরির।

বিম্বু বললে—চল্ ত ফোরির কাছে। আমি নিজে কথা বলবো।

—কী কথা!

বিম্বু বিরক্ত হয়ে বললে—কী আবার! টুরার কথা।

সুঙ্গার চোখদুটো বিস্ময়ে ভরে গেলো, বললে—যে মরে গেছে তার কথা আর কী জিজ্ঞাসা করবি? এদিকে তার থেকেও ভয়ানক ব্যাপার হয়েছে গাঁয়ে।

—কী ব্যাপার!

সুঙ্গা ভীত কম্পিত কণ্ঠে বললে—লোক এসেছে গাঁয়ে।

—কী লোক!

সুঙ্গা বললে—'পার্থ-কাই'-এর লোক।

ওদের গাঁয়ে ওদের জাতের মধ্যে সব থেকে নির্ভীক, সব থেকে দুর্ধর্ষ প্রকৃতির মানুষ হচ্ছে বিম্বু। সেই বিম্বুর বুকের ভিতরটাও কেঁপে উঠলো 'পার্থ-কাই'-এর নামে। 'পার্থ-কাই' হচ্ছে ওদের জাতের মধ্যে সব থেকে বড়ো সর্দার, ওদের রাজা বিশেষ। ওদের উপত্যকারও একটু উঁচুতে ক্রোশখানেক দূরে তাঁর বাড়ি—তাঁর পুত্র-পরিজন নিয়ে বাস করেন একক এক গাঁয়ে। তিনি ডেকে পাঠান তাদের গাঁয়ের প্রধানকে। প্রধান প্রতিটি ক্রিয়াকর্ম তাঁর নির্দেশ মতো পালন করে। এই হচ্ছে চিরাচরিত রীতি। কেউ ডাকতে আসে না, প্রতিদিনই প্রধান তাঁর দু'একটি অনুচর নিয়ে দেখা করতে যান 'পার্থ-কাই'-এর সঙ্গে। তাঁর মতো অন্য গাঁয়ের অন্য প্রধানেরাও যান, যাঁর যাঁর গাঁয়ে যে-যে সমস্যা তাই নিয়ে আলোচনা করতে। এই যে টুরার ব্যাপার, এই যে টুরার প্রথম মেয়ে-সন্তান, এই যে টুরার মেয়ে-সন্তানকে দেবতার কাছে দিয়ে আসা,—এ-সবই তাঁর নির্দেশ।

সেই নির্দেশ পালন করা হয়নি, টুরা নিজেই মানেনি সেই নির্দেশ, এসব সংবাদ নিশ্চয়ই কানে গেছে 'পার্থ-কাই'-এর। আজ টুরারা মা-মেয়ে মিলে যদি মরে গিয়েও থাকে তাহলেও কি নিস্তার আছে? যারা যারা টুরার পথ নিয়েছিলো, তাদের ওপর হয়তো শাস্তি নেমে আসবে।

এ-সব চিন্তা করতে করতে রীতিমত ভীত হয়ে পড়ছিল বিম্বু। কিন্তু মুহূর্তমাত্র; পরক্ষণেই অদ্ভুত একটা মানসিক শক্তিতে ও উদ্বুদ্ধ হয়ে ওঠে। যে বন্য আর বিদ্রোহী স্বভাব ওর মধ্যে গড়ে উঠেছে দিনের পর দিন ধরে, সেই স্বভাবের জন্যই বোধ হয় দুর্জয় এক শক্তি দেখা দেয় ওর মনে। বুনো মোষের মতো চাপা একটা গর্জন জেগে ওঠে ওর কণ্ঠে। বলে—যাবো পার্থ-কাই-এর কাছে। কী করবে সে আমার?

সুঙ্গা আরও অবাক হয়, বলে—বলছিস কী! তোর কথা এর মধ্যে আলাদা করে আসে কী ভাবে?

—তবে, কাদের ওপরে পার্থ-কাই-এর রাগ?

সুঙ্গা বললে—প্রধান চলে গেছে পার্থ কাই-এর কাছে। তবু লোকটা বসে আছে গাঁয়ে। ছেলে বুড়ো মেয়ে পুরুষ, গাঁয়ের কোনো মানুষের আজ আর নাওয়া-খাওয়ার জ্ঞান নেই, লোকটাকে ঘিরে বসে এক মনে শুনে যাচ্ছে তার কথা। কী যে সর্বনাশা কথা বলে চলেছে, শুনলে তোরও বুকের রক্ত হিম হয়ে যাবে।

এবার অবাক হওয়ার পালা বিম্বুর। বললে—কী এমন কথা!

সুঙ্গা বললে—টুরা দেবতার রাগ বাড়িয়ে দিয়েছে মেয়েকে দেবতার কাছে না দিয়ে।

বিম্বু ওর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো কয়েক মুহূর্ত, তারপরে বললে—তবে যে বললি টুরা মারা গেছে!

—মারা গেছেই ত!

বিম্বু বললে—তবে আর দেবতার রাগ কিসের?

সুঞ্জা বললে—টুরা আর টুরার মেয়ে মারা গেছে পাথরের ঘায়ে। দেবতার বলি তো হয়নি!

বিম্বু বোধ হয় ভালো করে সব কথা শুনলো না সুঞ্জার, প্রথম কথাটা শুনেই মাথাটা নাড়তে লাগলো জোরে জোরে। অসহিষ্ণু করে বলে উঠলো—না না, পাথরের ঘায়ে মারা যায়নি। যদি মরে থাকে ত বাঘের পেটেই গেছে।

বলতে বলতে চোখ দুটি হিংস্রতায় জ্বলে উঠলো ধ্বক্ করে। হাত দুটো পাথরের মতো শক্ত হয়ে উঠলো বিম্বুর। দাঁতে দাঁত চেপে সে বলে উঠলো—যদি সে সত্যিই মরে গিয়ে থাকে, তাহলে তাকে মেরেছিস তোরা—সবাই মিলে। যাচ্ছি আমি ফোরির কাছে। কথা যদি সত্যি হয়, তাহলে গাঁয়ের কাউকে আর আমি আস্ত রাখব না।

ওর কথার উত্তরে কী যেন বলতে গেলো সুঞ্জা, কিন্তু কোনো কথাই কানে তুললো না বিম্বু। বুনো মোষ যেমন শিং উঁচিয়ে ছুটে যায় শত্রুর দিকে, তেমনি করে ছুটতে লাগলো বিম্বু।

আবার কী একটা বিপর্যয় ঘটে এই আশংকায় ওর পিছনে পিছনে সুঞ্জাও দৌড়তে আরম্ভ করলো। পথ একবার নীচু হয়ে আবার উঁচুতে উঠলো। উঁচু থেকে আবার নীচু। পথ এইখানে আবার বেঁকে গেছে। এই বাঁকের মুখে সুঞ্জার পোষা মোষগুলো চরছিল, তারা ওদের ছুটোছুটি দেখে অবাক হয়ে মুখ তুলে তাকালো। একটা বাছুর ত ভয় পেয়ে লেজ তুলে চক্রাকারে ঘুরতে লাগলো প্রান্তরটা।

সুঞ্জার ভ্রূক্ষেপ নেই সেদিকে, বিম্বুকে অনুসরণ করে সে ছুটে চলেছে প্রাণপণে।

বেশীদূর যেতে হলো না। গাঁয়ের মধ্যে নয়, সেই শয়তানী দাঁত-বার-করা তার সেই প্রিয় ঝাউ গাছ তলাতেই পাথরের মূর্তির মতো বসে আছে ফোরি। তার সামনে গিয়ে দুজনে থমকে দাঁড়ালো।

ফোরি মুখ তুলে নিরুৎসুক চোখে ওদের দিকে তাকালো মাত্র, আর কিছু বললো না। কী-এক গভীর চিন্তায় সে যেন মগ্ন মনে হলো।

বিষ্ণু তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো চুপ করে। আর সুঞ্জার চোখ গেলো ঝাউয়ের গাছে। ওপর থেকে নীচ পর্যন্ত প্রকাণ্ড গাছের গুঁড়িটা ভর্তি সমান্তরাল পর পর কয়েকটি রেখা পাথর দিয়ে খোদাই করে রেখেছে ফোরি। কবে থেকে সে এটা করছে কে জানে! অন্য আরেকটা গাছের রেখাগুলো সমান্তরাল নয়, লম্বালম্বি। লম্বালম্বি রেখার সংখ্যা কম সমান্তরাল রেখার থেকে।

একটা গা-ছম্-ছম্-করা অনুভূতি নিয়ে রেখাগুলো দেখছিলো সুঞ্জা, হঠাৎ চমক ভাঙলো ফোরির কণ্ঠস্বরে। মোটা অথচ ক্ষীণ কণ্ঠস্বর ফোরির কেমন যেন ভাঙা-ভাঙা। বললে—কী দেখছিস? জমা আর খরচ!

কথাটা বহুবার শুনেছে সুঞ্জা, কিন্তু অর্থ তার বুঝতে পারেনি। অথবা বুঝবার তেমন চেষ্টাও করেনি। ফোরি সমান্তরাল রেখাগুলোর দিকে আঙুল দেখিয়ে বললে—খরচ।

আর লম্বালম্বি রেখাগুলোর দিকে নির্দেশ করে বললে—জমা।

উত্তরে কিছু হয়ত বলতে যাচ্ছিল সুঞ্জা, কিন্তু ফোরির হাতের দিকে চোখ পড়ায় চম্‌কে থেমে গেল। সেই অদ্ভুত পুতুলটা রয়েছে ফোরির হাতে। ফোরির ঘরে অনেকবার দেখেছে পুতুলটা, কোনদিন হাত দিতে সাহস করেনি। কিন্তু, আজ এটা হাতে নিয়ে ফোরি বাইরে এসেছে কেন? নিশ্চয়ই খুব গুরুতর ব্যাপার!

অবাক হয়ে বিষ্ণুও দেখছে পুতুলটা। পায়ের কাছটা ভেঙে গেছে, দেখেই মনে হয়, অনেকদিনের পুরানো পুতুল। সাদা ধব্‌ধবে পুতুলটা কী দিয়ে তৈরী কে জানে! কেউ বলে পাথর দিয়ে তৈরী, কেউ বলে মাটি জমিয়ে যাদুর বলে তৈরী করা হয়েছে পুতুলটা।

একটা লোক, গায়ে কম্বল নেই, কিছু নেই,—খালি গা, কোমরের কাছে একটুকুরা কাপড় ঝুলছে শুধু। মুখে অল্প-অল্প দাড়ি, মাথার চুল তাদেরই মতো বড়ো-বড়ো। চোখ দুটি যেন আকাশের দিকে তোলা। হাত দুখানা লম্বা একটা কাঠ কিংবা পাথরের ওপর মেলে

দেওয়া। সারা দেহটাও ছড়িয়ে দেওয়া লম্বা একটা পাথর বা কাঠের ওপরে। দেখে মনে হয়, হাত দুটো দুপাশে জোর করে মেলে দিয়ে হাতের দুটি তালুতে কে যেন জোর করে পাথরের তৈরী তীক্ষ্ণ ছুরি পুঁতে দিয়েছে। নীচে পা দুটিও তাই। এমনকি বুকেও যেন পাথরের ছুরি বেঁধানো।

সুঞ্জার মনে হলো, বিম্বু বোধ হয় এর আগে কখনো দেখেনি পুতুলটা। নইলে, অবাক হয়ে অমন ভাবে দেখছে কি পুতুলটার মধ্যে ?

যে-জন্য এসেছিল, সে সমস্তই ভুলে গিয়ে বিম্বু বিহ্বল কণ্ঠে প্রশ্ন করে বসে—এটা কি ?

ফোরির মধ্যেও সেদিন কী হচ্ছিলো কে জানে, যা সে কাউকে বলে না, তাই বলে ফেললো আজ। বললে—আমার ঠাকুর্দাকে দিয়েছিল একজন। সেই থেকে আমার কাছে আছে।

—কে দিয়েছিল ?

ফোরি বললে—আমি কী করে জানবো ? আমি কী দেখেছিলাম ? আমি ত জন্মাই-ইনি। ঠাকুর্দার কাছ থেকে শুনেছি। ঠাকুর্দা তখন ছোট ছেলে। নতুন লোক এসেছিল নীচে থেকে। ঠাকুর্দা বলেছিল সে দেবতাদের লোক। আমাদের মতো লম্বা, আমাদের মতো চোখ-মুখ-নাক-কান, কুরুম্বা বা ইরুলাদের মতো নয়। আমাদের মতো মাথায় লম্বা চুল, মুখে দাড়ি।

বলতে বলতে বিচিত্র হাসি ফুটে উঠলো ফোরির মুখে, বললে—নতুন মানুষ কি নতুন এলো এই গাঁয়ে ? ঠাকুর্দা যখন ছোট তখনও এসেছে।

বিম্বু তাকালো সুঞ্জার দিকে, তারপরে সবিস্ময়ে বললে—নতুন মানুষ !

—তবে আর বলছি কী।—সুঞ্জা বললে—গাঁয়ে চল। নিজের কানেই শুনবি। পার্থ-কাই-এর কাছে নতুন মানুষ এসেছে। কুরুম্বা-

ইরুলাদের মতো কালো নয়, আমাদের মতো তামাটেও নয়, সাদা মানুষ।

উত্তেজিত হয়ে উঠে দাঁড়ালো ফোরি, বললে—হ্যাঁ ঠিক, সাদা মানুষ। ঠাকুর্দা যখন ছোট, তখন সাদা মানুষ এসেছিল গাঁয়ে। সেই প্রথম গাঁয়ে আসা সাদা মানুষের।

—তুমি নিজে দেখেছিলে কোনো সাদা মানুষ?

ফোরি বললে—দেখিনি! একটা দিনের কথাই ধর না। আমি পার্থ-কাই-এর কাছে গেছি সেদিন। পার্থ-কাই-এর লোক ডাকতে এসেছিল সেদিন আমাকে। আজও যেমন এসেছে। আমার খোঁজ করছে। আমি পালিয়ে এসেছি। আমি জানি, আমার পুতুলটা ওরা নিয়ে নেবে।

বিম্বু বললে—তা ত বুঝলাম। কিন্তু তুমি সত্যিই নিজের চোখে দেখেছিলে সাদা মানুষ?

ফোরি বললে—দেখেছি বই কি! এই যে পুতুলটা দেখছিস, এটার নীচে সাদা মানুষদের ভাষা লেখা আছে। সেটা পড়ে পড়ে সাদা মানুষ কতো কথাই না বললে আমার সঙ্গে। আমি কিছু বুঝলাম না, পার্থ-কাইও বুঝলো না, শুধু বাদাগাদের একটা লোক—সে এসেছিল সাদা মানুষের সঙ্গে, সে বুঝলো। সে নিজে বুঝলো, আমাদেরও বুঝিয়ে দিলো।

সুপ্পা বললে—কবেকার কথা বলছো তুমি ফোরি?

ফোরি বললে—এই ত সেদিনকার কথা।

তারপরেই, আরেকটা ঝাউগাছের কাছে গেলো ফোরি। এই গাছটার নীচে পাথর দিয়ে বিন্দুর মতো কয়েকটা গোল গোল দাগ করেছে ফোরি। সেই দাগগুলো গুণে সে বললে—সাত বছর। সাত বছর হলো। সাত বছর আগে পার্থ-কাই-এর গাঁয়ে দুজন সাদা মানুষ এসেছিল সঙ্গে বাদাগাদের কয়েকজনকে নিয়ে। সেই সাত বছর পরে এই আবার এলো।

সুঞ্জা বললে—ভুল বলছো তুমি। গত বছরেও ত এসেছিল দুজন সাদা মানুষ, মনে নেই? পার্থ-কাই তাদের তাড়িয়ে দিয়েছিল।

ফোরি চিন্তিত ভঙ্গীতে মাথা নাড়লো, তারপর বললে—তা হবে। আমি তাদের দেখিনি। দেখবো কেন? তারা ত আমার এই পুতুলটাকে কেড়ে নিতে চায়নি?

সুঞ্জা বললে—তারা চায়নি বটে কিন্তু ছয় বছর আগে যারা এসেছিল, সেই তারা? তারা কি করেছিল?

বিম্বু বললে—তোমার পুতুলটা ওরা সেদিন নেয়নি?

ফোরি বললে—নিতে চেয়েছিল, আমি দিইনি।

বিম্বু সুঞ্জাকে বললে—সাদা মানুষ পাহাড়ে আসে কেন রে? কোথা থেকে আসে তারা?

সুঞ্জা বললে—'ওম্ নোড়' থেকে (স্বর্গ থেকে)।

—কোথায় 'ওম্ নোড়'?

—'পির্জ্' জানেন (সূর্যদেব জানেন)।

মুখখানা ঘুরিয়ে আকাশের দিকে তাকায় বিম্বু। মনে মনে সূর্যদেবকে সে বোধ হয় প্রশ্ন করে—স্বর্গ কোথায় জানো? টুরা যদি মরে গিয়ে থাকে, তাহলে কোথায় গেছে তার আত্মা, জানো?

তারপরেই মুখ ফেরায় ফোরির দিকে, উত্তেজিত এবং সাগ্রহ কণ্ঠে সে প্রশ্ন করে—কোথায় টুরা?

—মরে গেছে।

—কী করে জানলে তুমি?

মুখ টিপে হাসলো ফোরি, তারপর তার সেই শয়তানী গাছটার কাছে গেলো সে। যে গাছটার গায়ে সমান্তরাল রেখাগুলো সে পাথর ঘষে ঘষে ফুটিয়ে রেখেছে। কাছে গিয়ে নীচু হয়ে বসে পড়লো। বসে পড়ে সে শেষ দুটি রেখার ওপর হাত রাখলো। বিম্বু আর সুঞ্জা দুজনে হেঁট হয়ে দেখলো দুটি সমান্তরাল রেখা সদ্য সদ্য পাথর দিয়ে কেটে কেটে তোলা হয়েছে।

ফোরি অদ্ভুতভাবে হেসে উঠলো, বললে—একজন হচ্ছে টুরা, আরেকজন হচ্ছে টুরার মেয়ে। এ আমার খরচের হিসাব। যারা চলে যায়, তাদের হিসাব আমি রেখে দিই। আর, ঐ গাছটা দেখ? ঐ লম্বালম্বি রেখাগুলো দেখছিস? ও-ও আমার হিসাব। যারা আসে, তাদের হিসাব।

বলতে বলতে গলাটা ধরে এলো ফোরির, বললে—মিলিয়ে দেখ, কতো কম আসে আর কতো বেশী যায়। এমনি করলে এ-জাত টিকবে আর কদিন?

চোখের সামনে আজ এক রহস্যের উদ্ঘাটনই হয় বটে। এতদিনে সুঞ্জা আর বিম্বু বুঝতে পারে বিচিত্র এই রেখাগুলোর রহস্য! এবং জানতে পেরে ফোরির ওপরে তাদের একটা মায়া আসে। ওকে পাগল বলে সবাই দূরে রেখেছে, হয়ত ও ঠিক পাগল নয়। ওকে হয়ত বুঝতে পারে না সবাই।

বিম্বু বৃদ্ধের পায়ের কাছে বসে পড়ে। জিজ্ঞাসা করে—টুরা যে মারা গেছে, তুমি বুঝলে কী করে?

চুপ করে রইলো বৃদ্ধ। তারপরে দেখা গেলো, চোখ দুটো তার জলে ভিজে উঠেছে।

আবার জিজ্ঞাসা করে বিম্বু—তুমি বুঝলে কী করে?

বলতে বলতে ওকে ধরে উত্তেজনায় ঝাঁকি দেয় বিম্বু।

বৃদ্ধর হাত থেকে পড়ে যায় পুতুলটা, সে তাড়াতাড়ি কুড়িয়ে নেয় সেটা। তারপরে বলে—কী করে জানতে পারি তোকে বলবো কেন রে?

—কেন বলবে না?

—না না, বলবো না। যা, পালা।

বিম্বু জীর্ণ শীর্ণ বৃদ্ধকে আবার দু'হাতে শক্ত করে ধরে, বলে—বলতেই হবে তোমাকে, কিছুতেই ছাড়বো না।

টানাটানি ধরাধরিতে আবার চোখে জল এসে পড়ে বৃদ্ধের,

বলে—টুরা আর তার মেয়ে জাতের বাইরে হয়ে গেছে আমাদের। তাই না? দাঁড়ালো কী? কোনো গতিকে জঙ্গলে যদি ও বেঁচেই থাকে, জাতের দিক থেকে সেটা মরাই হলো না কি? জাতে-মরাকে নিয়ে তোদেরই বা অতো মাথাব্যথা কেন বাপু? জাতের মধ্যে আর বউ নেই? তাদের কাউকে গিয়ে বউ কর না বাপু!

বিম্মু ওকে ছেড়ে দিয়েছে ততক্ষণে। বললে—প্রাণে মরেছে কিনা তা তুমি জানো না তাহলে?

ফোরি বিরক্ত হলো, রেগেও গেলো ওর কথায়, বললে—প্রাণটা আছে ঐ সাদা মানুষটার মুঠোর মধ্যে, তা জানিস? চলে যা ক্রোশ খানিক হেঁটে, পার্থ-কাই-এর গাঁয়ে। দেখতে পাবি নিজের চোখে।

—কাকে? টুরাকে?

ফোরি বললে—না, টুরার প্রাণকে।

—প্রাণ কি দেখা যায়?

ফোরি বললে—না গেলেও বোঝা যায়। সাদা মানুষটার কাছে গিয়ে কাকুতি-মিনতি করবি, তার মন যদি গলে, ঠিক সে দেখিয়ে দেবে।

বিম্মু সচকিত হলো কথাটা শুনে। সুঞ্জাকে বললে—যাবি?

সুঞ্জা বললে—পাগলের কথা বিশ্বাস করছিস তুই?

বিম্মু বললে—দেখাই যাক না।

সুঞ্জা অগত্যা বললে—চল্।

তারপরেই আবার বললে—কিন্তু, একবার ঘুরে যাবি না গাঁয়ে?

বিম্মু বললে—কী দরকার? খোদ পার্থ-কাই-এর সঙ্গেই দেখা হবে। তার লোক কী বলছে-না-বলছে, সে শুনে আর লাভ কী হবে? যা শোনবার পার্থ-কাই-এর নিজের মুখ থেকেই শোনা যাবে।

সুঞ্জা বললে—তাহলে চল।

ওরা দুজনেই রওনা হলো। কিন্তু পার্থ-কাই-এর গাঁয়ে ওদের জন্য কতো বড়ো বিস্ময় যে অপেক্ষা করছিলো, ওরা কি তা ঘুণাক্ষরেও ভাবতে পেরেছিল!

[যে-সময়কার কথা বলছি, সেটা ১৮১৯ খৃষ্টাব্দ। সতীদাহ নিবারণ আইন বিধিবদ্ধ হবার দশ বছর আগেকার ঘটনাকাল। “লর্ড ময়রা বা মার্কুইস্ অব হেস্টিংস্”-এর রাজত্ব চলছে সেই সময়। ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে দাক্ষিণাত্যের শেষ প্রতিরোধ-শক্তি—মারাঠাদল আত্মসমর্পণ করেছে। ছত্রপতি শিবাজীর সঙ্গে যে হিন্দু-রাজশক্তির অভ্যুত্থান হয়েছিল, প্রায় দেড়শো বছরের মধ্যেই তার সার্বভৌম ক্ষমতার বিলোপ সাধন ঘটে গেছে। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে শেষবারের মতো মাথা তোলবার চেষ্টা করেছিল মারাঠারা ; ইংরেজরা যাকে ‘অসাধারণ কুচক্রী ও কুটবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি’ বলে বর্ণনা করে গেছেন, পেশোয়া বাজীরাও-এর বিশ্বস্ত সেই সঙ্গী ‘ত্রিম্বকজী দাঙ্গলিয়া’ পেশোয়াকে উদ্বুদ্ধ করে শেষবারের মতো প্রবল যুদ্ধের সামনে এসে দাঁড়িয়েছিলেন ইংরেজ-সেনাপতি ক্যাপ্টেন স্টানটনের বিরুদ্ধে, কিন্তু জয়ী হতে পারেননি। দাক্ষিণাত্যে ইংরেজদের বিপক্ষে এটাকেই শেষ যুদ্ধ বলা যায়।]

কিন্তু আমি যাদের কথা বলছি, তারা ছত্রপতি শিবাজীর নাম শোনেনি, শোনেনি লর্ড ময়রা বা হেস্টিংসের নাম ; না জানে তারা ক্যাপ্টেন স্টানটনকে, না জানে তেমনি বাজীরাও আর ত্রম্বকজী দাঙ্গলিয়াকে। ত্রম্বকজী দাঙ্গলিয়া আর পেশোয়া বাজীরাওয়ের মিলিত শক্তি যখন ক্যাপ্টেন স্টানটনের বিরুদ্ধে অস্ত্র-ঝঞ্ঝনায় মেতে উঠেছে ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে, তখন দুজন অজ্ঞাতনামা সাধারণ ইংরেজ উঠে এসেছে নীলগিরির এই স্নিগ্ধ প্রশান্ত উপত্যকায়, আর প্রস্তর-খণ্ড-দিয়ে-ঘেরা তার বাড়ির সিংহদরজার সামনে দাঁড়িয়ে দূর থেকে বিস্মিত বিহ্বল দৃষ্টি মেলে সেই দুজন বিচিত্র আগন্তুককে লক্ষ্য করেছে টোডা-রাজা পার্থ-কাই আর তার পার্শ্ববর্তীরা।

বিচিত্র আগন্তুকদ্বয় কাছে এসেছে, দরজার কাছের ঐ শোয়ানো পাথরটার ওপর বসে তৃষ্ণার্ত হয়ে জলের পরিবর্তে দুধ খেয়ে গেছে। পার্থ-কাই ভয় পেয়েছে, কিন্তু তবু বলেছে—আমার বাড়ি আমি দেবো না। দেবো না তোমাদের হাতে তুলে আমাদের এই উপত্যকা!

সেদিনও ওদের ছুজনকে পথ দেখিয়ে এনেছিল এই আজকের মতো বাদাগাদেরই একটি লোক। সেদিনও আজকের মতো বাদাগাদের লোকটি ওদের কথা সাদা মানুষদের কোনক্রমে বুঝিয়ে দিচ্ছিল। 'সাদা মানুষ ছুজন' পার্থ-কাই-এর কথার তাৎপর্য বুঝে প্রতিবাদের সুরে বলেছিল—না না, আমরা তোমাদের বাড়ি নিতে আসিনি। আমরা এসেছি শুধু তোমাদের দেখতে।

পার্থ-কাই বলেছিল—এখানে থাকতেও তোমাদের দেবো না। আমরা শান্ত নিরীহ জাত, কিন্তু দরকার হলে আমরাও রুখে দাঁড়াতে জানি। যে-মাটিতে দাঁড়িয়ে আছি, সে মাটির এক কণাও তোমাদের আমি দেবো না।

সেদিনকার সেই শেষ মারাঠা-যুদ্ধে 'ত্রম্বকজী দাঙ্গলিয়া'ও সম্ভবতঃ এমনি করে ইংরেজ সেনাপতিদের মুখের ওপর বলেছিল—যে মাটিতে দাঁড়িয়ে আছি, সে মাটির এক কণাও তোমাদের আমি দেবো না।

সেদিনকার সেই রণাঙ্গনে 'ত্রম্বকজী ও বাজী রাও'-এর মিলিত শক্তি ছিল বিশ হাজার সশস্ত্র সৈন্য। আর, এই সামান্য সাধারণ টোডা-নৃপতির অধীনে স্ত্রীপুরুষ-বালক-বৃদ্ধ-নির্বিশেষে টোডা-জাতের সর্বশুদ্ধ লোকসংখ্যা এক হাজারও ছিল কিনা সন্দেহ। তাও তারা বিচ্ছিন্ন, অস্ত্রহীন,—শ্যামল উপত্যকায় মহিষ চরানো যাযাবর প্রকৃতির মানুষ।

'সাদা মানুষ ছুজন' পার্থ-কাই-এর কথার উত্তরে একটু হেসে উঠে দাঁড়িয়েছিল, বলেছিল—আমরা থাকতেও আসিনি। রাজা মিছিমিছি এত উত্তেজিত হচ্ছেন কেন ?

পার্থ-কাই-এর পক্ষে বিশেষ কারণ ছিল এ-উত্তেজনার। 'সাদা মানুষ ছুজন'-এর এই যে আবির্ভাব, এর ছয় বছর আগে এমনি ছুজন 'সাদা মানুষ'কে এমনি করেই চর্মচক্ষে দেখেছিল পার্থ-কাই। তারা ছুজন বলেছিল—তারা এখানে থাকবে, তারা হটিয়ে দেবে পার্থ-কাইদের, তারা এখানে নিজেরা ঘর বাঁধবে। পাগল ফোরির কাছে আছে এক

অদ্ভুত পুতুল, সেটি পর্যন্ত তারা কেড়ে নেবার চেষ্টা করেছিল। সমবেত টোডার দল ক্ষেপে উঠেছিল সেদিন, তাদের সাবেক পাথরের অস্ত্র হাতে নিয়ে একসঙ্গে রুখে উঠেছিল তারা। তাদের সেই রণমূর্তি দেখে সেদিনকার 'সাদা মানুষ দুজন' আর দাঁড়ায়নি, বাদাগাদের লোকটিকে সঙ্গে নিয়ে পাহাড়ী পথ বেয়ে তর্‌তর্‌ করে নেমে গিয়েছিল পাহাড়ের নীচে।

ছয় বছর পরে আবার যখন এলো এই দুজন সাদা মানুষ তখন তাদের দেখে পার্থ-কাই-এর মনে সেই পূর্ব-বিভীষিকা জেগে ওঠাই স্বাভাবিক। সে তাই সাদা মানুষদের কোনো কথাই শুনলো না, বললে—চলে যাও, তোমাদের এখানে থাকতেও দেবো না।

'সাদা মানুষরা' বলেছিল—যাচ্ছি চলে এখনই। কিন্তু এতদূর উঠে এসে আমাদের তেষ্টা পেয়েছে, একটু জলও দেবে না ?

টোডাদের বাড়ির সামনে পাথরের ওপর পাথর বসিয়ে অনতি-উচ্চ একটা স্তম্ভের মতো তৈরী করে রাখা হয়, তার ওপরে দেবতাদের উদ্দেশে অর্ঘ সাজিয়ে দেওয়া হয়। সেই প্রস্তরস্তম্ভের ঠিক নীচেই ছিল শোয়ানো বড়ো একটা পাথর।

পার্থ-কাই বললে—বোসো তোমরা ওখানে।

তারপর জল নয়, দুধ এনে দেওয়া হয়েছিল ওদের। 'টু-এল' বা গোয়াল ঘর থেকে একটা পাথরের পাত্রে খানিকটা দুধ নিয়ে এলো জোয়ান চেহারার একটি মানুষ, আর সেই পাত্র হাতে নিয়ে সাদা মানুষের সামনে গিয়ে দাঁড়ালো পার্থ-কাই-এর তরুণী মেয়ে। অতিথি আপ্যায়নের যে প্রথা ছিলো, সে-প্রথার কোনো ত্রুটি সেদিন অবশ্য রাখেনি পার্থ-কাই। 'সাদা মানুষ দুজন' অবাক হয়ে তাকিয়ে ছিলো রাজকন্যার মুখের দিকে।

রাজকন্যা ফিরে এলো শূন্য পাত্র নিয়ে, অতিথিরাও চলে গেলো। ধীরে ধীরে পাহাড়ের পথ ধরে নামতে নামতে একসময় তারা মিলিয়ে গেলো তরুশ্রেণীর অন্তরালে।

পার্থ-কাই-এর পার্শ্ববর্তী এক বুড়ো বললে—এদের ছ'বছর আগে দুজন সাদা মানুষ এসেছিলো ত ? তুই দেখেছিলি তাদের পার্থ-কাই। কিন্তু, তারও দশবছর আগে একজন সাদা মানুষকে আমি দেখেছিলাম। এদিকে সে আসেনি, সোজা চলে গিয়েছিলো মুকেতি পাহাড়ের দিকে।

পার্থ-কাই গম্ভীর মুখে বললে—জানি, নিজে না দেখলেও শুনেছিলাম সে কথা। এরা ভালো লোক নয়, আমাদের তাড়িয়ে দিতে চায়।

[যাঁর কথা এরা আলোচনা করছে, তাঁর নাম ডাঃ বুকানন। ১৮০২ খৃষ্টাব্দে তিনিই প্রথম ইংরেজ, যিনি নীলগিরি আরোহণ করেন। এঁকেই প্রথম ইয়োরোপীয় বলা যেতে পারত, যদি না আমরা জানতাম পর্তুগীজ পুরোহিত 'ফেরেইরি'র কথা। ইনি এসেছিলেন ১৬০২ খৃষ্টাব্দে। শুধু ইয়োরোপীয়ান বলে নয়, নীলগিরিতে প্রথম সভ্য মানুষের পদপাত হিসাবেও তাঁর আগমনকালটি ইতিহাসে চিহ্নিত হয়ে থাকবার যোগ্য। ১৬০২ সাল, মোগল সম্রাট আকবরের জীবদ্দশাকাল বলা চলে। দিল্লীর দরবারে প্রথম ইংরেজ স্যার টমাস রো আসেন ১৬১৫ সালে—আর পর্তুগীজ 'ফেরেইরি' আসেন নীলগিরিতে উন্মুক্ত এবং অবারিত প্রকৃতির দরবারে, এই ঘটনার তেরো বছর আগে। ১৬০২ সালেই 'পাদ্রী ফেরেইরি' যীশুর একটি মূর্তি উপহার দিয়েছিলেন পাগল 'ফোরি'র ঠাকুর্দার বাবাকে। যে মূর্তিটাকে পাগল ফোরি আজও মাত্র একটা পুতুল বলেই জানে, এবং যে-মূর্তিটিকে সে ছয় বছর আগে 'স্বর্গের মানুষদের' হাতে, তাদের আগ্রহ সত্ত্বেও, তুলে দেয়নি। না তুলে দিলেও, 'স্বর্গের মানুষ'রা পুতুলের পায়ের নীচেকার লেখাটি ভালোভাবেই পড়ে নিয়ে গিয়েছিলো। সে-নামটিই হচ্ছে পাদ্রী 'ফেরেইরি'র নাম। এবং পাগল ফোরি জানে না, তার ঠাকুর্দার বাবা পাদ্রীর নামটি জেনে রেখেছিলেন, আর পরবর্তী কালে মুখে-মুখে 'ফেরেইরি' নামটি হয়ে যায় 'ফেরি'। এই 'ফেরি'ই ফোরিতে পরিণত হয়ে দাঁড়িয়ে

গেছে তার নিজের নামে। পাগল ফোরি শুধু পর্তুগীজ পুরোহিতের স্মৃতি উপহারই বহন করছে না, নিজের অজ্ঞাতে তার নামও বহন করে চলেছে।

কিন্তু, থাক এখন পাদ্রী ফেরেইরির কথা। ফেরেইরি এসেছিলেন মাত্র পর্যটক হিসাবে, খ্রীষ্টধর্ম প্রচারক হিসাবেও নয়, কিংবা রাজ্য-স্থাপনের গোপন দূত হিসাবেও নয়। সেদিক থেকে বরং ১৮০২ সালটাই তাৎপর্যপূর্ণ। ১৮০২ খৃষ্টাব্দের শেষের দিকে ইংরেজ সেনাপতি কর্ণেল ক্লোজ আর বাজী রাও-এর সঙ্গে 'বেসিনের সন্ধি' হয়েছে। যার সর্ত, কামান সমেত ছয় হাজার ইংরেজ সৈন্য রাখতে হবে পেশোয়াকে, এবং তাদের ভরণপোষণের জন্য দাক্ষিণাত্যে বছরে ছাব্বিশ লক্ষ টাকা আয়ের বেশ কিছু 'স্থান' ছেড়ে দিতে হবে, তারপরে ইংরেজ নয় এমন কোনো ইয়োরোপবাসীকে চাকরী দেওয়া চলবে না, ইত্যাদি।

এই ঐতিহাসিক 'সন্ধি'র লগ্নেই ডাঃ বুকানন উঠে এলেন নীলগিরিতে। তাঁর পর্যবেক্ষণের ফল অচিরেই ফলেছিলো। দশ বছর পরে তাঁরই পথ ধরে এলেন দুজন ইংরেজ—'কীজ আর ম্যাকমাহোন'। পার্থ-কাই এদের ব্যবহারেই ক্রুদ্ধ হয়েছিলো. তার পুতুলটা নিতে চাওয়ায় পাগল ফোরি এদেরই হাত থেকে পালিয়ে বেঁচেছিলো।

এদের ছয় বছর পরে আবার এলো দুজন ইংরেজ, যারা পার্থ-কাই-এর দরজায় পার্থ-কাই-এর কন্যার হাত থেকে দুধের পাত্র নিয়ে তাদের তৃষ্ণা নিবারণ করেছিলো।

এই দুজন চলে যাবার একটি বছর পর, অর্থাৎ ১৮১৯ সালে, যে-সময়কার কথা দিয়ে আমি এ আখ্যায়িকা শুরু করেছি, এলেন সদলবলে এক ইংরেজ, ইনি কৈম্বাটুরের তদানীন্তন রাজপ্রতিনিধি—'জন সুলিভান।']

পার্থ-কাই-এর বাড়ির সামনেকার প্রস্তরস্তম্ভটির কাছেই সেই

শোয়ানো পাথরটার ওপর কার্পেট বিছিয়ে দিয়েছে সাহেবের এক অনুচর। সেই কার্পেটের ওপরে বসে পার্থ-কাই-এর সঙ্গে দোভাষীর সাহায্যে আলাপ-আলোচনা করছিলেন 'জন সুলিভান।' এসেছেন তিনি বহুক্ষণ, তাঁর সঙ্গে কথা বলতে বলতে একসময় উঠে গিয়েছিলো পার্থ-কাই। উঠে তার জনকয়েক বিশ্বাসী লোকজনদের পাঠিয়ে দিয়েছিলো বিভিন্ন গাঁয়ে, গাঁও-বুড়োদের খবর দিতে।

সেই খবর পেয়েই সুঞ্জা ছুটে গিয়ে খোঁজ করছিলো বিম্বুর। বিম্বুকে সে পেলো, তারপরে গেলো দুজনে ফোরির কাছে।

ফোরির কাছ থেকে সরাসরি দুজনে হেঁটে এসেছে পার্থ-কাই-এর কাছে, পার্থ-কাই-এর বাড়ীর সামনেকার সেই প্রস্তর-স্তম্ভটির সামনে।

'সাদা মানুষ' একজন নয়, সঙ্গে আরও দুজন। পাথরের ওপরে গালিচা বিছিয়ে যিনি বসেছেন, তিনি নিশ্চয়ই সাদা মানুষদের 'রাজা-টাজা' কেউ হবেন, কিন্তু বাকী দুজনও কম যান না। তাদের ভাবভঙ্গীতেও এমন একটা মর্যাদা ফুটে উঠছে যা দেখে মনটা আপনি নুয়ে পড়তে চায়।

সাদা-মানুষদের 'রাজা' কী যেন বললেন, মুখ তুলে ওদের একজন কী যেন উত্তর দিলেন। সুঞ্জা সব দেখেশুনে যেন পাথরের মতো শক্ত হয়ে গেছে। বিম্বুর প্রথমে মনে হচ্ছিল, জল-পিপাসায় গলা শুকিয়ে মানুষ যখন পাগলের মতো ঝর্ণার জল খোঁজে, আর মাঠের এধারে-ওধারে সব জায়গাতেই ঝর্ণার জলের ছায়া দেখতে পায়, ঠিক তেমনি হয়েছে তার অবস্থা। সে সত্যিই মানুষ দেখছে, না, মানুষের ছায়া দেখছে, তা ঠিক হৃদয়ঙ্গম করতে পারছিল না। তাদের জাতের লোকগুলো কিংবা পার্থ-কাই নিজে,—সব যেন ছায়ার মানুষ, আসল মানুষ নয়। ওদের দুজনকে দেখে তারা একবার নিস্পৃহ ভঙ্গীতে মুখ তুলে তাকালো মাত্র, আর কিছুই

না। ছড়িয়ে-ছড়িয়ে ভাগ করে সব এধারে ওধারে বসে আছে,—এখানে তিনজন, ওখানে চারজন—এমনিভাবে।

কিছুক্ষণ পরে বিম্বু যেন স্বপ্ন থেকে জেগে উঠলো, তারপরে 'সাদা-মানুষদের রাজা'র সামনে যে বাচ্চাটাকে কম্বল মুড়ি দিয়ে শুইয়ে রেখে অন্য দুজন সাদা মানুষ কী-সব করছে, সেই বাচ্চাটার মুখের দিকে তাকাতে-তাকাতে বিম্বুর সম্বিৎ যেন হঠাৎই একসময় ফিরে এলো। ইচ্ছা হলো, সুঞ্জাকে কনুই দিয়ে ঠেলা দিয়ে জিজ্ঞাসা করে—যা দেখছি, ঠিক দেখছি ত ?

কিন্তু না, বিম্বু তা করলো না। বিম্বুর ভয় হলো, যদি সুঞ্জা উত্তরে বলে, না, যা দেখছো ঠিক দেখছো না, সব তোমার ভুল, টুরার বাচ্চা মেয়ে ও-বাচ্চাটা নয়।

এই সময় পাথরের পাত্রে জল নিয়ে এসে সাদা মানুষদের কাছে ঐ বাচ্চা মেয়েটার সামনে পাত্রটা ঠক করে নামিয়ে রাখলো পার্থ-কাই-এর মেয়ে। ভালো করে তাকিয়ে দেখলো বিম্বু, জলটা বোধ হয় গরম, অল্প অল্প ধোঁয়া উঠছে।

সাদা মানুষদের একজন 'বাদাগা অনুচর'-এর সাহায্যে মেয়েটিকে জিজ্ঞাসা করলো অদ্ভুত একটা কথা। সাদা মানুষ বাদাগা-বুড়োকে কী যেন বললে। বাদাগা-বুড়ো বিম্বুদের ভাষায় মেয়েটিকে জিজ্ঞাসা করলো কথাটা। জিজ্ঞাসা করলো—'কেমন আছে' ?

কিন্তু, কথাটার মানে কী ? কে 'কেমন আছে' ? বাচ্চাটা, না, অন্য কেউ ?

নিজের অজ্ঞাতসারেই সামনের দিকে ছুটে গেলো বিম্বু। কিন্তু কে যেন উঠে দাঁড়িয়ে তাকে ধরে ফেললো, বললো—না না, ওদিকে যেও না।

উত্তেজিত কণ্ঠে প্রশ্ন করে বসলো বিম্বু—কী করছে ওরা বাচ্চাটাকে নিয়ে ?

—বাঁচাচ্ছে।

—কেন! মরে গেছে নাকি?

—মরারই সামিল। দেখছিস না, নড়ছে না চড়ছে না, চীৎকার করে কাঁদছে না!

কে এক বুড়ো যেন বললে—চুপ চুপ। আঃ! কথা নয়, সাদা মানুষরা রেগে যাবে। তোরা সরে যা এখান থেকে।

বিন্থু যার সঙ্গে কথা বলছিলো, সে তাকে হাত ধরে সরিয়ে আনলো। সরিয়ে আনলো যেখানে সে দাঁড়িয়েছিলো ইতিপূর্বে, সেইখানে। তারা ফিরে আসতেই সুঞ্জার চেতনাও যেন ফিরে এলো। সে ফিস্‌ফিস্‌ করে বললে—সত্যিই ও টুরার মেয়ে?

—হ্যাঁ।

—টুরা কোথায়?

—টু-এল্‌-এ।

বিন্থু পর্যন্ত চমকে উঠলো এ-কথায়। 'টু-এল'-এর অর্থ গোয়াল-ঘর। গোয়ালঘরে মেয়েদের ঢোকবার নিয়ম নেই। তার ওপরে, স্বয়ং পার্থ-কাই-এর গোয়ালঘর! সেখানে এ-ব্যাপার সংঘটিত হলো কী করে?

লোকটি বললে—সাদা মানুষরা জোর করে গোয়ালে ঢুকিয়ে দিয়েছে টুরাকে। ওদের সঙ্গে পারবে কে?

—পার্থ-কাই?

—হ্যাঁ, পার্থ-কাই রুখে দাঁড়িয়েছিলো প্রথমটায়। কিন্তু মেয়েটার অবস্থা দেখেই আর কিছু বলতে পারলো না।

—কার অবস্থা? টুরার?

—হ্যাঁ।

সুঞ্জা বললে—হয়েছিল কি টুরার?

—রক্তে ভেসে যাচ্ছে। ও কি বাঁচবে?

অস্ফুট একটা চীৎকার করে সুঞ্জা নীরব হয়ে গেলো। তারপরে ওরা তিনজনেই বসে পড়লো পাথরের ওপর। পাথর আর পাথর—

জায়গাটার এধারে-ওধারে প্রচুর চটালো-চটালো পাথর পড়ে আছে। কতোগুলো আবার ওঠানো যায় না, মাটির সঙ্গে গাঁথা। তেমনি একটা ভূপ্রোথিত পাথরকে ওরা আশ্রয় করলো। সুঞ্জা কোনো কথা বলতে পারছে না, সবটা মিলিয়ে কেমন যেন অদ্ভুত ভোজবাজীর মতো ঠেকছে তার কাছে। সে মুখ ফিরিয়ে বললে—বিম্বু ?

—কী ?

সুঞ্জা বললে—আজ বেশ গরম পড়েছে, না ?

—হ্যাঁ, তা পড়েছে।

সুঞ্জা একটুক্ষণ চুপ করে রইলো। তারপরে আবার এক সময়ে বললে—গরম জল দিয়ে করছে কি ঐ সাদা মানুষটা ?

—শুধুই কি গরম জল ?

শুধু ওরা তিনজন কেন, উপস্থিত সব কজন পাহাড়ী মানুষই উৎকণ্ঠায় উঠে দাঁড়ালো প্রায় একসঙ্গে। একজন সাদা মানুষ বাদাগা-বুড়োর কাছ থেকে কী একটা চৌকো-মতন চেয়ে নিলো, সেটা খুলে ফেললো সাদা মানুষটা, কী একটা বার করলো, লম্বা-লম্বা দেখতে। বাঁশের চোঙা কী ? না না, তা নয়। পাথরের লম্বা পাত্র কী ? হ্যাঁ, অনেকটা তাই বটে, কিন্তু সবটা নয়। সেই লম্বা পাত্রটা নিয়ে একজন সাদা মানুষ চলে গেল 'টু-এল'-এর মধ্যে, এবং কয়েক মুহূর্ত পরেই আবার ফিরে এলো। ফিরে এসে, অপর সাদা মানুষটিকে সেটা দিতেই, সে সেটা নিয়ে বাচ্চার মুখের কাছে ধরলো। বাচ্চা কি খেতে পারলো ? ওরা সবাই ঘাড় উঁচু করে সেটা দেখবার চেষ্টা করলো, কিন্তু সঠিক বুঝতে পারলো না।

বিম্বু অস্ফুট কণ্ঠে বললে—করছে কি ওরা ?

সঙ্গের লোকটি বললে—তুক্‌তাক্ করছে আর কী। জল-পড়া দিচ্ছে।

—বাঁচবে ?

—কে জানে !

—টুরা ?

—কে জানে। সাড়াশব্দ ত নেই !

ওরা তিনজন আবার বসে পড়লো। সব মিলিয়ে সব কিছু এখনো যেন বিশ্বাসযোগ্য মনে হচ্ছে না। টুরা ত হারিয়ে গেছে। বিম্বু নিজের মনে নিজেকেই প্রশ্ন করতে লাগলো—আমি খুঁজলাম, পাথরের গায়ে রক্ত দেখলাম, একবার মনে হলো, বাঘে ধরেছে কী ? আবার মনে হলো, কুরুম্বারা ধরেনি ত ? ওপরের লোকগুলো ত কুরুম্বাদের দেখতে পেয়েই পালিয়ে গিয়েছিলো ! কুরুম্বারা যদি ধরে থাকে ত এখানে, পার্থ-কাই এর কাছে ওরা এরই মধ্যে এসে পড়লো কী করে ?

সুঞ্জাও ভাবছে। ভাবছে, টুরা তার বাচ্চাকে নিয়ে পাহাড়ের নীচে—জঙ্গলে—হারিয়ে গেলো। এরা পাথর ছুঁড়ছিলো, এরা ভাবলো, পাথর লেগেই টুরা মারা গেছে ! কিন্তু, বিম্বুর তা মনে হলো না। বিম্বু ঘুরপথে নীচে নামলো। কতক্ষণ খোঁজাখুঁজি করলো, পেলো না। আমি একবার নীচের দিকে তাকাচ্ছি, একবার ওপরের দিকে। আমার মোষগুলোকে আমি অন্য দিকে চরাতে নিয়ে গেলাম। তারপরে তাদের ছেড়ে দিয়ে আবার চলে এলাম বনের ধারে। নীচের দিকে তাকিয়ে খুঁজতে লাগলাম বিম্বুকে। পেলাম না। ভাবলাম, ওকে বাঘে ধরলো নাকি। মনটা খারাপ হয়ে গেলো, চলে এসে চুপচাপ বসে আছি, সামনে মোষগুলো চরছে, ফোরির সঙ্গে দেখা। ফোরির সঙ্গে কতক্ষণ কথা বললাম। আবোল-তাবোল আজে-বাজে কথা, যার একটিও এই মুহূর্তে মনে পড়ছে না। ফোরির কাছ থেকে ফিরে আসছি, গাঁয়ের একটি লোকের সঙ্গে দেখা। সে-ই বললে, পার্থ-কাই-এর কাছ থেকে লোক এসেছে। গেলাম তার কাছে। সে বললে, সাদা মানুষ এসেছে। তোমাদের কর্তাদের ডাকো। পার্থ-কাই ডাকছে।

সবই সে বললো, কিন্তু টুরার কথা বললো না কেন ? হয়ত জানত না। হয়ত সাদা মানুষ আসার উত্তেজনায় অন্যকিছু খেয়াল

করেও দেখেনি। আর, তারপর আমি ছুটে এলাম আবার জঙ্গলের ধারে। কিছুক্ষণ খোঁজাখুঁজি করলাম। বিম্বুর নাম ধরে ডাকলাম, টুরার নাম ধরে ডাকলাম। এক সময় দেখলাম বিম্বুকে। ও উঠে এলো। জিজ্ঞাসা করলো—টুরাকে পাওয়া গেছে নাকি? আমি কি সত্যিকথাটা জানতাম? জানতাম কি, যাকে খুঁজে খুঁজে আমরা হয়রান হয়ে গেলাম, তাকে পাওয়া গেছে?

আপন চিন্তায় আপনি বিভোর হয়ে আছে সুঙ্গা, বিম্বুর কণ্ঠস্বরে সে তাই চমকে উঠলো। বিম্বু তখন জিজ্ঞাসা করছিলো সঙ্গের লোকটিকে—পাওয়া গেল কী করে টুরাকে?

লোকটি চুপিচুপি বললে—সে বড় ভয়ানক কথা!

—কেন? ভয়ানক কথা কেন? বলা যায় না?

লোকটি বললে—যায়, কিন্তু শুনলে তোদের গায়ে কাঁটা দেবে।

বিম্বু বললে—বলোই না তুমি।

লোকটি ফিস্‌ফিস্ করে ভয়-ভয় করা গলায় বলতে শুরু করলো—কুরুম্বারা যাদু জানে ত? যাদু করে ঘুম পাড়িয়ে দিয়েছিলো টুরা আর টুরার মেয়েকে। ঘুম পাড়িয়ে ওদের নিয়ে যাচ্ছিলো বনের মধ্য দিয়ে। এমন সময় ঐ বনের পথ দিয়েই বাদাগাদের নিয়ে পাহাড়ে উঠে আসছিল ঐ সাদা মানুষরা।

বিম্বু বাধা দিয়ে বললে—ঐ বনের পথ ধরে এই পাহাড়ে উঠে আসবার পথ কোথায়?

লোকটি বললে—পথ আছে, বাদাগারা হয়ত জানে, আমরা জানি না। কিংবা, সাদা মানুষরা মন্তর দিয়ে পথ করে নিয়েছে, এমনও হতে পারে।

বিম্বু বললে—বুঝলাম। কিন্তু, তারপর?

—তারপর?—লোকটি আবার তেমনি গলা নীচু করে ফিস্‌ফিসিয়ে বলতে লাগলো—কুরুম্বারা দূর থেকে সাদা মানুষদের দেখতে পেয়েই ওদের ফেলে একেবারে দে ছুট্। সাদা মানুষদের ভয় করবে না কে?

সাদা মানুষরা নাকি মন্তর দিয়ে পাথর পর্যন্ত ফাটাতে পারে। যাই হোক, ততক্ষণে কুরুম্বাদের যাদু কেটে গেছে। মাটিতে পড়ে কাতরাচ্ছে টুরা, তার মাথা থেকে রক্ত বেরুচ্ছে, পা থেকে রক্ত বেরুচ্ছে। আর তার পাশে বাচ্চাটা কঁকিয়ে কাঁদছে। সেইখান থেকে সাদা মানুষরা ওদের তুলে নিয়ে এসেছে এখানে।

—পার্থ-কাই কী বললে?

—কী আবার বলবে, চমকে উঠলো। বললে—আমাদের লোক হলেও ওদের আমরা বার করে দিয়েছি। ওদের তোমরা ফেলে দাও, ওরা মরে যাক্।

—তারপর?

—সাদা মানুষরা কথাটা শুনে ক্ষেপেই আগুন। জোর করে পার্থ-কাই-এর ঘরেই নিয়ে যাচ্ছিল ওদের, মেয়েরা চেঁচামেচি করে উঠতেই কী ভেবে যেন নিয়ে গেলো 'টু-এল্'-এর মধ্যে।

—এর পরে কী হবে?

—কিসের?

বিষ্ণু বললে—ধরো, ওরা বেঁচে গেলো—তখন?

লোকটি একটুক্ষণ কী যেন ভাবলো, তারপরে বললো—টুরাকে নিয়ে পার্থ-কাই কী করবে জানি না, কিন্তু বাচ্চা মেয়েটাকে রাখবে না।

প্রায় চীৎকারই করে উঠলো বিষ্ণু—রাখবে না! তার মানে?

চার পাশের লোকগুলো ঐ যে দুজন-চারজনে ভাগ হয়ে চিত্রার্পিতের মতো বসে ছিলো, তারা চমকে উঠলো ওর কথায়। উঠে মুখ ফিরিয়ে তাকাতে লাগলো ওর দিকে। তাদের মুখে-চোখে স্পষ্টই ফুটে উঠেছে অসীম বিরক্তি। নীরব তিরস্কারে ওরা যেন প্রত্যেকেই বলতে চাইলো—করছিস কী তোরা ওখানে? এমন অবস্থাতেও তোদের রঙ্গরস আসে? এদিকে আমাদের সবারই বলে জীবন-মরণ সমস্যা!

ততক্ষণ দূর-দূর থেকে দুজন-চারজন করে 'গাঁ-বুড়ো'রা আসতে আরম্ভ করলো। তাদের যারা ডাকতে গিয়েছিলো তারাও আছে সঙ্গে।

তারাও এলো, আর নিঃশব্দে এ-ধারে ও-ধারে বসে পড়লো, ফিসফিস করে কথা বলা শুরু করলো, ওদের সবার জিজ্ঞাসাই বোধ হয় এক। টুরা আর টুরার মেয়েকে নিয়ে কী হবে? ঐ সাদা মানুষরাই বা কী চায়?

পার্থ-কাই তার ঘরের দাওয়ায় বসে আছে। মুখখানা ফ্যাকাশে হয়ে গেছে, চুপ্‌সে গেছে। মানুষ মরে যাবার আগে যেমন তার চেহারা হয়ে যায়—রক্ত শুষে-নেওয়া পাঁশুটে চেহারা! ঠিক তেমনি দেখতে হয়েছে এখন পার্থ-কাইকে।

বিষ্ণু সেদিক থেকে মুখ ফিরিয়ে আবার তাকালো তাদের সঙ্গের লোকটির দিকে। আবার জিজ্ঞাসা করলো, এবারে ফিস্‌ফিস্‌-করা গলার স্বরে—রাখবে না?

—না।

—কী করবে?

—মুকের্তি পাহাড়ের নীচে দেবতার কাছে দিয়ে আসবে।

কথাটা শুনে ওদের মধ্যে কারুরই কোনো প্রতিক্রিয়া ঘটবার নয়। আমরা বাংলাদেশে সেই সময় মৃত পতির লেলিহান জ্বলন্ত চিতায় জীবিত পত্নীকে জোর করে ধাক্কা দিয়ে ঠেলে বা বেঁধে দিয়ে ঢাকঢোল পিটিয়ে মহাসমারোহে মেরে ফেলছি, কারুর মধ্যে কোনো প্রতিক্রিয়া ঘটছে না। তেমনি ওরাও সেই সময় নবজাতা প্রথম কন্যাকে পাহাড়ের চূড়ায় দেবতার উদ্দেশ্যে রেখে আসছে, কারুর মধ্যে সচরাচর কোনো প্রতিবাদ-বাণীই ফুটে উঠছে না।

সেই যুগে, প্রথম প্রতিবাদের সুর উঠেছিলো এক তরুণী মায়ের মধ্য থেকে। সে তার শিশুকন্যাটিকে সংস্কারের পায়ে নির্বিচারে বলি না দিয়ে প্রাণপণে ছুটে বেড়াতে লাগলো। একে বললে, আশ্রয় দাও,

ওকে বললে রক্ষা করো। কিন্তু কেউ আশ্রয় দিলো না, কেউ রক্ষা করলো না। যে সাহস করে শেষ পর্যন্ত রুখে দাঁড়ালো, যে সাহস করে শেষ পর্যন্ত আশ্রয় দিলো—সে-ও তাকে রক্ষা করতে পারলো না। মেয়েটি তখন একাই সব কিছুর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ালো। কারুর ওপর আর নির্ভর না করে শিশুকন্যাকে নিয়ে গহীন অরণ্যের দিকে ছুটে গেলো। ছুটে গেলো সহস্র বিপদ আছে জেনেও। ছুটে গেলো বন্য পশুর হাতে প্রাণ যেতে পারে জেনেও। ওপর থেকে পাথরের পর পাথর ছোঁড়া হয়েছে তাকে লক্ষ্য করে, তবু সে হার মানেনি, তবু সে ছুটে এসে বলেনি, নাও তোমরা আমার মেয়েকে, যা খুশি করো, আমাকে বাঁচতে দাও। কিসের প্রেরণা এ ?

কিন্তু হায় রে ভাগ্য! এতো করেও পালাতে পারলো না। ঘটনাচক্রে আবার এসে পড়লো যেখান থেকে সে ছুটে পালিয়েছিল ঠিক সেইখানে,—সেই সংস্কার-ঘেরা মোহান্ধ মানুষগুলোর কাছে। ওরা যে আবার ওর শিশুকন্যাটিকে ধরবে, ধরে দিয়ে আসবে মুকের্তি পাহাড়ের চূড়ায়, এতে আর আশ্চর্য কী!

কিছুক্ষণ তারপরে কেটে গেল নিশ্চুপে। পার্থ-কাই-এর বাড়ীর পিছনে নাতিবৃহৎ একটা খাদের মতো ছিলো। সেই খাদের ওপরে আবার উঠেছে অনুচ্চ একটা পাহাড় তার অরণ্যানী নিয়ে। সেই অরণ্যে একটি তরুশ্রেণীর ওপেরে আরেকটি তরুশ্রেণী থাকে-থাকে সাজানো। সেই দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে সুঞ্জার মনে হলো, ওখানেও যেন একটা সভা বসেছে। সভায় বসে থাকা চিন্তাশীল মানুষগুলোর মতোই নিশ্চল নীরব হয়ে তাদের উপত্যকার দিকে তাকিয়ে আছে বনস্পতি-নিচয়—অভাবনীয় দৃশ্য দেখতে দেখতে সুকঠিন বিস্ময়ে ওরাও বুঝি স্তম্ভিত হয়ে গেছে!

দৃষ্টি সেখান থেকে ঘুরে এলো সুঞ্জার। সাদা মানুষদের রাজার পায়ের কাছে নিশ্চল নিথর বসে আছে টুরার শ্বশুর আর স্বামী। কী যে ওদের মনোভাব বোঝা যাচ্ছে না। বাচ্চা মেয়েটিকে নিয়ে

সাদা মানুষটি কতো কী যে করছে, সেদিকে নিস্পৃহ চোখ মেলে দু-একবার তাকাচ্ছে মাত্র ওরা, কিন্তু তার আর বেশী কিছু নয়।

বেশ কিছু সময় কেটে গেলো এইভাবে। ওপারের তরুদল তাকিয়ে রইলো, ঠাণ্ডা একটা হাওয়া এসে সবার খবর নিয়ে গেলো যেন। কেউ কেউ গায়ের কম্বলটা ঠিকঠাক করে নিলো। পার্থ-কাই ঠাণ্ডা-লাগা গলায় একবার একটু কেশে উঠলো, কিন্তু তারপরে আবার সব চুপচাপ। হঠাৎ লোকগুলো যেন একসঙ্গে কথা থামিয়ে দিয়েছে, ফিস্‌ফিস্-কথা-বলার সুরটুকুও আর শোনা যায় না।

সব মিলিয়ে সুঞ্জার যেন কেমন ভয় ভয় করতে লাগলো। তার মনে হলো, তার নিঃশ্বাস যেন হঠাৎ বন্ধ হয়ে আসছে। একটা দুঃসহ অস্থিরতা তার শরীর মনটাকে যেন সাপের মতো ছোবলের পর ছোবল দিয়ে তীব্র বিষে জ্বালিয়ে দিচ্ছে। এর থেকে ওরা কেউ কথা বলুক, ওরা কেউ মারামারি করুক, ওরা কেউ ওদের পাথরের সাবেকী অস্ত্র নিয়ে খুনোখুনি করুক। এমন কি, শিশু-মেয়েটিকে যদি মেরে ফেলতে হয় ত ওকে বাঁচিয়ে তোলবার থেকে ওর পাখীর মতো নরম গলায় শক্ত হাত রেখে ওকে এখ্‌খুনি ওরা শেষ করে ফেলুক।

হঠাৎ বাঁশীর মতো তীক্ষ্ণ একটা শব্দে সচকিত হয়ে উঠলো ওরা। ওপারের তরু-সভায় একটা খুশীর হিল্লোল বয়ে গেল অতর্কিতে, বাতাস যেন সেই খুশীর খবর নিয়ে দূর দিগন্তে চলে গেলো, দূরে-দূরে বনে-বনান্তে দেখতে দেখতে সাড়া পড়ে গেলো। সবাই যেন তারা শির আন্দোলিত করে বললে, আমরা খবর পেয়েছি। আমরা খবর পেয়েছি, সে জেগে উঠেছে।

টুরার স্বামী মুখ ফিরিয়ে তাকালো শিশুটির দিকে, শ্বশুরও তাকালো। কিন্তু মুহূর্ত মাত্র, তারপরেই শ্বশুর ছেলের হাতে হাত ছুঁইয়ে কী যেন ইঙ্গিত করলো, ছেলে সঙ্গে সঙ্গে মুখ ফেরালো

অন্যদিকে। শ্বশুর তাকিয়ে রইলো সাদা মানুষদের রাজার মুখের দিকে।

ওদিকে পার্থ-কাই সোজা হয়ে বসেছিলো। তার পিছনে দরজার কাছে এক মুহূর্তের জন্য এসে দাঁড়ালো তার মেয়ে, শিশুটির দিকে একবার দৃষ্টিপাত করেই ভিতরে গেলো চলে।

বিম্বু ততক্ষণে উঠে দাঁড়িয়েছে উত্তেজনায়। সুঞ্জার হাতখানা সজোরে চেপে ধরে বললো—বেঁচে উঠেছে টুরার মেয়ে। ঐ ত হাত-পা ছুঁড়ছে, ঐ ত বাঁশীর মতো সুরে কেঁদে কেঁদে উঠছে।

হয়ত বিম্বু ছুটেই চলে যেতো মেয়েটির কাছে, সুঞ্জা ওর হাতটা শক্ত করে ধরে রইলো। আর ঠিক সেই সময় দেখা গেলো, সাদা মানুটি কম্বলে জড়িয়ে বাচ্চাটাকে নিয়ে চলেছে 'টু-এল'-এর ভিতরে, টুরার কাছে।

—মায়ের কাছে নিয়ে যাচ্ছে ?

—হ্যাঁ।

—মা-ও বেঁচে উঠেছে তা হলে ?

—কে জানে !

সঙ্গের লোকটি বললে—চুপ। ঐ দেখ, 'সাদাদের রাজা' উঠেছে।

—কেন ?

লোকটি বললে—গোল কোরো না। শুধু তাকিয়ে তাকিয়ে দেখ।

সুঞ্জারা তাকিয়ে-তাকিয়ে দেখলো, রাজা উঠে 'টু-এল'-এর দিকে গেলো। টুরার স্বামী মুখ ঘুরিয়ে আবার ওদের দিকে তাকালো, টুরার শ্বশুর আবার ছেলের হাতে চাপ দিয়ে কী যেন ইঙ্গিত করলো, ছেলে মুখ ফিরিয়ে নিলো সঙ্গে সঙ্গে।

তারপরে দেখা গেলো, সবই যে-যার জায়গায় উঠে দাঁড়িয়েছে, দু-একজন গাঁয়ের মোড়ল এগিয়েও গেলো পার্থ-কাই-এর কাছে। একটা

চাপা উত্তেজনার ভাব জেগে উঠলো যেন সবার মধ্যে, বিম্নুও আর থাকতে পারলো না, সুঞ্জাকে সঙ্গে নিয়ে কাছে গিয়ে দাঁড়ালো পার্থ-কাই-এর কাছে। পার্থ-কাই তখন নিজের মনে বিড়বিড় করে বলছে—পাপ, সব পাপ, সব পাপ লেগেছে।

—কিসের পাপ?

প্রশ্ন শুনে জ্বলন্ত দৃষ্টিতে পার্থ-কাই তাকালো বিম্নুর দিকে। যেন বলতে চাইলো, কে হে ছোকরা তুমি, আমার মুখের ওপর কথা বলো?

ঠিক পাশেই দাঁড়িয়েছিলো ওদের নিজেদের 'গাঁও-বুড়ো', সে এবার উত্তেজিত কণ্ঠে বলে উঠলো—হ্যাঁ, বলতেই হবে তোমাকে,—কিসের পাপ?

পার্থ-কাই ঘুরে দাঁড়ালো বুড়োর দিকে, বললে—টুরার মেয়েকে দেওয়া হলো না মুকেতি পাহাড়ে, পাপ নয় এটা? দেবতার রাগ বেড়ে যাচ্ছে, ছারখার হবো না আমরা? সব যাবে—সব ছাই হয়ে যাবে।

কথাটা সেই সংস্কার-ঘেবা মানুষগুলোর পক্ষে সত্যিই ভয়ঙ্কর। তারা একে-একে সবাই এসে জড়ো হলো পার্থ-কাই-এর কাছে। বললে—তাহলে, কী এবার করা যায় রাজা?

রাজা বললে—মেয়ে বেঁচে উঠেছে। চলো, ওকে এবার দিয়ে আসি আমরা।

—হ্যাঁ, তা-ই চলো!—সমস্বরে চীৎকার করে উঠলো সবাই।

বিম্নু বললে—মেয়ে ত এখন মায়ের কাছে। মায়ের কোল থেকে পারবে তোমরা ওকে ছিনিয়ে আনতে?

এক মুহূর্ত চুপ করে রইলো সবাই। তারপরে, নীরবতা যে সর্বপ্রথম ভঙ্গ করলো, সে হচ্ছে টুরার শ্বশুর। সে বললে—পারতেই হবে।

বিম্নু দ্রুতপায়ে এগিয়ে গেলো টুরার স্বামীর কাছে, চাপা অথচ দৃঢ় কণ্ঠে বললে—তুই কি বলিস? তুইও কি তাই বলবি?

লোকটি মাথা ঝুঁকিয়ে ছিলো, এবার মুখ তুললো, সে-মুখে কোনো ভাবের লেশমাত্র নেই, নিষ্প্রাণ এক পুতুল-মুখ যেন।

বিষ্ণুর তাড়নায় সে কথা বললো। বললে—বলবো না কেন? সবাই যা বলছে, আমিও ত তাই বলবো।

বিষ্ণু তেমনি চাপা আর উত্তেজিত কণ্ঠে বলতে লাগলো—সবাই তোর মেয়েকে নিয়ে গিয়ে মুকেতি পাহাড়ে রেখে আসবে।

—আসুক।

—তোর নিজের মেয়ে, যে এই মাত্র প্রাণ ফিরে পেয়ে কেঁদে ককিয়ে উঠলো।

পুতুল-মুখে এইবার যেন একটু বিস্ময়ের রেখা উঠলো জেগে, বললে—না না, আমার মেয়ে কেন হবে? ও-ত দেবতার দান! প্রথম মেয়ে-সন্তান দেবতার দান নয়?

বিষ্ণু বললে—কিন্তু তোব বউয়ের কথা ভেবেছিস? সে মেয়েটাকে বাঁচাবার জন্য নিজের জীবন দিতে বসেছিল! মানুষের সইবারও একটা সীমা আছে, সে আর পারছে না, এবার তুই চেষ্টা কর।

—কিসের চেষ্টা?

—বাঁচাবার চেষ্টা। তোর নিজের মেয়েটাকেই।

চারিদিকের পাহাড়-চূড়াগুলোর দিকে একবার অসহায়ের মতো তাকালো লোকটা, তারপরে মুখ নামিয়ে বললে—যাবো কোথায়?

বিষ্ণু গলা নামিয়ে বললে—তোর বউ যেখানে যাচ্ছিল।

মুহূর্তে শিউরে উঠে টুরার স্বামী বললে—ঐ বনে! সর্বনাশ! কুরুম্বারা আছে!

বিষ্ণু বললে—তবে আমার হাতে দে। আমি নিয়ে পালাই।

পুতুল-চোখে এবার যেন সামান্য একটু দীপ্তি দেখা গেলো, বললে—তোর ঘর ত ওরা ভেঙে দিয়েছে!

—ঘর?—বিষ্ণু চাপা গলায় বললে—ঘর আমি বানিয়ে নেবো, কিন্তু তা ওরা কেউ টের পাবে না।

—তোকে বাঘে খাবে।

—বাঘের সঙ্গে লড়াই করবো।

—বনের ধারে যদি থাকিস, হাতি আসবে।

—আসুক। হাতি তাড়াবো।

টুরার শ্বশুর ওদের থেকে একটু সরে গিয়ে হাত-পা নেড়ে তাদের 'গাঁও-বুড়ো'র সঙ্গে কী যে সব বলাবলি করছিলো, সেই জন্য ওদের চাপা গলার এই বাক্যালাপ ঠিক অনুধাবন করতে পারেনি। এতক্ষণ পরে কী একটা আন্দাজ করে ওদের কাছে সরে এলো। বললে—কী কথা হচ্ছে তোদের ?

টুরার স্বামী বললে—বাবা, মেয়েটাকে দিয়ে দাও না বিষ্ণুর হাতে।

—কেন ? ও নিয়ে যাবে মুকের্তি পাহাড়ে ?

বিষ্ণু বললে—না। ওর মা এতদূর পর্যন্ত আগলে রেখেছে, এবার আমি রাখবো।

—তার মানে !

বিষ্ণু বললে—ওকে আমি বাঁচাবো, ওকে আমি বড়ো করে তুলবো।

টুরার শ্বশুর চোখ দুটি বড়ো-বড়ো করে তাকিয়ে রইলো ওর দিকে, কিছুক্ষণ কোনো কথাই বলতে পারলো না। কথাটা শুনতে পেয়ে ওদের কাছে এগিয়ে এলো ওদের গাঁয়ের মোড়ল বা গাঁও-বুড়ো। রীতিমত রাগত কণ্ঠেই সে বললে—তা আর নয়! যতো সব পাপের কথা !

বিষ্ণু হুঙ্কার দিয়ে উঠলো—পাপের কথা কী রকম !

গাঁও-বুড়োর দলবল অমনি ছুটে এলো ওদের কাছে, গাঁও-বুড়োর দুপাশে এসে জড়ো হলো। বিষ্ণু হচ্ছে আধা জংলী, ওকে বিশ্বাস নেই, হয়ত মোড়লের গায়েই হাত দিয়ে বসবে। আর সে-ক্ষেত্রে অন্য যারা উপস্থিত আছে তারা কেউ ছেড়ে কথা বলবে না। বুনো

মোষকে পোষ মানাবার ব্যাপারে যতো বড়োই ওস্তাদ হোক না বিম্মু, ওকে তারা রেহাই দেবে না, টুক্‌রো টুক্‌রো করে ছিঁড়ে ফেলবে।

গাঁও-বুড়ো লোকগুলোকে হাত বাড়িয়ে একটু যেন শান্ত হতেই ইঙ্গিত করলো, তারপরে অপেক্ষাকৃত নিম্ন এবং ধীর কণ্ঠেই বিম্মুকে বলতে লাগলো—পার্থ-কাইকে গিয়ে জিজ্ঞাসা কর। পাপ না হলে এ-রকম ব্যাপার ঘটে ?

—কী ব্যাপার ?

বুড়ো বললে—সাদা মানুষরা এলো কেন, পাপ যদি না ঘটবে ?

—সাদা মানুষরা ত আগেও এসেছে।

বুড়ো বললে—সে-আসায় আর এ-আসায় অনেক তফাত আছে। এবার দলবল নিয়ে এসেছে, আর এসেছে কে ? না, সাদা মানুষদের রাজা। সঙ্গে অস্ত্র-শস্ত্রও আছে। পার্থ-কাই কী বললে ? তোরা তখনো এসে পৌঁছসনি। ওরা এসেই ওদের 'অস্তর' দেখালো, আকাশের দিকে মুখ করে অস্তরটা টিপে দিলো, আর সঙ্গে সঙ্গে নাকি কান-ফাটানো ভীষণ এক শব্দ হলো, দূরের গাছগুলোতে পাখীরা উড়ে পালালো ভয় পেয়ে।

—তারপর ?

বুড়ো বললে—আমাদের কেন ডেকেছে পার্থ-কাই, জানিস ? ঐ সাদা-মানুষগুলো এখানে থাকতে চায়, বাসা বাঁধতে চায়।

বিম্মু আর সুঞ্জার কাছে সংবাদটা নতুন, ওরা দুজনেই অস্ফুট একটা চীৎকার করে উঠলো। বুড়ো বললে—মেয়েটাকে দেবতার কাছে দিয়ে আয়, দেখবি, দেবতা খুশী হবেন, সাদা মানুষগুলোও এখানে থাকতে না চেয়ে ধীরে ধীরে নীচে চলে যাবে।

বিম্মুর মতো মানুষও এবার স্তব্ধ হয়ে গেল। আর, সুঞ্জার মনে হলো, তার পায়ের কাছ থেকে শিরশির করে কী রকম ঠাণ্ডা একটা স্রোত যেন ক্রমশঃ ওপরের দিকে উঠে আসছে।

কথা বললে বিম্বুই প্রথম। বললে—ওদের যদি আমরা থাকতে না দেই ? এটা ত ওদের জায়গা নয় !

—না হলেও জোর করে থাকবে। পারবি ওদের সঙ্গে ?

—কেন পারবো না !

বুড়ো বললে—তোদের বল্লম আর পাথর। আর ওদের হাতে কী আছে দেখেছিস ত ? দূর থেকে টিপ করে ছুঁড়বে। শব্দ হবে, আর তুই মাটিতে লুটিয়ে পড়বি।

—না না, ওদের সঙ্গে ঝগড়া করে কাজ নেই।

সুঞ্জা এবার কথা বললো। বললে—মেয়েটাকে পাহাড়ে দিয়ে এলে ওরা চলে যাবে ?

—পার্থ-কাই ত তাই বলে।

সুঞ্জা একটুক্ষণ থেমে কী যেন ভাবতে লাগলো, তারপরে গভীর ধারালো গলায় বললে—তাহলে আমাকে দাও, আমি দিয়ে আসবো।

অবুঝ বিম্বু আবার চীৎকার করে উঠলো—এই, খবরদার !

চমকে উঠলো সবাই। সুঞ্জা বললে—কিসের খবরদার ! তুই কি বলতে চাস, আমাদের জায়গা আমরা সাদা মানুষদের ছেড়ে দিয়ে চলে যাবো ?

বিম্বু হুঙ্কার দিয়ে বললে—না। আমাদের পাথর আর বল্লম দিয়েই আমরা যুদ্ধ করবো, তাতে বাঁচি আর মরি, যাই হোক না কেন ! মেয়েটাকে বাঁচাতেই হবে, ওকে পাহাড়ে দিয়ে আসা চলবে না। মেয়েটাকে ওর মায়ের কাছেই দেওয়া হোক্।

ঠিক সেই সময় সাদা মানুষদের 'রাজা' ফিরে এলো বাচ্চাটাকে কোলে করে। বাচ্চাটা তখনো কাঁদছে। 'রাজা' বাদাগাদের লোকটিকে কী যেন বললে, বাদাগাদের লোকটি এদের দিকে ফিরে এদের ভাষায় বলতে লাগলো—বাচ্চাটা ক্ষিদেয় কাঁদছে, ওকে কেউ দুধ খাওয়াতে পারো ? ওর মা এখনো অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে।

পার্থ-কাহ্ন বললে—ওকে আমাদের কারুর কোলে দাও। ওকে নিয়ে পাহাড়ে দিয়ে আসবো।

—কেন, পাহাড়ে কেন?

পার্থ-কাই বললে—আমাদের নিয়ম। ওকে দেবতা নিলেই সব শান্তি। হয়ত ওর মা-ও বেঁচে উঠবে।

বাদাগাদের লোকটি সাদা মানুষদের রাজাকে এ-সব কথা বুঝিয়ে বলতেই 'রাজা' একেবারে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন। কী যেন বললেন তাঁর অনুচরদের। একজন এগিয়ে এসে বাচ্চাকে কোলে নিয়ে গালিচার উপর বসলো। অন্য একজন কী একটা জিনিস খুলে একটা বাটিতে দুধই বুঝি ঢালতে লাগলো। সেই দুধ কাপড় ছিঁড়ে কাপড়ের টুক্‌রোয় ভিজিয়ে-ভিজিয়ে খাওয়াতে লাগলো বাচ্চাটাকে। বাচ্চাটা কান্না থামিয়ে অসীম আগ্রহে খেতে লাগলো সেই দুধ চুক্‌-চুক্‌ করে।

অন্য এক অনুচরের কাছ থেকে সাদা মানুষদের রাজা নিজের হাতে তুলে নিলো তাদের সেই অদ্ভুত 'অস্তর', তারপরে ওদের দিকে মুখ ফিরিয়ে ধমকের সুরে কী যেন বললে। বাদাগাদের লোকটি রাজার কথা ওদের বুঝিয়ে বলতে লাগলো—মেয়েটাকে পাহাড়ে দেওয়া হবে না। যে পাহাড়ে ওকে দিয়ে আসতে চাইবে, তাকে সঙ্গে সঙ্গে মেরে ফেলা হবে এই অস্তর দিয়ে।

সমগ্র উপত্যকা যেন নিঃশ্বাস রোধ করে শুনলো সেই 'সাদা রাজা'র বজ্র-নির্ঘোষ। বনের বাঘ মানুষের ঘাড়ে কামড় দিয়ে দেহের সমস্ত রক্ত শুষে নিলে মানুষটার চেহারা যেমন ফ্যাকাশে সাদা আর শুক্‌নো হয়ে যায়, ঠিক তেমনি বিবর্ণ আর বিশুষ্ক দেখাতে লাগলো উপত্যকার মানুষগুলোর চেহারা।

সাদা রাজা আবার ধমক দিয়ে কী যেন বলে উঠলেন। বাদাগাদের লোকটা সে কথা সঙ্গে সঙ্গেই ওদের শুনিয়ে দিলো—কী হলো সব? চুপ করে আছো কেন?

কোনো উত্তর নেই। শুধু আধা জংলী বিন্থু এগিয়ে গেলো রাজার সামনে। বললে—মেয়েটাকে আমার হাতে দাও।

বাদাগাদের লোকটির সাহায্যে রাজা বাক্যালাপ শুরু করলেন ওর সঙ্গে। সেই রকম ধমকের সুরেই জিজ্ঞাসা করলেন—কেন? মেয়েটাকে নিয়ে কি করবে? পাহাড়ে যাবে?

বিন্থু দৃঢ় অকম্পিত কণ্ঠে বললে—না। ওকে বাঁচাবো, মানুষ করে তুলবো।

রাজা প্রথমটায় বিশ্বাস করলেন না। তারপরে নানান বাক্য-বিনিময়ের পর যখন স্থিরনিশ্চয় হলেন বিন্থুর সংকল্প-সম্পর্কে, তখন বললেন—পারবে ওদের সঙ্গে লড়াই করে মেয়েটাকে বাঁচিয়ে রাখতে?

—পারবো।

—বোসো তাহলে এখানে। মেয়েটাকে তোমার হাতেই দিচ্ছি।

আবার একটা কোলাহল উঠলো চিত্রার্পিত লোকগুলোর মধ্যে। চিত্রের মানুষগুলোর মধ্যে যেন হঠাৎ প্রাণ ফিরে এলো। তারা, বিশেষ করে টুরার শ্বশুর, চীৎকার করে বললে—চলে আয় বিন্থু। বাচ্চাটাকে ছুঁয়ে দিস না।

ক্রমশঃ চীৎকার এতো উগ্র কোলাহলে পর্যবসিত হলো যে, সাদা মানুষদের রাজা তাঁর হাতের অস্তরটা আকাশের দিকে উঠিয়ে একটা কান-ফাটা শব্দ তুলে ভরিয়ে দিলেন সারা উপত্যকা। আর সঙ্গে সঙ্গে চুপ করে গেল সমস্ত লোকগুলো।

রাজা বললেন বাদাগা দোভাষীটির মাধ্যমে—শুনে রাখো, এই মেয়েটির যদি কোনো ক্ষতি করো তোমরা, তাহলে আর কাউকে আস্ত রাখবো না। মেয়েটির ভার আমি এই মানুষটির হাতে দিলাম। ওরও ক্ষতি করার চেষ্টা কেউ করো না, সাবধান।

লোকগুলো ভয়ে, আতঙ্কে, বিস্ময়ে নীরব হয়ে রইলো। কিছুক্ষণ পরে পার্থ-কাই কী যেন বললে ওদের লোকদের।

সাদা রাজা দোভাষীকে জিজ্ঞাসা করলে—কী বলছে ?

দোভাষীটি 'বাদাগা' হলেও শহরের দিকে যাতায়াত ছিল তার। শহরবাসীদের মতো পোশাক পরতো, শহরবাসীদের ভাষা বলতো অনর্গল, যে-ভাষার নাম—'তামিল' ভাষা। সাদা রাজা এই তামিল ভাষা শিখেছিলেন কিছু কিছু। দোভাষীর সঙ্গে তাঁর ভাষণ চলছিলো এই তামিল ভাষাতেই, তাঁর নিজের ভাষায় নয়।

যাই হোক, সাদা রাজার নির্দেশে ওদের কথাবার্তা শোনবার জন্য দোভাষী এগিয়ে এলো। কিন্তু ততক্ষণে ওদের কথোপকথন শেষ হয়ে গেছে। অমন ঠাণ্ডাতেও পার্থ-কাই-এর কপালে জমেছে বিন্দু বিন্দু ঘাম। মুখের রেখাগুলো যেন মুহূর্তে আরও গভীর হয়ে গেছে। মানুষটি ধীরে ধীরে যখন এগিয়ে আসতে লাগলো সাদা রাজার কাছে, তখন তার পা দুটি পর্যন্ত থরথর করে কাঁপছে।

—কী ? কী বলতে চাও ?

পার্থ-কাই তার নিজের পাথরের বাড়িটার দিকে হাত বাড়িয়ে নির্দেশ করলো, তারপরে কম্পিত কণ্ঠে কোনক্রমে বললে—জেল্লুকো এ-মাণ্ডু।

রাজা জিজ্ঞাসা করলেন তামিলভাষীকে—কী বলছে ?

বাদাগাটি বললে—জেল্লুকোটা তোমরা নিয়ে নাও।

—মানে !

দোভাষী বললে—'ওটাক্কাল'টা তোমরা নিয়ে নাও।

'জেল্লুকো'র তামিল প্রতিশব্দ হচ্ছে 'ওটাক্কাল', যার অর্থ হচ্ছে,—পাথরের স্তূপ বা পাথরের দণ্ড।

কিন্তু ব্যাপারটা তখনো প্রাঞ্জল হয়ে উঠলো না সাদা রাজা মিস্টার সুলিভানের কাছে। 'পাথরের স্তূপ বা দণ্ড নিয়ে নাও,' এর অর্থটা কী ?

দোভাষী বুঝিয়ে দিলো। টোডা-প্রধানদের বাড়ির সামনে যে পাথরের দণ্ড বা স্তূপ থাকে, সেটি হচ্ছে তার বাড়ীর প্রাণ-স্বরূপ বা

প্রতীক-স্বরূপ। ওটাকে আত্মসাৎ করা মানে বাড়িটাকেই আত্মসাৎ করা। পার্থ-কাই সাদা রাজাকে তার বাড়ীটাই নিয়ে নিতে বলছে।

—কেন?

পার্থ-কাই ভগ্নকণ্ঠে কোনক্রমে বলতে লাগলো—পাপ লেগেছে উপত্যকায়। বাচ্চা মেয়েটি যখন বেঁচেই উঠলো, আর তাকে যখন পাহাড়ে রেখে আসা গেলো না, তখন এখানকার কেউই আর বাঁচবে না। তোমরা নিয়ে নাও আমার বাড়ী, আমরা দূরে—আরও দূরে সরে যাবো।

এবং তাই হয়েছিল। তুপুর পেরিয়ে বিকেল, বিকেল পেরিয়ে সন্ধ্যা হয় হয়, পার্থ-কাই তার কন্যা, তার অনুচর, তার লোকজন সবাইকে নিয়ে ধীরে ধীরে চলে গেলো তার ঘরগুলোকে শূন্য করে দিয়ে।

শুধু তার টু-এল্‌-এর মধ্যে রুগ্ন অচেতন মৃতপ্রায় রয়ে গেল টুরা। সাদা মানুষগুলো তাকে বাঁচিয়ে তোলবার চেষ্টা করছে আপ্রাণ। সেই ঘরে ঢোকবার উপায় নেই, তাই তার শিশু-কন্যাটিকে কোলে করে গালিচার ওপর বসে রইলো বিস্নু।

বসে রইলো বটে, কিন্তু দূর দিগন্তে সমস্ত দলটা যখন সারি সারি মিলিয়ে যাচ্ছে, তখন তার চোখ তুটো যেন ঝাপসা হয়ে এলো।

তারপরে, একসময়, টু-এল থেকে সেই সাদা মানুষটি বেরিয়ে এলো, যে এতক্ষণ ধরে বাঁচাবার চেষ্টা করেছে টুরাকে। এসে কী যেন বললে প্রথমে সাদা রাজাকে, তারপরে দোভাষীকে। দোভাষী বাদাগাটি কাছেই বসেছিলো বিস্নুর। সে ওকে কনুয়ের একটু ধাক্কা দিয়ে বললে—চোখ মেলেছে টুরা। বেঁচে গেছে।

—বেঁচে গেছে!

—বেঁচে গেছে। মেয়েকে দাও, চাইছে তার মা।

সেই সাদা লোকটি মেয়েটাকে ওর কাছ থেকে নিয়ে আবার

'টু-এল'-এর দিকে চলে গেল। বিষ্ণু উঠে দাঁড়ালো, বললে—আমি যাবো ?

—না। এখন না।

—তবে ?

—পরে যেও। একটু সামলে নিক।

সাদা রাজার অনুচররা ততক্ষণে আলো-টালো জ্বালাতে শুরু করেছে। তারা পার্থ-কাই-এর শূন্য ঘরে যাতায়াত করছে, যেন তাদের নিজের বাড়ী। সত্যিই তাহলে চলে গেলো ঘর ছেড়ে তাদের রাজা—পার্থ-কাই ?

সাদা রাজা তাকে কাছে ডাকলো। দোভাষীর সাহায্যে বললে—ভয় করো না। তোমরা তিনজনে এখানেই থাকবে।

—আমাদের রাজার এই বাড়ীতে ? সর্বনাশ !

সাদা রাজা জানালো—তা হলে রাতের মতো টু-এল-এ গিয়ে থাকো। টু-এলও ফাঁকা। মোষগুলোকে সব নিয়ে গেছে তারা।

—আর, এই বাড়ী, এই ঘর ?

সাদা রাজা বললে—আমরা থাকবো। আমাদের দিয়ে গেছে না ? আমরা এখানে আরও ঘর-বাড়ী বানাবো, শহর তৈরি করবো। সুন্দর জায়গা এটি। কী, ভাবছো কী ?

দোভাষীটি রাজার কথার প্রতিধ্বনি করে বলে উঠলো—কী, ভাবছিস কী ? পার্থ-কাই বলে গেল না ? জেল্লুকো এ-মাণ্ড ?

রাজা বললে—কথাটার মানে কী যেন বললে তুমি ?

—উটাক্কল। আমাদের ভাষায় দাঁড়ালো—উটাক্কল। দুটো ভাষায় মিলিয়ে দাঁড়ায়—উটাক্কল-এ মাণ্ড।

সাদা রাজা দূর পাহাড়ের নিথর নিস্তব্ধ বনানীর দিকে স্থির-দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে বললে—এ জায়গাটার নাম তাহলে থাক্ উটাক্কল-মাণ্ড।

[১৮১৯ খৃষ্টাব্দে মিঃ সুলিভান যে নাম সেদিন উচ্চারণ করেছিলেন, সেই নামই ধীরে ধীরে এক দিন হয়ে দাঁড়ালো—'উটাক্কল-মাণ্ড'

থেকে 'উটক্কল-মণ্ড'। তারপরে 'উটকামণ্ড'—দাক্ষিণাত্যের শ্রেষ্ঠ শৈলনিবাস।]

সে রাত্রে মেয়েকে কোলে নিয়ে তার জীবন ফিরে পেলো টুরা।

বিষ্ণু বললে—আর ভয় নেই। তোর মেয়েকে আর কেউ মারতে পারবে না।

মুখ ফেরালো টুরা, বললে—আমি কোথায়? এখানে কেমন করে এলাম?

ওর শিয়রের কাছে বসে ধীরে ধীরে ওকে সমস্ত ঘটনাই একে একে বলে গেলো বিষ্ণু। চুপচাপ সমস্তই শুনে গেলো টুরা, কোনো প্রতিবাদ নয়, কোনো বিস্ময়-সূচক উক্তি নয়, কিছু নয়। শুধু একবার জিজ্ঞাসা করলো তার স্বামীর কথা।

—ভালোই আছে সে।

—শ্বশুর?

—সে-ও ভালো আছে!

টুরা বললে—আমরা কী করবো? এখানে থাকবো?

—না।

—তবে?

বিষ্ণু এগিয়ে এসে টুরার কানে-কানে কী যেন বলতে লাগলো। আর, সেই সব কথা শুনতে শুনতে টুরা নিজের অজ্ঞাতেই তার দুটি হাত দিয়ে শক্ত করে জড়িয়ে ধরলো তার শিশুকন্যাটিকে।

পরদিন সকালে সাদা মানুষরা এসে ওদের তিনজনকেই আর দেখতে পেলো না। ঘর শূন্য। শুধু হাড়-কাঁপানো ঠাণ্ডা একটা হাওয়া এসে হায়-হায় করে বেড়াচ্ছে!

[১৮১৯ খৃষ্টাব্দে যে ইংরাজ উচ্চকর্মচারীটি টোডা-রাজার পাথরের বাড়িটি প্রাপ্ত হন, তাঁর নাম জন সুলিভান। উটকামণ্ড থেকে তিপ্পান্ন মাইল দক্ষিণ-পূর্বে নীলগিরির পর্বতরাজির নীচে, কৈম্বাটুর নামে যে নাতিবৃহৎ জনপদটি বিদ্যমান আছে, তার 'কালেক্টার' ছিলেন এই সুলিভান সাহেব। সকাল বেলা উঠে যখন সংবাদ পেলেন, অসুস্থ টোডা-রমণীটি তার শিশুকন্যা সমেত উধাও হয়েছে, সঙ্গে সেই বলিষ্ঠকায় টোডা যুবকটিও,—তখন তিনি খুব যে চঞ্চল হলেন বা উদ্বিগ্ন হলেন, এমন মনে হলো না। সঙ্গী ইংরাজ তরুণ ডাক্তারটি কিন্তু বিলক্ষণ আতঙ্কিত হয়েছিলেন।]

—স্যর, ওরা সদলবলে এসে আক্রমণ করবে না তো ?

সুলিভান অল্প একটু হাসলেন, বললেন—না, সে চিন্তা নেই। ওরা শান্তিপ্রিয়।

—তা বলে নিজের বাড়ি ছেড়ে দিয়ে চলে যায় ?

সুলিভানের ঠোঁটের কোণ থেকে হাসির রেখা তখনো মিলিয়ে যায়নি, বললেন—সংস্কার এমনিই বটে। আমার ভাগ্য সুপ্রসন্নই বলতে হবে। সৈন্যসামন্ত নিয়ে এসে ঘিরে ফেলতে হলো না।

—দরকার হলে তা-ও করতেন ?

—করতাম বই কি !—সুলিভান বল্‌তে বলতে উঠে দাঁড়ালেন, তারপরে ঘরের বাইরে বেরিয়ে এলেন। বললেন—কী চমৎকার জায়গা ! মে মাসের ট্রপিক্যাল গরম বলে মনে হচ্ছে এখানে তোমার ?

—না।

কালেক্টর আরও এগিয়ে এলেন কয়েক পা। একটু দূরেই সুগভীর খাদ, তার ওপারে ভোরের আলোয় ঝলমল করছে 'সিলভার-ওক'-এর মসৃণ ছোট ছোট পাতাগুলো। যারা ছিলো, তারা চলে গেছে, ওদের আর যেন কোনো আগ্রহ নেই এই উপত্যকার ওপর। সাদা মানুষগুলোকে তারা যেন চেনে না, এমনি নির্বিকার ভঙ্গীতে

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সূর্যের আলো আর ঝিরঝিরে বাতাসের সঙ্গে পাতা কাঁপিয়ে খেলা করছে।

সেই দিকে অপলক দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকবার পর সুলিভান বললেন—দেখছো তাকিয়ে নীচের দিকে? পাহাড়ের ঢেউ, আর উপত্যকা? আমি যেন মনে মনে 'ডেভনশায়ারের ডার্টমুর'-এ চলে গেছি!

তরুণ ডাক্তারটি বললে—আমি ইয়র্কের লোক। আমার মনে হচ্ছে, যেন ইয়র্কশায়ারের 'মুরস্'-এর সামনে দাঁড়িয়ে আছি।

ভঙ্গীতে চাঞ্চল্য এনে সুলিভান বললেন—থাকতে হলে এসব জায়গাতেই থাকতে হয়। ক্লাইমেট কী রকম মডারেট দেখছো?

সঙ্গের অপর ইংরাজটি বললে—আমি যতদূর বুঝছি, পঞ্চাশ থেকে পঞ্চান্ন ফার্ণহিটের বেশী উত্তাপ এখানে হবে না।

ডাক্তার বললে—আমাদের দোভাষী বলছে এখানকার আবহাওয়া সারাবছরই অনেকটা এই রকম থাকে। এখানে শীতে বরফও পড়ে না, গরমকালে সূর্যের আলো এসে গা-ও পুড়িয়ে দেয় না।

সুলিভান বললেন—এখানে আমাদের নগর বসাতেই হবে। এই পাথরের বাড়িটাকে সত্যিকার পাথর দিয়ে বড়ো করে তৈরী করে নিতে হবে। আজই তার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হোক। আমি এর নাম দিমাম—"Stone House"

[উটকামণ্ডের সর্বপ্রথম গড়ে ওঠা বাড়ি, মিস্টার সুলিভানের সাধের 'স্টোন হাউস' আজও বেঁচে আছে, যদিও অনেক পরিবর্তিত অবস্থায়। মিস্টার সুলিভানের আত্মা এসে বাড়িটাকে ঠিক চিনতে পারবে কিনা সন্দেহ। তবুও লোকে বলে স্টোন হাউস! এখন যেটা উটকামণ্ডের বাজার-হাট, তারই মাথার ওপরে, বেশ কিছুটা উঁচুতে এখনো দাঁড়িয়ে আছে মিঃ সুলিভানের স্টোন হাউস! এই বাড়ি তৈরী হতে শুরু হয় ১৮১৯-এ, আর শেষ হয় ১৮২৩ সালে। দীর্ঘ চারটি বছর লেগেছিলো বাড়িটাকে তৈরী করে নিতে। বাড়িটা যখন শেষ হলো,

তখন কোথায় গেলো টোডারাজা পার্থ-কাই-এর গোলঘর আর টু-এল্‌? সব গুঁড়ো হয়ে ধূলিসাৎ হয়ে স্থান করে দিয়েছে নতুনের।]

এই চার বছরে পার্থ-কাই-এর দলবল কেউ আসেনি ফিরে। টুরার শ্বশুর কিংবা স্বামী আসেনি, আসেনি সুঞ্জা, আসেনি বিষ্ণু। এমন কি পাগল ফোরিও না।

[১৮২৩ সালে বাড়ীটা শেষ হলেও পাকাপাকি ভাবে ইংরাজরা বসবাস করতে আরম্ভ করে ১৮২৪ সালে। তার মানে, পার্থ-কাইরা চলে যাবার পাঁচ বছর পরে। লর্ড আমহার্স্ট এসেছেন কলকাতায় গভর্ণর-জেনারেল হয়ে—১৮২৩ সালের আগস্ট মাসে। এসেই বর্মার সঙ্গে জড়িয়ে পড়লেন যুদ্ধে। ১৮২৪ সালের অক্টোবরে রেঙ্গুনে রওনা হবার আদেশ-প্রাপ্ত ৪৭ নং বেঙ্গল দেশীয় পদাতিক বাহিনী ব্যারাকপুরে প্রকাশ্যে বিদ্রোহ ঘোষণা করে।]

মিস্টার সুলিভান কিন্তু তখন নিশ্চিন্ত মনে উটকামণ্ডের 'স্টোন হাউসে' বসে পার্বত্য নগরী গড়ে তোলার স্বপ্নে বিভোর। ডেভনশায়ারের এক সুদৃশ্য পল্লী যেন নতুন করে রূপ নিয়ে জেগে উঠেছে সুদূর ইণ্ডিয়ায়—উটকামণ্ডে। সেই তরুণ ডাক্তারটিকে ডেকে কাছে বসিয়ে সেদিন গল্প করছিলেন সুলিভান।

ডাক্তার জিজ্ঞাসা করলে—এই পাঁচ বছরে সেই অসুস্থ স্ত্রীলোক আর বাচ্চাটির কোনই খোঁজ করা হলো না!

—কী দরকার?

ডাক্তার বললে—অদ্ভুত প্রাণশক্তি। এমন অবস্থায় বাচ্চা কোলে করে পালাতে পারে?

সুলিভান বললেন—মানুষ মরিয়া হয়ে গেলে এমনিই হয়।

—এখান থেকে ত পালালো, দূরে গিয়ে মারা যায়নি ত?

সুলিভান বললেন—আমার ত তা মনে হয় না।

ডাক্তার বললে—তারা স্থান পেয়েছিলো কি সর্দারের কাছে?

—বলা শক্ত।

ডাক্তার আবার প্রশ্ন করলে—বাচ্চাটা কেড়ে নিয়ে আবার পাহাড়ে দিয়ে আসেনি ত ওরা ?

স্লিভান একটু ভেবে বললেন—এ কথাটাও বলা শক্ত।

ডাক্তার একটুক্ষণ চুপ করে থেকে বললে—এই টোডারা এক অদ্ভুত জাত, নয় কি স্যার ? এই সব ইণ্ডিয়ানদের চেহারার সঙ্গে পর্যন্ত মিল নেই !

সুলিভান বললেন—পাঁচ বছর ধরে এদের সম্পর্কে খোঁজ-খবর নেবার চেষ্টা করছি। আসলে এরা Nomads, বাইবেলের ওল্ড টেস্টামেণ্টে যে সব কাহিনী আছে, সেইসব কাহিনীর পাত্রপাত্রীরা যেন হঠাৎ অতীতকাল থেকে বর্তমানে এসে রূপ পরিগ্রহ করেছে।

ডাক্তারটি উত্তেজিত হয়ে প্রশ্ন করলে—আপনি কি তাহলে সত্যিই বলতে চান, এরা ইণ্ডিয়ান নয় ?

সুলিভান বললেন—'নয়' বললে হাস্যকর শোনাবে, আর 'হ্যাঁ' বললেও সত্য বলা হবে না। বহু বাইরের মানুষ এসে ভারতবর্ষের জনমণ্ডলীতে মিশে গেছে, এরা বোধ হয় আজও পুরোপুরি নিজেদের মিশ খাওয়াতে পারেনি। আমার কী মনে হয় জানো ? ভারতবর্ষে এরিয়ানরা আসবার আগে দ্রাবিড়রা এসেছিলো দু ভাগে ভাগ হয়ে। তাদের মধ্যে একদল এসেছিলো দক্ষিণ-পূর্ব ইরোরোপ আর পশ্চিম এশিয়া থেকে, যাদের বলা হয় 'দীর্ঘকপাল ভূমধ্যসাগরীয় জাতি'। আমার মনে হয়, এই দলেও এক উপদল ছিলো, যারা যাযাবর—Nomads, তারাই এই টোডাদের পূর্বপুরুষ। অবশ্য এদের সম্বন্ধে আমাদের আরও জানতে হবে।

পাঁচ বছর আগে টুন্না যে পালিয়েছিলো তার শিশুকন্যাটিকে নিয়ে, তার সংবাদ জানবার জন্য কিন্তু সুলিভানরা আগ্রহান্বিত ছিলেন না। পাঁচ বছরে ধীরে ধীরে পথ হয়েছে নীচ থেকে ওপরে, পাঁচ বছরে ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছে ইংরাজ রাজের উপনিবেশ। এই 'গড়ে ওঠা' নিয়েই

মেতে উঠেছিলো সুলিভানরা, পার্থ-কাই-এর খোঁজও তারা রাখেনি, সুঙ্গা-বিম্বুর খবরও না, টুরা ও টুরার মেয়েরও না।

মিষ্টার সুলিভানের ডেভনশায়ার গড়ে উঠেছে ধীরে ধীরে এই পাঁচ বছরে; আর পাঁচ বছরে শিশুকন্যাকে বুকে নিয়ে টুরারও কেটেছে প্রতিটি দিন, প্রতিটি মাস, প্রতিটি বছর। সেই যে পাঁচ বছর আগে রাত থাকতে থাকতে ওরা পালিয়ে এসেছিলো সাদা মানুষদের ঘর থেকে, তারপরে ওদিকেই আর পা বাড়ায়নি। মাঝে মাঝে সেই পালানোর দিনটা মনে পড়ে টুরার। মনে পড়ে আর বুকের ভিতরটা আতঙ্কে থরথর করে কাঁপতে থাকে।

আকাশে, পাহাড়ের ঠিক মাথায় একটা তারা জ্বলজ্বল করে জ্বলছিলো। একটা কম্বলে সর্বাঙ্গ ঢেকে আরেকটা কম্বলে বাচ্চাটাকে আগাগোড়া মুড়ে নিঃশব্দচারিণী ছায়ার মতো বিম্বুর পিছনে পিছনে হাঁটছিলো টুরা। জোরে জোরে পা ফেলেই সে চলতে চায়, কিন্তু পারে না, মাঝে মাঝে দাঁড়িয়ে পড়ে। ফিস্‌ফিসিয়ে জিজ্ঞাসা করে বিম্বু—কী হলো ?

—পারছি না।

বিম্বু এসে ওর হাত ধরে। তারপরে বলে—মেয়েটাকে বরং আমার কাছে দে।

সঙ্গে সঙ্গে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে দুটি হাতে টুরা মেয়েটাকে সজোরে চেপে ধরে বুকের ওপরে। আতঙ্কিত কণ্ঠে বলে ওঠে—না না।

ওর বুঝি বিশ্বাস হারিয়ে গেছে সবার ওপর থেকে। মেয়ের ব্যাপার নিয়ে ত্রিভুবনের কাউকে যেন আর ও বিশ্বাস করে উঠতে পারছে না। মেয়েকে যদিও সর্বক্ষণ দেহের সঙ্গে মিশিয়ে রাখতে পারতো, তাহলে বরং ভালো হতো, আশ্বস্ত হতে পারতো টুরা।

আরও কিছুদূর এগিয়ে যাবার পর ওরা দুজনেই থমকে দাঁড়ালো। পাহাড়ের মাথায় যে তারাটা এতক্ষণ ধরে ওদের ওপর সতর্ক প্রহরীর মতো তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখছিলো, সে ডুবে গেছে। চারিদিকে অন্ধকার একটু

যেন ফিকে হয়ে এসেছে। ঠাণ্ডা হাওয়া আসছে হু-হু করে। আর, দূরের গাছগুলোর মাথায় ছোট ছোট পাতারা সব ঘুম-ভাঙা শিশুর মতো চঞ্চল হয়ে উঠেছে!

বিম্বু বললে—কোথায় যাবো, বল্ দেখি?

টুরা বললে—জানি না। শুধু সাদা মানুষদের কাছে যাস না, ওদের মতলব ভালো নয়, আমার মেয়েকে ওরা কেড়ে নেবে।

বিম্বু বললে—পার্থ-কাই এই পথ ধরে আমাদের গাঁয়ের দিকেই গেছে। বোধ হয় আমাদের গাঁয়ের কাছেই কোথাও ঘর তৈরী করবে। যাবি ওদিকে?

অস্ফুট একটা আর্তনাদ করে উঠলো টুরা, বললে—সর্বনাশ! আমার মেয়েকে মেরে ফেলবে ওরা!

বিম্বু বললে—তবে আয়, আমরা খানিকটা নীচে নেমে যাই। জঙ্গলের ধারে ঘর বানিয়ে আমরা বাস করবো।

টুরার আতঙ্ক তখনো যায় না। বললে—হাতি আসে যদি? বাঘ আসে যদি? আমার মেয়েকে খেয়ে ফেলবে যে!

—কারুর সাধ্য নেই কেউ কিছু করে! বিম্বুর হাত দুখানা শক্ত হয়ে উঠলো, বললে—আমি আছি, ভয় কি তোর?

আর কোনো প্রতিবাদ করে না টুরা। ধীরে ধীরে ওর সঙ্গে কিছুটা নেমে আসে। একটা পছন্দ মতো জায়গা খুঁজে নিয়ে বসে পড়ে বিম্বু। বলে—জঙ্গলের কিনার পর্যন্ত যাওয়ার দরকার নেই। এখানেই ঘর বাঁধি। তুই বোস। আমি আমার বল্লম, দা, আর সব টুকিটাকি জিনিস নিয়ে আসি। কোনো ভয় নেই।

বিম্বু যখন ফিরে এলো, তখন সূর্য উঠে গেছে। সোনার মতো সূর্যকিরণ ঝিলমিল করছে চারিদিকে। মেয়েকে কোলে করে এক দিকে বসে রইলো টুরা, আরেক দিকে একা একটি মানুষ বাঁশ কেটে, খড়কুটো দিয়ে ঘর তৈরী করতে ব্যস্ত হয়ে পড়লো। কোনোরকমে

একটা খুপ্‌রী বানিয়ে দিয়ে টুরাকে বিম্বু বললে—ঘরে আয়। আমি খাবারের যোগাড় দেখি।

তারপর থেকে এই পাঁচ বছর ধরে অদ্ভুত এক ঘর-কন্নার ইতিহাস গড়ে উঠেছে ওদের মধ্যে। ওরা ঘর বাঁধবার দিনকতকের মধ্যেই ওদের কথা জানতে পেরে গেল পার্থ-কাই-এর দলের লোকেরা। জানতে পারলো টুরার শ্বশুর, স্বামী আর সুঙ্গা। সুঙ্গাকে নিয়ে টুরার স্বামীই একদিন এসে দাঁড়ালো দরজার কাছে। বিম্বু তখন বাদাগাদের কাছে গেছে দুধ বিক্রী করতে।

ওদের 'টু-এল' বা গোয়াল ঘরের দিকে তাকিয়ে প্রথম প্রশ্নই ফুটলো টুরার স্বামীর মুখে—কটা মোষ?

টুরা তার মেয়েকে বুকের ওপরে দুহাতে চেপে ধরেছে। বললে—তিনটে।

—পেলো কোথায়?

সুঙ্গা বললে—এ আবার বলবার মতো কথা নাকি! বিম্বু যে বুনো মোষ বশ করতে ওস্তাদ, এ খবর কে না জানে?

টুরার স্বামী তখনও প্রশ্ন করছে—বুনো মোষ, না, চুরি করা মোষ?

ঘৃণায় দুটি ঠোঁটের প্রান্ত কুঞ্চিত হয়ে উঠলো টুরার, বললে—চুরি করা স্বভাব নয় বিম্বুর।

যেন মুহূর্তে গর্জে উঠলো টুরার স্বামী, বললে—চুরি করা স্বভাব নয়! পরের বউ চুরি করে নিজের ঘরে রাখে কেন সে?

শান্ত লোকটি যে এমন করে জ্বলে উঠতে পারে, এ বুঝি টুরা কোনোদিন কল্পনাও করেনি। সুঙ্গা পর্যন্ত চমকে উঠলো ওর কথায়। বললে—বলছিস কী! বিম্বু নইলে টুরা থাকতো কোথায়!

—কেন, আমার ঘরে।

—নিতিস ওকে তোর ঘরে?

টুরার স্বামী বললে—নিশ্চয়।

টুরা উঠে দাঁড়ালো এই সময়, বললে—আমি যাবো না। আমার মেয়েটাকে তুই মেরে ফেলবি।

টুরার স্বামী বললে—ও মেয়ে আমাদের চোখে মরেই গেছে। ওকে আমরা আর কেউ ছোঁবো না। ওকে বিষ্ণুর কাছে রেখে তুই চলে আয় আমার ঘরে।

টুরা বললে—তুই চলে যা। আমি কিছুতেই যাবো না। আমি তোর বউ না।

—কার বউ তবে ?

টুরা দৃঢ়কণ্ঠে বললে—আমি বিষ্ণুর বউ।

—কে বলেছে এ কথা ?

—আমি।

—তুই মেয়েমানুষ, তোর কথায় ত হবে না। গাঁও-বুড়ো যদি বলে, পার্থ-কাই যদি নিজে বলে, তবে হতে পারে।

টুরার দুই চোখে যেন আগুন জ্বলে উঠলো মুহূর্তে। বললে—আমি গাঁও-বুড়ো মানি না, পার্থ-কাইও মানি না। চলে যা তুই এখান থেকে।

সারা দেহটা যেন শিউরে উঠলো টুরার স্বামীর। প্রথমটায় সে কথাই বলতে পারলো না। তারপরে গলাটা পরিষ্কার করে নিয়ে ধীর শান্ত কণ্ঠে বললে—বেশ। আমি ফিরে যাচ্ছি। কিন্তু পার্থ-কাই এ-কথা শুনলে সহজে তোকে ছাড়বে না।

—কী করবে আমার ?—টুরা বললে—সোজা সাদা মানুষদের কাছে চলে যাবো।

বিস্ময়ে বিস্ফারিত দুটি চোখ মেলে টুরার স্বামী দাঁড়িয়ে রইলো কয়েক মুহূর্ত। তারপরে আর একটি কথাও বললো না, পিছন ফিরে ধীর পায়ে সে চলে গেলো তার নিজের গাঁয়ের দিকে।

সুঙ্গা গেল না তার সঙ্গে। সে গুটি গুটি এগিয়ে এসে বসলো

টুরার কাছে। টুরার মনে হলো, তার মেয়েকে তার কোল থেকে ছিনিয়ে নিতে আসছে না ত সুঞ্জা? সে মেয়েকে বুকে নিয়েই কয়েক পা পিছিয়ে গেলো।

সুঞ্জা বললে—ঝগড়া করাটা ঠিক হলো না। ওরা গোলমাল করতে পারে।

—ঈস! কী করবে ওরা?

—তোর মেয়ের অনিষ্ট করতে পারে।

টুরা রুখে দাঁড়ালো, বললে—তুই-ই বা কী করতে এসেছিস? পালা এখান থেকে।

সুঞ্জা বললে—সাদা মানুষরা তোদের ছেড়ে দিলে?

—পালিয়ে এসেছি।

—পালাতে পারলি?

—বিশ্বুকে জিজ্ঞাসা করিস।

সুঞ্জা চুপ করে রইলো। তারপরে হঠাৎ এক সময় নীরবতা ভঙ্গ করলা সে, বললো—কী নাম রেখেছিস মেয়ের?

—পিলুবাণী।

—বাঁচাতে পারবি ওকে?

—খুব পারবো।

সুঞ্জা আবার স্তব্ধ হয়ে রইলো কিছুক্ষণ। তারপরে বললে—ফোরিকে একদিন নিয়ে আসবো। সে মেয়ের কপাল দেখে সব বলে দেবে। বাঁচবে কি মরবে, কপাল দেখে সব বলে দিতে পারে ফোরি।

—খবরদার!—আবার রুখে উঠলো টুরা—গাঁয়ের কোনো লোককে এখানে আনবি না। তুই-ও আসবি না। তোকেও বিশ্বাস নেই। বিশ্বুর বল্লম আছে জানিস ত? বল্লম দিয়ে সবাইকে ফুঁড়ে ফেলবো।

সুঞ্জা ততক্ষণে উঠে দাঁড়িয়েছে, বললে—তা বলে আমাদের জাতের কোনো নিয়মকানুন মানবি না তুই?

—না। কোনো নিয়ম মানবো না। তুই যাবি কি না বল?

সুঞ্জা বললে—আসুক বিন্নু। ওর সঙ্গে দেখা করে তারপরে চলে যাচ্ছি।

—কেন? দেখা করবি কেন ওর সঙ্গে?

—দরকার আছে।

—কী দরকার?

সুঞ্জা একটুক্ষণ থেমে থেকে তারপরে বললে—দুটো মোষ দিক না তোর স্বামী আর শ্বশুরকে। তারপরেই ব্যস, তুই বউ হয়ে গেলি বিন্নুর।

টুরা আবার জ্বলে উঠলো ওর কথায়, বললে—আমি কার বউ হবো আর না হবো, তা নিয়ে তোর অতো মাথাব্যথা কেন?

—আমি তোদের ভালো চাই।

—কেন ভালো চাস?

—বন্ধু বলে।

—কিসের বন্ধু?

অবাক হয়ে ওর দিকে তাকিয়ে রইলো সুঞ্জা। কথাটা সে যে ঠিক শুনেছে, এ যেন বহুক্ষণ পর্যন্ত তার বিশ্বাসই হলো না। তারপরে অসংলগ্ন প্রলাপের মতো হঠাৎ প্রশ্ন করে বসলো—বিন্নুকে তুই ভালোবাসিস?

টুরা চীৎকার করে উঠলো—দুনিয়ায় আমি কাউকে ভালোবাসি না, আমার এই পিলুবাণী ছাড়া। বুঝেছিস? পালা এখান থেকে।

সুঞ্জা তবু যায় না। বলে—আমার ঘরে এখন চারটে মোষ। আয় না তুই আমার ঘরে। তোর মেয়ের অনিষ্ট কেউ করতে পারবে না, কেউ ওকে ছুঁতে পারবে না পর্যন্ত, কথা দিচ্ছি। আসবি?

একটা পাথরের টুকরো কুড়িয়ে নিয়ে ওর দিকে ছুঁড়ে দিলো টুরা। মাথাটা ঠিক সময়ে সরিয়ে না নিলে ওর মাথাটা হয়ত ফেটে যেতো

পাথর লেগে। কয়েক পা পিছিয়ে গিয়ে সুঞ্জা বললে—এমন করে তাড়িয়ে দিচ্ছিস ?

টুরা যেন তখন পাগল হয়ে গেছে। চীৎকার করে বলতে লাগলো—তোদের বিশ্বাস করবো আবার ?

সুঞ্জা বললে—বিম্বুকেই বা বিশ্বাস করিস কী করে ?

—কাউকে আমি বিশ্বাস করি না।—টুরা বলে উঠলো—সে রকম বুঝলে এখান থেকেও পালাবো। আমার মেয়েকে আমি বাঁচিয়েছি, ওকে আমি বাঁচিয়ে রাখবোই।

দীর্ঘ এই পাঁচটি বছর ধরে কোনো দিকে না তাকিয়ে, ছোট্ট পিলুবাণীকে সত্যিই ধীরে ধীরে বড়ো করে তুলেছে টুরা। কাউকে আসতে দিতো না কাছে, কাউকে ছুঁতে দিতো না। মেয়েকে চোখে-চোখে রাখতো সব সময়। মেয়ে পাশ ফিরতে শিখলো, মেয়ে হামা দিতে শিখলো, মেয়ে যা পায় তাই নিয়ে মুখে পুরে দিতে শিখলো, তারপরে ক্রমে ক্রমে উঠে দাঁড়াতে শিখলো, হাঁটতে শিখলো, কথা বলতে শিখলো, হয়ে দাঁড়ালো পাঁচ বছরের ফুটফুটে মেয়েটি। ভয়ানক দুরন্ত হয়েছে সে, ভয়ানক আদুরে। মাকে ছাড়া আরেকটি মানুষকে সে জানে, সে হচ্ছে বিম্বু। এ ছাড়া কাউকে সে চেনে না, কাউকে সে জানে না।

সুঞ্জা এত তাড়া খেয়েও আসা ছাড়েনি। বলতো—পিলুবাণী দেখছি তোরও চোখের মণি হয়ে উঠেছে রে, বিম্বু।

বিম্বু বলে—হ্যাঁ, তা হয়ে উঠেছে।

সুঞ্জা বলে—এবার ওর বিয়ের সম্বন্ধ কর।

বিম্বু বলে—আমি করবার কে ? ওর বাপ, ঠাকুর্দা রয়েছে না !

সুঞ্জা অল্প একটু হাসলো, বললো—তারা ওকে বংশের মেয়ে বলেই স্বীকার করে না।

বিম্বু ওর চোখের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ বলে উঠলো—টুরার স্বামীর খবর কী রে ?

—কী আবার খবর ! খায় দায় মোষ চরায়—আছে এক রকম। বাপের শরীর ভালো নয়। ফোরির গাছের গুঁড়িতে আরও একটা দাগ শীগগিরই বাড়বে বলে মনে হয়।

বিষ্ণু চিন্তিত ভঙ্গীতে বললে—সেদিন দেখছিলাম টুরার স্বামীকে। ঐ দূরের টিলার ওপরে দাঁড়িয়ে এই দিকে তাকিয়ে আছে একদৃষ্টে।

—আসে না ?

—না।

ইতিমধ্যে টুরা ওদের কাছে এসে দাঁড়াতেই কথাটা চাপা পড়ে গেল। সুঞ্জা উঠে দাঁড়ালো, বললে—আসি।

বিষ্ণুর বদলে ওর দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে উত্তর দেয় টুরা—আসতেই বা বলে কে, যেতেই বা বলে কে ? তাড়ালেও যে যায় না, তার অতো ভব্যতা কেন বাপু ! যাও না, কাজ নেই, কম্ম নেই, খালি গুজুর-গুজুর ফুসুর-ফাসুর !

অপ্রতিভ, লজ্জিত ভঙ্গীতে তাড়াতাড়ি গাঁয়ের দিকে পা চালিয়ে দেয় সুঞ্জা।

বিষ্ণু সেদিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থাকবার পর বলে—তাড়ালি ত ?

খিল খিল করে শুধু হেসে ওঠে টুরা, আর কিছু বলে না। বিষ্ণু রাগ করে বলে—কোন্‌দিন তুই আমাকেও তাড়াবি দেখছি।

হাসি থামিয়ে ওর দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে টুরা। মেয়ে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ে মায়ের কোলে। বলে—মা ?

আর আশ্চর্য কাণ্ড ! মেয়েকে দুহাতে ঠেলে দিয়ে হন হন করে ঘরের ভিতরে চলে যায় টুরা।

অতর্কিত অনাদরে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকে পিলুবাণী, আর তাকে শান্ত করতে করতে বিষ্ণু ভাবে, ওর হলো কী ? এই পাঁচ বছরে ওকে আমি একটুও চিনতে পারলাম না !

ঝড় আসবার আগে গাছপালা যেমন নিথর নিস্পন্দ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, বাতাস যেমন রুদ্ধ হয়ে যায়, ঠিক তেমনি অদ্ভুত একটা অস্বস্তিতে কাটতে লাগলো বিষ্ণুর কয়েকটা দিন। করণীয় কাজ সে করে যাচ্ছে, কিন্তু মনে কোথায় ফুটে আছে একটা তীব্র অশান্তির কাঁটা, যার জ্বালা থেকে এক মুহূর্তের জন্যও মুক্তি নেই!

অন্যদিকে কী এক অদ্ভুত অস্বস্তি টুরাকেও কুরে কুরে খেতে থাকে। যে মেয়েকে নিয়ে তার এতো সংগ্রাম, যে মেয়েকে নিয়ে সে অবলীলায় সংঘাতের পর সংঘাতের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছে, কিছুদিন ধরে সে-মেয়ের দিকেও যেন তার মন নেই। বিষণ্ণ মেঘ-মলিন ঠাণ্ডা কুয়াশা-কুয়াশা দিনগুলোর মতো নিঃঝুম একটা পাথরের ওপর বসে থাকে টুরা, কী যে আবোল-তাবোল ভাবতে থাকে নিজের মনে, তার হদিস বোধ হয় সে নিজেও রাখতে পারে না।

অন্যদিকে খেলায় মত্ত থাকে পিলুবাণী, ছোট ছোট গাছের ডাল পুঁতে দেয় পাথরের খাঁজে মাটি খুঁজে নিয়ে, ছোট্ট ভাঁড়ে করে তোলা জল থেকে জল নিয়ে এসে সিঞ্চন করে সেই স্তিমিত-পত্র ডালগুলোর ওপরে, তারপরে একসময় কী মনে করে নিজেই টেনে টেনে উপড়ে ফেলতে থাকে। তারপরে, কয়েক পা এগিয়ে এসে এদিক ওদিক তাকাতে থাকে, ডাকে—মা! ও মা!

মা সাড়া দেয় না। 'মা' ডাক তার কানে গিয়ে পৌঁছয় কি না কে জানে! অথবা পৌঁছলেও সাড়া দিয়ে মেয়েকে কোলের কাছে টেনে নেবার উৎসাহ বোধ করে না। ভাবখানা যেন এই—ও ত বড়ো হয়ে গেছে, নিজেরটা নিজেই চালিয়ে নিতে পারে, এই বয়সে তাদের জাতের মেয়েদের বিয়ের সম্বন্ধ আসা যাওয়া করে, তবে আর ওর অতো 'মা-মা' করার দরকার কী?

এক-একদিন মা ওকে নিয়ে জঙ্গলের কিনার পর্যন্ত বেড়াতে যায়। খেলতে খেলতে হঠাৎ দেখে, মা নেই। পিলুবাণীর বুকের ভিতরটা ভয়ে ধড়াস-ধড়াস করতে থাকে, চীৎকার করে কেঁদে ওঠে—মা!

হাওয়ায় হাওয়ায় গিরিকন্দরে গিয়ে সে ডাক প্রতিধ্বনি তোলে—আ-আ!

মায়ের তবু দেখা পায় না পিলুবাণী, কাঁদতে-কাঁদতে একাই ঘরের দিকে হাঁটতে থাকে। হঠাৎ তখন উঁচু কোনো পাথরের আড়াল থেকে মা বেরিয়ে পড়ে, হাসতে হাসতে মেয়েকে কাছে টেনে নিয়ে বলে—ভয় পেয়েছিলি ত?

দুরন্ত অভিমান এসে পিলুবাণীর কণ্ঠরোধ করে, সে কোনো কথা বলে না, ঠোঁট ফুলিয়ে কান্নার জের টেনে চলে শুধু।

টুরা বলে—আমি যদি কোথাও চলে যাই বা হারিয়ে যাই, তখন কী করবি?

রাগ করে পাঁচ বছরের মেয়ে বলে—চাই না তোকে, দূর হ তুই, দূর হ!

টুরার মুখে কিন্তু একটা বিষণ্নতার ছায়া এসে পড়ে, বলে—তাই-ই যাবো একদিন, দূরই হয়ে যাবো।

মেয়ে চুপ করে। জলভরা দুটি অবোধ চোখ মেলে মায়ের দিকে তাকায়।

মা বলে—আমার কাজ আমি করেছি। তোকে বাঁচিয়েছি। আর কেউ তোকে মারবে না। ওরা তোকে সমাজে ঠাঁই না দিলো ত বয়ে গেল, বিস্থু তোকে ভালোবাসে, বিস্থুর কাছে তুই বেশ থাকতে পারবি।

মেয়ের রাগ তখনো যায়নি, বলে—পারবোই ত। খুব পারবো।

মা হাসে, পরে একদিন বিস্থুকে ডেকেও বলে সে কথা। বলে—মেয়ে আমার থেকে তোকে বেশী ভালবাসে রে বিস্থু, মেয়ে তোরই কাছে থাকতে চায়।

—তাই ত থাকবে।—বিস্থু বলে—আমার কাছে থাকা মানে মার কাছেই থাকা। এতে আবার অবাক হবার কী আছে!

টুরা হাসে মুখ টিপে, বলে—আমি যদি মরে যাই?

—ওকী কথা! মরবি কেন? দুঃখ কী তোর?

ঠোঁটের কোণ থেকে হাসির রেখা মিলিয়ে যায়, টুরা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলে—আমার কী দুঃখ, তুই তা বুঝবি কী করে?

বিশ্বু ওর কাছ ঘেঁষে এসে বসে, বলে—আমি বুঝবো না ত কে বুঝবে!

টুরা চট্ করে সরে যায়, চাপা স্বরে বলে—মেয়ে কেমন করে তাকাচ্ছে দেখ্! যেন দুটো চোখ দিয়ে আমাকে খেয়ে ফেলবে!

—কেন?

টুরা তেমনি চাপা স্বরে বলে—ওর সামনে আমাকে তুই ছুঁস্ না কখনো।

মুখ ফিরিয়ে পিলুবাণীর দিকে তাকায় বিশ্বু। পিলুবাণী অম্‌নি তাড়াতাড়ি ঘরের ভিতরে ছুটে পালায়।

সবটাই দুর্বোধ্য লাগে বিশ্বুর কাছে। টুরা আস্তে আস্তে প্রায় ফিসফিসিয়েই বলতে থাকে—সুঞ্জা লোকটা দিনদিন কেমন হয়ে যাচ্ছে না রে! যখন তখন আমার খোঁজ নিতে আসবে, আর কেমন এক রকম করে যেন আজকাল তাকায় আমার দিকে।

বিশ্বু বলে—তোকে চায় হয়ত।

—চায়, সে ত জানি।—টুরা বলে—কিন্তু চাইলেই ত সব পাওয়া যায় না! অথচ, ও যেন দিন দিন অস্থির হয়ে উঠছে। কেন, গাঁয়ে কি আর মেয়ে নেই?

বিশ্বু হেসে ওঠে প্রথমটায়, তারপরে গম্ভীর কণ্ঠে বলে—তা বলে তুই যেন আবার কারুর ঘরে গিয়ে উঠিস না আমাকে আর পিলুবাণীকে ফেলে।

টুরা বলে—ক্ষতিই বা কী? পিলু এখন বড়ো হয়েছে, মাকে আর তার দরকার নেই।

—আর, আমার?

টুরা অল্প একটু হাসে, বলে—তোর মতো মনের জোর কটা মানুষের ? তোকে নিয়ে আমার একটুও ভাবনা নেই।

বিম্বু একটু বুঝি অবাকই হয় ওর কথাবার্তার ধরণ-ধারণ দেখে, বলে—বলছিস কী এসব তুই !

টুরা তেমনি মুখ টিপে টিপে হাসতে থাকে, বলে—বললাম না ? যদি মরে যাই !

রাগ করে ওর কাছ থেকে উঠে চলে যায় বিম্বু। উঠে যায় বটে, কিন্তু সারা দিনমান ঘুরতে ঘুরতে টুরার এই কথাটাই কানের কাছে বারবার বাজতে থাকে—যদি মরে যাই ?

নিজের পেটের মেয়ে, যার জন্য ও এত কাণ্ড করলো, তার ওপরও আর ওর টান নেই ! এ এক সত্যিই আশ্চর্য আর অবিশ্বাস্য ঘটনা।

নিজেকেই নিজে প্রশ্ন করে বিম্বু—নয় কী ?

কোনো উত্তর পায় না।

[পরবর্তী কালে, টুরা সত্যিই একদিন যে অভাবিত ঘটনা ঘটিয়ে বসলো, তার কাহিনী শুনতে শুনতে বহু দূরে তাঁর 'পাথুরে বাড়ী'র সামনে বসে কমিশনার মিস্টার সুলিভান বলেছিলেন তাঁর সহকর্মী ডাক্তারটিকে—আদিম সমাজ, যেখানে নারীর 'চেস্টিটি'-র ধারণা পর্যন্ত ভিন্ন ধরণের, সেখানে এ-ঘটনা অস্বাভাবিক হবে কেন ? বরং এটাই স্বাভাবিক। মানুষ যখন 'গুহামানব' ছিল, তখন এর থেকেও নিষ্ঠুরতম ঘটনা ঘটে গেছে। আসলে, এটা জৈবিক। স্নেহের প্রাচুর্যও জৈবিক, স্নেহের অভাবটাও জৈবিক। প্রয়োজনে স্নেহ এসে দেখা দেয়। অন্ধের মতো দেখা দেয় ; আবার প্রয়োজন ফুরিয়ে গেলে স্নেহ ব্যাপারটা যেন হঠাৎ হাওয়ায় মিলিয়ে যায়। আসলে আমাদের সভ্য জীবনেও তাই, আমরা শুধু নিজেদের স্বার্থের দিকে তাকিয়ে আর 'ইনসিকিওরিটি'র দিকে তাকিয়ে, নিজেদের মধ্যে একটা আপোসের বন্দোবস্ত করে নিই ; পরে সেটাই দাঁড়িয়ে যায়

অভ্যাসে। বুঝতে পারছো ডাক্তার, আমাদের স্নেহপ্রীতিও প্রথমে থাকে 'ইন্‌স্‌টিংক্‌ট, পরে অভ্যাস। ওরা অভ্যাসের দাস হয় না, ওরা মুক্ত; স্বাধীন জীবন-যাপনের স্বাদ ওরাই জানে।]

যেদিন ঘটনাটি ঘটে, সেই দিন ভোরবেলাকার কথা। টুরার নিস্পৃহতা দিনের পর দিন লক্ষ্য করতে করতে মনটা ভারাক্রান্ত হতে থাকে বিষ্ণুর। আগের রাত্রিতে ঐ রকম ভার-ভার মন নিয়েই ঘুমিয়ে পড়েছিল বিষ্ণু, আর, সারারাত যতো সব দুঃস্বপ্ন এসে শকুনের মতো তার চেতনাকে ঠুক্‌রে ঠুক্‌রে খেয়েছে। ভোরবেলায় সে ধড়মড় করে জেগে উঠলো পিলুবাণীর কান্না শুনে। সাধারণ কান্না নয়, ঘরের বাইরে থেকে কান্নার স্বর ভেসে আসছে। অবোধ শিশুর ব্যাকুল কান্না।

ঘর থেকে সে বেরিয়ে এলো সঙ্গে সঙ্গে। ঘরের সামনে পিলুবাণী বসে বসে কাঁদছে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে। তাকে তৎক্ষণাৎ কোলের কাছে টেনে নিয়ে বিষ্ণু জিজ্ঞাসা করলো—কী হয়েছে রে?

—মা নেই।

বুকের ভিতরটা ধ্বক্ করে উঠলো। অস্ফুট কণ্ঠে সে বললে—মা নেই কি রে!

মনের সেই অব্যক্ত অস্বস্তির বুঝি এমনি করেই বহিঃপ্রকাশ ঘটলো একদিন। তন্ন তন্ন করে আশেপাশে খুঁজলো বিষ্ণু। টিলায় উঠে, বনের ধারে গিয়ে, বার বার ডাকতে লাগলো—টুরা, টুরা!

গাছের মাথায় হাওয়া লেগে পাতারা সব উল্লাসে দুলছে। সাদা মেঘের ভেলায় ভেলায় ভোরের আলো ঝল্‌মল্‌ করে উঠেছে—পিলুবাণীর কান্নার উত্তর কে দেবে? 'মা-মা' বলে সে এতো ডাকলো, মা এলো না। 'টুরা টুরা' বলে বিষ্ণু অতো ডাকলো, টুরা এলো না।

বহুক্ষণ পরে, সূর্য যখন মাথার ওপর, মেয়েটা যখন কেঁদে কেঁদে ঘরের মধ্যে ঘুমিয়ে পড়েছে, তখন সুঞ্জাই এলো খবরটা নিয়ে। টুরা গেছে স্বামীর কাছে। তার কাছেই থা কবে।

—তুই দেখলি ?

—হ্যাঁ।

—কথা বললি ?

—হ্যাঁ।

—কী বললে টুরা ?

—টুরা বললে—বিম্বুর কাছে মেয়ে থাকে থাক। আমি এখানেই থাকবো।

বিম্বু আর বিলম্ব করলো না। পিলুবাণীকে ঘুম থেকে উঠিয়ে কোলে নিয়ে গাঁয়ের দিকে চললো সুঞ্জার সঙ্গে। টুরার স্বামীর ঘরের ঠিক সামনেই বসে ছিল টুরা। তার কাছে গিয়ে নামিয়ে রাখলো পিলুবাণীকে। মা মেয়েকে কোলে নিয়ে একটু আদর করেই ওর দিকে ঠেলে দিলো।

বিম্বু সবিস্ময়ে বললে—তুই যাবি না ?

—না।

—মেয়ে ?

—বড়ো হয়েছে, তুই নিয়ে যা।

বিম্বু চীৎকার করে উঠলো—এ তুই কী করলি ?

টুরা ছুটে ঘরের ভিতরে চলে গেল। আর, দরজার পথ আড়াল করে দাঁড়ালো টুরার স্বামী। বিম্বু বললো—আমি ওকে চাই না। কিন্তু তোর মেয়েকে তুই নে।

—না।

আকুল হয়ে কাঁদতে লাগলো পিলুবাণী, কিন্তু ঘরের ভিতর থেকে কোনা সাড়া এলো না। বিম্বু অবশেষে রাগ করে মেয়েকে কোলে নিয়ে ফিরে এলো তার ঝুপড়ীতে। তার মনে হতে লাগলো, মানুষ এ-ও পারে ?

সেইদিন, সেই রাতটা কেটে গেল। মনটা একটু স্থির হতে বিম্বু ভাবতে লাগলো, একি সত্যিই হতে পারে ? ও নিশ্চয়ই

ফিরে আসবে। যে মেয়েকে এমন করে বাঁচালো, সে মেয়েকে ছেড়ে কতদিন দূরে থাকতে পারবে, মা? ও ফিরে আসবেই।

কিন্তু দিন যায়, মাস যায়, মা আর সত্যিই ফিরে এলো না। বাতাস তেমনি খেলা করে গাছের আলোয়, ভোরের সূর্য তেমনি রঙ বুলিয়ে দেয় মেঘের ভেলায়, অথচ তার ঘরের আঙিনায় যেটা ঘটা উচিত, সেটা ঘটে না। সুঞ্জা মাঝে মাঝে আসে। কিন্তু সে আসে না। ততদিনে মেয়েটাও শান্ত হয়ে গেছে। নিজের খেলাধুলো নিয়ে মেতে থাকে—কাঁদেও না, মায়ের নামও করে না।

সুঞ্জা আর বিম্বু সুকঠিন বিস্ময়েই এ দৃশ্য দেখতে থাকে, আর ভাবতে থাকে। এ জৈবিক লীলা তাদের মতো যাযাবর মনের কাছেও এক নিদারুণ বিস্ময়ের বস্তু হয়ে দেখা দেয়। দূরের সিরুভবানী নদী কিন্তু তেমনি বয়ে যায়, আকাশে কিন্তু তেমনি মেঘ করে আসে, বাতাসে কিন্তু তেমনি স্নিগ্ধ আমেজ বইতে থাকে। উপত্যকা ঘিরে রাত্রি নেমে আসে, উপত্যকার অন্ধকার কেটে গিয়ে আবার ভোর হয়। এক অমোঘ নিয়মের রথচক্রে সব কিছু উচ্চনীচ গুঁড়িয়ে সমতল হয়ে যায়, সাবলীল হয়ে যায়। যা পড়ে থাকে, তা এক গভীর ক্ষতরেখা। কিন্তু সেও মিলিয়ে যেতে কতক্ষণ!

অসংখ্য প্রবল বহিঃশত্রু ছিল বলেই প্রাগৈতিহাসিক যুগে মানুষ আত্মরক্ষার জন্য যূথবদ্ধ হয়েছিল। অথচ, তাতেও সমস্যার সমাধান হয়নি, সেজন্য পরবর্তী কালে মানুষ পরিণত হয়েছিল সমাজবদ্ধ জীবে। তখন মাত্র আত্মরক্ষা নয়, সঙ্গে সঙ্গে আরও এক জিজ্ঞাসা তার সামনে উত্তাল হয়ে দেখা দিলো। সেটি হচ্ছে, জাতি-হিসাবে সমষ্টিগতভাবে অস্তিত্ব রক্ষার প্রশ্ন। তারপরে অবশ্য একদিন জয়ী হলো মানুষ। অতিকায় বলশালী জীবের দল ধীরে ধীরে একদিন বিলুপ্ত হয়ে গেলো। মানুষের জয়যাত্রা হলো আরও সুগম, আরও মসৃণ। কিন্তু সেখানেই কি শেষ? প্রকৃতির রীতিনীতি যে কঠিন, কঠোর। অনিবার্য তার পরিণতি, অমোঘ তার নির্দেশ। যুগের পর যুগ পার হতে হতে তাই একদিন দেখা গেলো মানুষের প্রবলতম শত্রু আর নিষ্ঠুরতম প্রতিপক্ষ হয়ে দাঁড়িয়েছে মানুষ নিজে। বৃহৎ শক্তি ক্ষুদ্রকে গ্রাস করছে, ধনী দরিদ্রকে সংহার করছে, বুদ্ধিজীবী শ্রমজীবীর ওপর প্রভুত্ব করছে,—মানুষের সামাজিক অগ্রগমনের ইতিহাস ত এক কথায় এই-ই।

দাক্ষিণাত্যের এই উপত্যকাবাসীরা কিন্তু তথাকথিত সভ্যতার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিজেদের অস্তিত্বের সীমান্তে দাঁড়িয়ে আজও আত্ম-রক্ষার প্রাণপণ প্রয়াস করে চলেছে। প্রবলের সামনে দুর্বল অস্ত্র-সঞ্চালন করবে কতক্ষণ? এরা সেটা মর্মে মর্মে বোঝে বলেই রুখে দাঁড়িয়ে নির্মূল হয়ে যাওয়ার থেকে প্রবলদের স্থান ছেড়ে দূরে সরে যাওয়াই শ্রেয়ঃ বলে মনে করেছিলো। যুগের পর যুগ ধরে ওরা বোধ হয় এইভাবে প্রবলদের স্থান ছেড়ে দিতে দিতে অবশেষে একদিন ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল থেকে ঘুরতে ঘুরতে এসে উপস্থিত হয়েছিলো দক্ষিণ ভারতে, নীলগিরির উপত্যকায়। এবং এ ঘটনাও যে কবে ঘটেছে তা কেউ বলতে পারে না। আমি এখন যে-সময়কার কথা

বলছি, সেটা হচ্ছে ১৮২৪ সাল, আমাদের বাংলাদেশে বিদ্রোহী কবি শ্রীমধুসূদন জন্মলাভ করেছেন, আর নীলগিরি-উপত্যকায় জন্মলাভ করেছে 'উটি' বা 'উটকামণ্ড'—দাক্ষিণাত্যের সুবিখ্যাত শৈল-নিবাস। আমি যাদের কথা বলছি, সেই 'টোডা' সম্প্রদায়ের জনসংখ্যা তখন মাত্র আড়াই হাজার, বিস্তৃত উপত্যকায় তারা ছড়িয়ে-ছিটিয়ে অবস্থান করছিলো। ওদের রাজা 'পার্থ-কাই' প্রবল-পক্ষ ইংরেজকে 'উটি' ছেড়ে দিয়ে সরে এসেছে প্রায় দেড় মাইল দূরের একটি গাঁয়ে। রাজা ছেড়ে দিয়েছিলো নিজের আবাস ১৮১৯ সালে ; তারপরে পাঁচ বছর গত হয়েছে, রাজার ছেড়ে-আসা গ্রামে তখন সাদা মানুষরা দলে দলে এসে বসবাস করতে শুরু করেছে।

পাঁচ বছরের ছোট্ট মেয়ে পিলুবাণী নতুন একটা খেলায় মেতে উঠেছে। বল্লমের একটা পুরানো ভাঙা ফলা খুঁজে পেয়েছিল খুপরির ভিতরে। সেটা নিয়ে অদূরের একটা ঝাউগাছের গুঁড়িতে দাগ কেটে কেটে নানান আঁকিবুকি দেয় বসে বসে। প্রথম যেদিন দাগ বসালো গাছটার গায়ে, ওর মনে হলো গাছটা বুঝি মুহূর্তে ব্যথায় কুঁকড়ে গেল। কথা ত বলতে পারে না, তাই পাতায় পাতায় নিশ্বাস জাগিয়ে হাহাকার করে উঠলো!···পিলুবাণী যেন অনুভব করতে পারলো সেই হাহাকারের অব্যক্ত বাণী, নীচের ঠোঁটটা দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরে মাথা উঁচু করে তাকালো গাছটার ডালপালার দিকে, তারপরে মুখ নামিয়ে নিজের মনেই বলতে লাগলো—কেমন মজা! আরও নিজের মেয়েকে ফেলে চলে যাও!

বলতে বলতে ফলাটা দিয়ে গাছটার গায়ে আরও জোরে জোরে আঁচড়ে কাটতে থাকে। তারপরে, একসময় হয়রান হয়ে ফলাটা মাটিতে ফেলে দেয়, বসে পড়ে। বলে—আমি যাবো না, কিছুতেই যাবো না, নিতে এলেও যাবো না। আমি একা থাকবো, বিম্বুর কাছে যেমন একা-একা আছি, তেমনি একা-একাই থাকবো।

বিম্বু যে-ঘরটা বানিয়েছে নতুন করে, সেটা তাদের চিরাচরিত গোলাকার ঘর নয়, বাদাগাদের মতো চৌকো ঘর। বাদাগারা অন্য জাত, অন্যরকম তাদের ধরনধারণ, তারা পাহাড়ে খাঁজ কেটে মাটি চষে, কৃষিকাজ করে, ধান বোনে। সত্যি কথা বলতে কি, এই বাদাগারাই ত তাদের অন্ন যোগায়। তারা মোষ চরায়, মোষের দুধ বিক্রী করে বাদাগাদের কাছে, তার বদলে হাঁড়িকুড়ি নেয়, চাল নেয়, গুড় নেয়। চাল গুড় আর দুধ, এই তিনে মিশিয়ে মিষ্টান্নই ত তাদের রোজকার খাদ্য। বিম্বু যে বাদাগা লোকটির সঙ্গে লেনদেন করে, সে মধ্যবয়সী, আর তার নাম এতো বিদ্ঘুটে উচ্চারণের যে মনে করে রাখা শক্ত। তবে নামের মানেটা বলতে পারি—রাখাল।

রাখাল মাঝে মাঝে উঠে আসে নীচে থেকে ওপরে, পিলুবাণীকে দেখে মাথা নাড়ে আপন মনে, বলে—আমাকে দেখে মেয়েটা অমন ভয় পায় কেন রে, বিম্বু ?

বিম্বু বলে—এক আমাকে ছাড়া সবাইকে দেখেই ও ভয় পায়।

—তোদের নিজের জাতের লোককে দেখেও ?

—হ্যাঁ।

—কেন ?

বিম্বু বলে—তোমাকে ওর মায়ের কথা বলিনি ? ওর মা আমার এই ঘরেই থাকতো মেয়েকে নিয়ে। মেয়ে যেই পাঁচ বছরটি হলো, অমনি ওকে ছেড়ে পালিয়ে গেল তার স্বামীর কাছে। আমি মেয়েকে নিয়ে গিয়ে কতো ধরপাকড় করলাম, মেয়ের মা-ই বলো, বাপই বলো, আর ঠাকুর্দাই বলো, কেউ ঘরে নিলো না।

রাখাল অবাক হয়ে বললে—সে কী ! কেন ?

বিম্বু বললে—মেয়েটি প্রথম সন্তান। ওকে দেবতার কাছে দিয়ে আসার কথা। আমাদের জাতের সব মায়েরাই এটা করে আসছে। প্রথম সন্তান মেয়ে হলে তাকে পাহাড়ের চূড়ায় দেবতার কাছে দিয়ে আসাই নিয়ম। কেবল এই পিলুবাণীর মা-ই বেঁকে দাঁড়ালো প্রথম।

বাচ্চা মেয়েকে কোলে নিয়ে পালিয়ে এলো আমার কাছে। তখন আমরা আমাদের রাজা 'পার্থ-কাই'-এর 'মাণ্ডু'র কাছে থাকি। আমি রুখে দাঁড়িয়েছিলাম, মেয়েকে যখন ফিরিয়ে নিতে এলো সবাই, এমন কি রাজার কাছে দরবার পর্যন্ত করতেও ছাড়েনি। পিলুবাণীকে বলি না দিলে নাকি গাঁয়ের অমঙ্গল হবে! পিলুবাণীর মা লুকিয়ে জঙ্গলের মধ্যে নেমে গেল মেয়েকে নিয়ে। অতি কষ্টে খুঁজে বার করি আমি। খুঁজে বার করে ঘরে নিয়ে এলাম বটে, কিন্তু তবু কি নিস্তার ছিল! পিলুবাণীকে প্রাণে বাঁচাতে কিছুতেই পারতো না ওর মা, যদি না সাদা মানুষরা এসে পড়তো 'মাণ্ডু'তে। ওরা এসে পড়লো, মেয়ে আর মাকে ওষুধ দিয়ে বাঁচালো, আর 'পার্থ-কাই' সাদা মানুষদের 'মাণ্ডু' ছেড়ে দিয়ে এই গাঁয়ে এসে ঘর বাঁধলো। আমি পিলুবাণী আর পিলুবাণীর মাকে নিয়ে এই জঙ্গলের ধারে চালা বেঁধে পড়ে আছি। মেয়ে পাঁচ বছরেরটি হলো, আর কী আশ্চর্য, যে মেয়েকে নিয়ে এতো কাণ্ড, সেই মেয়েকে ছেড়ে মা চলে গেল মেয়ের বাপের ঘরে। তা গেছিস যা, মেয়েকেও সঙ্গে নিয়ে যা। কিন্তু কে শুনেছে এমন অদ্ভুত কাণ্ড! আমার ঘাড়ে মেয়ে পড়ে রইলো, মেয়ের খোঁজখবব নেওয়ারও দরকার মনে করে না ওরা!

রাখাল বললে—মেয়ের প্রাণে মারা পড়বার ভয় আর নেই ত?

—না, তা আর নেই। পার্থ-কাই বলে দিয়েছে, ও মেয়ে আমাদের সমাজে মরে গেছে ধরতে হবে, ও আর আমাদের কেউ নয়।

রাখাল বলে—তোদের সমাজে ত দেড় দু'বছরের মেয়েরও 'ম্যাট্‌সুনি' হয়ে যায়। যাকে বলে পাকা কথা। হিন্দুরা বলে, বাগদান। ওর হয়েছে?

—না।

রাখাল বলে—ওর মা ওকে ছেড়ে যাবার আগে ওর 'ম্যাট্‌সুনি'ও করে যায়নি?

—না।

ওর মুখের দিকে কয়েক মুহূর্ত অবাক হয়েই তাকিয়ে থাকে রাখাল, তারপর বলে—আচ্ছা, সত্যি বলছিস, ওর মা চুপি চুপি এসে ওকে দেখে যায় না ?

—কখনো ত শুনিনি। এলে পিলুবাণী নিশ্চয়ই আমাকে বলতো।

রাখাল এইবার আরও একটু ঘন হয়ে বসলো ওর কাছে, গলার র নীচু করে ফিসফিসিয়ে বললে—পিলুবাণীর মা কি তোর কাছে বাঁধা ছিল ?

বিম্বু বললে—না।

রাখাল বললে—তুই ত বুনো মোষ ধরার কারবার করিস, দুটো মোষ দিয়ে ওর বউকে নিজের কাছে বউ করে রেখে দিলেই পারতিস। তোদের সমাজে ত এর চল আছে।

বিম্বু বললে—তা আছে। কিন্তু সেভাবে কোনো কিছু করা হয়নি। ও আমার কাছে ছিল বটে, তবে বউ হিসেবে ছিল না।

রাখাল বললে—এইবার বুঝলাম। সেইজন্যই 'ম্যাট্‌সুনি'র কথা পিলুবাণীর মা আর ভাবেনি।

—মানে ?

রাখাল অল্প একটু হাসলো, তারপর বললে—মনে মনে তোরই সঙ্গে পিলুবানীর 'ম্যাট্‌সুনি'র কথা ভেবে রেখেছে ওর মা। এ মেয়ে বড়ো হলে তোরই বউ হবে আর কী !

বিম্বুর দুর্দান্ত শক্তি আর অটুট স্বাস্থ্যের জন্য বিখ্যাত সে তাদের সমাজে। শুধু কি তাই ? তার বুনো বেপরোয়া স্বভাবের জন্য গাঁয়ের লোক তাকে মনে মনে ভয় না করে পারে না। দ্বিতীয়তঃ, বুনো মোষ ধরায় বিম্বু ওস্তাদ। সেদিকে দেখতে গেলে ওদের রাজা থেকে আরম্ভ করে সবাই ওকে খাতির করে চলতে বাধ্য। কেন না মোষ চরানো আর মোষের দুধ বিক্রী করাই যে মানুষদের জীবিকা, তাদের কাছে 'মোষ-ধরায়-ওস্তাদ' মানুষটি অবশ্যই আদরণীয় হবে, এ আর আশ্চর্যের কথা কী ?

অথচ এ হেন দুর্ধর্ষ মানুষটি 'পিলুবাণী তার বউ হবে'—এই কথায় একেবারে যেন মাটির সঙ্গে মিশে গেলো। ভিতরটা কেমন যেন একবার কেঁপে উঠলো থরথর করে, মাথার মধ্যে যেন বিদ্যুতের শিখা চমকে উঠলো মুহূর্তের জন্য। মুহূর্তের জন্য তার মনে হলো, পিলুবাণীর মা কি সত্যিই সে-কথা মনে মনে পুষে রেখেছিলো? সেই জন্যই কি ওকে রেখে অমন নিশ্চিন্তে গিয়ে উঠতে পারলো তার স্বামী-শ্বশুরের ঘরের দরজায়? সেই জন্যই কি মেয়েকে দেখেও ঘরের ভিতরে লুকিয়ে রইলো, বাইরে এলো না, মেয়েকে নিলো না কোলের কাছে টেনে!

ভাবতে ভাবতে উঠে দাঁড়ালো বিষ্ণু। তারপরে অদূরে কাকে আসতে দেখে, একটু চমকে রাখালের দিকে ফিরে তার হাত দুখানি ধরলো, বললে—আজ তুমি এখন যাও, কেমন? কাল এসো। জবাব দেবো। আমাকে ভাবতে হবে। কী আশ্চর্য, কথাটা ত কখনো ভেবে দেখিনি!

রাখালও উঠে দাঁড়িয়েছে, বললে—আসছে কে? কাকে দেখলি?

—সুঞ্জা।

—সুঞ্জা কে?

—তুমি চিনবে না।

রাখাল বেঁটে মানুষ, মুখটা বাড়িয়ে টিলার আড়ালে কে হেঁটে আসছে দেখবার চেষ্টা করলো। তারপরে বললে—ওরই নাম সুঞ্জা বুঝি? ওকে দেখেছি। তোর কাছে ত প্রায়ই আসে। দেখিস, মেয়ে পাঁচ বছরের হয়েছে, বউ করবার তালে ঘুরছে না ত লোকটি!

বিষ্ণু বিরক্ত হয়ে বললে—কী বকছো পাগলের মতো? যাও।

রাখাল তার হাতের বেঁটে লাঠিখানা কুড়িয়ে নিয়ে গায়ের লাল জামাটা ঠিক করতে করতে বনের দিকে নেমে গেলো। নামতে নামতে একটা ঝাউগাছের মাথায় লাঠিটার বাড়ি মারলো অকারণ। গাছটা যেন নিদারুণ ব্যথা পেয়ে কুঁকড়ে উঠলো সঙ্গে সঙ্গে, ঝরঝর করে একরাশ পাতা ঝরে পড়লো পায়ে-চলা পথটির ওপরে।

সেই দিকে এক মুহূর্ত তাকিয়ে বিম্বু ডাকতে গেলো—পিলু, পিলুবাণী!

কিন্তু আশ্চর্য কাণ্ড, স্বর ফুটলো না, গলার ভিতরে ঘড়ঘড় একটা শব্দ হলো শুধু। ওদিকে সুঞ্জাও তখন কাছে এসে পড়েছে ওর।

—বিম্বু, শুনেছিস?

—কী?

জোরে জোরে হেঁটে আসতে গিয়ে রীতিমত হাঁপাচ্ছে সুঞ্জা। সুঞ্জা ওদের বন্ধু, সুঞ্জা গাঁয়ের ভিতরে পিলুবাণীর মায়ের শ্বশুরবাড়ির পাশেই থাকে। এখন একা মানুষ। একটা বউ ছিল, বহুদিন হলো ভিন গাঁয়ের ওদের জাতেরই একটা লোকের কাছে বিক্রী করে দিয়েছে। তাকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করতে পারতো সুঞ্জা, কিন্তু করেনি। সুঞ্জার মন যে অনুক্ষণ পিলুবাণীর মায়ের দিকে পড়ে থাকতো, এ কথা অন্ততঃ তার জানতে বাকী নেই।

সুঞ্জা একটু দম নিয়ে বলে—পিলুবাণীর বাবা আর মা ভিন গাঁয়ে চলে যাচ্ছে ঘর বাঁধবে বলে।

—কেন?

—বাপ আর ছেলেতে তুমুল ঝগড়া।

বিম্বু বলে—রাজার কাছে গিয়ে মিটিয়ে নিলেই ত হয়।

সুঞ্জা বললে—তা যাবে না, নিজেরাই নিজেদের বিচার করবে। ছেলে তার বউকে নিয়ে চলে যাচ্ছে, 'টু-এল্' বা গোয়ালের একটা মোষও সঙ্গে নিচ্ছে না। ভিন গাঁয়ে গিয়ে ওদের চলবে কী করে বল ত?

—নিশ্চয়ই তোর কাছে আসবে।

—কে আসবে?

—কে আবার! টুরা। পিলুবাণীর মা।

—মোষ চাইতে?

—হ্যাঁ।

দাঁতে ঠোঁট কামড়ে ধরে বিস্নু কথাটা ভাবলো কয়েক মুহূর্ত ধরে। তারপরে বললে—লজ্জা করবে না ?

—কেন ?

বিস্নু বললে—আর কিছু নয়, মেয়েটাকে ফেলে চলে গেল, একবার এসে দেখেও যেতে নেই! এমন পাথর দিয়ে তৈরী মা!

সুঞ্জা বসে পড়লো উঁচু একটা পাথরের ওপর। বললে—বোস বিস্নু। কথা আছে।

বিস্নু বসলো। সুঞ্জা বললে—পিলু কোথায় ?

—ঘরে।

—ঠিক আছে তাহলে,—সুঞ্জা একটুক্ষণ থেমে থেকে তারপরে বলতে শুরু করলো—আমার কাছে একদিন এসেছিল টুরা চুপিচুপি। কাঁদলো আমার কাছে বসে। মেয়েকে এখনও ও কম ভালোবাসে না। তোকে লুকিয়ে লুকিয়ে, এমন কি মেয়েও জানতে পারে না, ও আসে, এসে দেখে যায় মেয়েকে।

বিস্নু অবাক হলো, বললে—সত্যি বলছিস ?

—সত্যি। সিরুভবানীর জল যেমন সত্যি তেমনি সত্যি।—সুঞ্জা বললে—আমিই ত কতদিন দেখেছি, চোখের জল মুছতে মুছতে ফিরে চলেছে টুরা মেয়েকে আড়াল থেকে দেখে নিয়ে।

বোধ হয় একটু নরম হলো বিস্নুর মন, বললে—দেখ্‌, সুঞ্জা, আমি ওর কে ? কেউ না। আমি জংলী কুরুম্বাদের সঙ্গে মিশি, বাদাগাদের অনেক মানুষ যারা জঙ্গল ছাড়িয়ে নানান মানুষেয় সঙ্গে দেখা করতে যায়, আমি সেই সব বাদাগাদের ডেকে ডেকে বাইরের খবর নিই, সেইজন্য আমাকে সবাই একঘরে করে রেখেছে। বয়ে গেছে আমার তাতে। কিন্তু যখন দেখলাম আমারই মতো একটি মেয়েও সমাজের বাইরে দাঁড়ালো, তখন আমি অবাক না হয়ে পারিনি। সত্যি কথা বলতে কি, টুরাকে মনে মনে আমি খানিকটা ভালোই বেসে ফেলেছিলাম—

সুঞ্জাও মনে মনে টুরাকে ভালোবাসত। কিন্তু এ কথায় সে রাগ করলো না। ওদের সমাজে নারীর সতীত্বের মূল্য আলাদা, সেইজন্য ওদের এ বিষয়ে যে অসাধারণ সহনশীলতা আছে, তা আমাদের বিস্ময়ে হতবাক্ করে দেয়।

সুঞ্জা ওর কথা শুনতে শুনতে হঠাৎ একটু চকিত হয়ে ওঠে, কী যেন একটা অদ্ভুত কথা মনে পড়েছে, এমনিভাবে বলতে শুরু করলো—জানিস বিম্বু, একটা সাংঘাতিক ব্যাপার ঘটেছে। আমাদের সেই পাগলা ফোরিকে মনে আছে? ঐ যে গাছের গুঁড়িতে আড়াআড়ি আর লম্বা লম্বা দাগ কাটে ছুরি দিয়ে, আর বিড়বিড় করে বলে, একজন টোডা গেল, একজন টোডা এলো?

বিম্বু বললে—মা'র কাছে মাসীর গল্প করছিস যে! ফোরি কী করেছে তাই বল।

সুঞ্জা বললে—সিরুভবানীর জলে চান করতে গিয়ে ভয় পেয়ে গোঁ-গোঁ করতে করতে চলে এসেছে।

—তারপর?

সুঞ্জা বললে—আমরা যত জিজ্ঞাসা করি, তত গোঁ-গোঁ করে, আর সিরুভবানীর দিকে আঙুল উঁচু করে দেখায়।

—কেন?

সুঞ্জা বললে—আমরা কজন ছুটে গেলাম। দেখি, ভয় পাবার মতন ব্যাপারই বটে। ঐ যে সাদা মানুষদের 'মাণ্ডে'—ওখান থেকে দুটো সাদা মানুষ এসেছে ঝগড়া করতে করতে। 'ঝগড়া' মানে সাংঘাতিক ঝগড়া! একটা সাদা মানুষ আরেকটা সাদা মানুষকে মেরে ফেলেছে একেবারে, সে এক রক্তারক্তি কাণ্ড।

—তাই নাকি! কী আশ্চর্য! আর আমিই কিছু জানি না!

সুঞ্জা বললে—তুই জানবি কী করে? তুই কি গাঁয়ে থাকিস?

—তা বটে। কিন্তু, কী হলো তারপর?

সুঞ্জা বললে—একটা মানুষ এসেছে নীচে থেকে ওদের সঙ্গে আরও

লোকজন নিয়ে। সে-মানুষটা বাদাগাদের ভাষায় কথা বলতে পারে। তার নাম পণ্ডিত। সে নাকি সাদা মানুষদের খাতাপত্তর লেখালেখি করে, সাদা মানুষদের মাঞ্ছেই থাকে।

—পণ্ডিত?

—হ্যাঁ, পণ্ডিত।—সুঞ্জা বললে—পরনে লম্বা কাপড়, আমাদের মতো খাটো কাপড় নয়। গায়ে আমাদের 'পুটকলী'র মতো মোটা চাদর আছে, তবে ঠিক আমাদের মতো অতো সুন্দর লাল পাড় তোলা চাদর নয়; চাদরের নীচে গায়ের ওপরে সাদা মানুষদের মতো একটা কিছু আছে, তাকে বলে কুর্তা, তবে সাদা মানুষদের মতো লম্বা কুর্তা নয়, ছোট কুর্তা। মাথায় বাদাগাদের মতো পাগড়ি আছে। কপালে সাদা সাদা তিনটে দাগ আছে আড়াআড়িভাবে টানা, উল্কির মতো। পাকা উল্কি নয়, কাঁচা; হাত দিয়ে মুছে ফেলা যায়। লোকটি বললে—সে পণ্ডিত, দেবতার পুজা-আর্চা করে।

—সে আবার কী রকম? আমাদের 'পেলল'দের মতো? সূর্যের দিকে তাকিয়ে নাকের কাছে হাত রেখে মনে মনে মন্তর পড়ে?

—কে জানে! তা জানি না।—সুঞ্জা বললে—তবে লোকটির জাত জেনেছি, লোকটি হিন্দু। হিন্দুরা নীচে থাকে জঙ্গলের ওপারে, ওদের নাকি মন্দির আছে।

বিস্থু বললে—রাখালের কাছে থেকে হিন্দুদের মন্দিরের কথা শুনেছি বটে।

এবার জিজ্ঞাসার পালা সুঞ্জার। সে প্রশ্ন করলো—রাখালটা আবার কে হে? বাদাগাদের সেই লোকটা, যে তোকে 'গুডু' দেয় এখনো?

এ কথায় একটু বুঝি রেগে গেল বিস্থু, বললে—'গুডু দেয় এখনো' মানে কী? গুডু দিতে ও বাধ্য।

সুঞ্জা বললে—আজকাল সাদা মানুষদের কথায় গুডু দেওয়া বন্ধ করেছে বাদাগারা, সে খবর রাখো?

—বলিস কী !

সুঞ্জা বললে—দিনকাল সব বদলে যাচ্ছে। "পীর্‌জ"-এর রাজ্যে যেখান পর্যন্ত তাঁর কিরণ ছড়িয়ে পড়ে, সেখান পর্যন্ত সব পাহাড়েই আমাদের বাপ-পিতামোরা মোষ চরিয়েছে যেখানে খুশি। বাদাগারা এলো চাষবাস করতে। ওদের সঙ্গে বন্দোবস্ত হলো, যা ফসল হবে তার আট ভাগের এক ভাগ ঐ এলাকায় যে মোষ চরায় তাকে খাজনা দেবে ওরা। এই খাজনাকেই ত আমরা বলি গুডু? তা এই গুডু দেওয়া একে একে সব বাদাগাই বন্ধ করে দিচ্ছে।

বিস্থু বললে—তা না হয় হলো। আসল কথাটা কী? সাদা মানুষ দুজন মারামারি করলো কেন, সেটা বল।

সুঞ্জা বললে—সেই কথাটাই ত বলছিলাম। সাদা মানুষদের মেয়েছেলেকে বলে 'মেম'। এই রকম একটি মেমকে ঐ দুটো সাহেব একসঙ্গে ভালোবেসেছিল বিয়ে করতে চেয়েছিলো। এই জন্যে হলো মারামারি, রক্তারক্তি।

বিস্থুর বিস্ময় আর সীমারেখা মানতে চায় না। সে বলে ওঠে—এমন একটা সামান্য ব্যাপারের জন্য একজন আরেক জনকে মেরেই ফেললো একেবারে! বলিস কী?

সুঞ্জা বলে—সাদা মানুষগুলো জংলী ভূত একেবারে। যাকে বলে স্বার্থপর। কেন বাপু, মেয়েটাকে দুজনে মিলে ভালোবেসেছিস, দুজনে মিলেই বিয়ে করে ফেল না। বউ এর কাছে ছ'মাস থাকুক, ওর কাছে ছ'মাস,—ব্যস, ভাবনাটা আর কী। যাই বলিস বিস্থু, আমরা ওদের থেকে ঢের বেশী সভ্য।

বিস্থু আর কিছু বলে না ওর কথার পিঠে, চুপ করে নিজের মনে কী যেন ভাবতে থাকে। একটা হিমেল হাওয়া এসে অদূরের গাছটার পাতায় পাতায় দোল দিয়ে ফিরতে থাকে শুধু। সুঞ্জা তার গায়ের কম্বল বা 'পুটুকলী'টা টেনেটুনে ঠিকঠাক করে নেয়।

শেষ পর্যন্ত বিষ্ণুই কথা শুরু করে অবশ্য। একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলতে শুরু করে—পিলুকে গিয়ে দিয়ে আসবো টুরার কাছে ?

—কেন ?

বিষ্ণু বলে—ওরা অন্য পাহাড়ে গিয়ে ঘর বাঁধছে বললি না ?

সুঞ্জা বললে—তাতে কী হলো ? পিলুকে ওরা নেবে কেন ?

বিষ্ণু অসহিষ্ণু কণ্ঠে বলে ওঠে—কী আশ্চর্য ! পিলুর মা নয় টুরা ?

সুঞ্জা অল্প একটু হাসলো, বললে—মা মায়ের কাজই করেছে। মেয়েকে প্রাণে বাঁচিয়ে দিয়েছে, পাঁচ বছরেরটি করে তুলেছে। সমাজ পিলুকে নেবে না, কিন্তু তা বলে প্রাণে মারা পড়বার আর ভয় নেই ত !

বিষ্ণু বলে—তা নেই, কিন্তু তুই বল ত সুঞ্জা, আমিই বা ওকে রাখবো কেন ?

সুঞ্জা উত্তর দিলো—রাখলেই বা দোষটা কী ? তোর ত আর অন্য বউ নেই।

—'অন্য বউ নেই' মানে ?—বিষ্ণু সোজা হয়ে দাঁড়ায়—বলছিস কী ?

সুঞ্জাও উঠে দাঁড়ায়। মিটিমিটি হাসে সে। বলে—টুরা আমাকে বলেছে। বলেছে, বিষ্ণুকে বলিস আমাকে যেন একটা ছোট্ট কাপড় দিয়ে যায়। আমি তাহলে শাশুড়ী হলাম না ?

দুর্দান্ত বিষ্ণু আর মাথা ঠিক রাখতে পারে না, ঠাস করে একটা চড় বসিয়ে দেয় সুঞ্জার গালে। চড়টা বেশ জোরালোই হলো বলা যায়, মাথাটা ঘুরে পড়ে যায় সুঞ্জা। একটু সামলে, উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলে—আমি তোর বন্ধু ছিলাম, আমাকে তুই শত্রু করলি—মনে থাকে যেন।

তখনো বুঝি শান্ত হয়নি বিষ্ণু, বুনো মোষের মতো তখনো রুখে দাঁড়িয়ে আছে। বললে—ম্যাটৃস্নি ! আমার সঙ্গে ঐটুকু বাচ্চা

মেয়ের ম্যাট্‌স্নি! ভেবেছে কি টুরা! বলে দিস, মোষ চাইতে এলে দূর দূর করে তাড়িয়ে দেবো।

সুঞ্জা ওর মনের ভাবটা এতক্ষণে যেন একটু হৃদয়ঙ্গম করতে পারে। বলে—রাগ তোর টুরার ওপর, অথচ মারলি কিনা আমাকে!

সে কথা কানেও তোলে না বিষ্ণু, নিজের মনেই গর্জন করতে থাকে—শাশুড়ী! কাপড় দিতে হবে ম্যাট্রিস্নির! আহ্লাদ! নিয়ে যা তোর মেয়েকে—এখ্‌খুনি নিয়ে যা।

বলতে বলতে ঘরের দিকে এগিয়ে যায়, ডাকতে থাকে—এই পিলু, পিলু! বেরিয়ে আয় শীগগির।

ভয়-পাওয়া শাবকের মতোই ধীরে ধীরে বেরিয়ে আসে পিলুবাণী। সে জানে, বিষ্ণু রেগে গেলে ওকে যমের মতো ভয় করে সবাই। ঘরে লুকিয়ে থাকলে হয়ত চুলের মুঠি ধরেই টেনে বার করে আনবে।

সুঞ্জা কিন্তু একটু অবাক হয়েই দেখছে পিলুবাণীকে। লাল পাড় বসানো '[illegible]কলী'তে ছোট্ট দেহখানি ঢাকা, মাথার চুল বেশ বড়ো বড়ো হয়ে কাঁধ পর্যন্ত নেমেছে, অনায়াসে বিনুনি বেঁধে দেওয়া যায়, কিন্তু কে করছে সে পরিচর্যাটুকু! মুখখানি ফরসা, কচি কচি, টিকোলো নাক, বড়ো বড়ো চোখ ছুটি, বাঁকা সুগঠিত ভুরু, পাতলা ঠোঁট—সব মিলিয়ে অবিকল ওর মায়ের মুখেরই প্রতিচ্ছবি।

বিষ্ণু বললে—এদিকে আয়।

ভয়ে ভয়ে কাছে এসে দাঁড়ালো। বিষ্ণু বললে—আমার কাছে তোর আর থাকা হবে না। ঐ ওর কাছে চলে যা—সুঞ্জার কাছে। ওর সঙ্গে তোর ম্যাট্রিস্নি হবে, ওর কাছেই তুই থাকবি।

ঐটুকু মেয়ে ম্যাট্রিস্নির কিছুই বোঝে না, হয়ত আসতে যেতে কারুর কাছ থেকে নামটা শুনে থাকবে। অথচ, কী আশ্চর্য, মেয়েটা সোজা শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লো, ভয়ের রেশটুকুও চোখ আর মুখ থেকে মিলিয়ে গেল মুহূর্তে। ঠিক টুরার মতো ভঙ্গীতে ধারালো

গলায় বলে উঠলো পাঁচ বছরের ছোট্ট মেয়েটা—না, যাবো না। ম্যাট্রিমুনি হবে না।

কথাটায় যেন ক্ষেপে গেলো বিন্থু, চীৎকার করে উঠলো—বলছিস কী!

সুঞ্জা সব ভুলে হাঁ-হাঁ করে ছুটে এলো, বললে—করিস কী বিন্থু, ঐটুকু মেয়ের গায়ে হাত তুলিস না।

কিন্তু কে থামাবে বিন্থুকে? সে দু হাতে পিলুকে ধরে ঝাঁকাতে লাগলো—ব। তুই আবার কথাটা।

পিলু চোখ বুজে, চোয়ালটা শক্ত করে বলতে লাগলো—কেন বলবো না। আমার যে মা ছিলো সে আমাকে নিজে বলে গেছে।

—কী?

—ম্যাট্রিমুনি।

—কার সঙ্গে?

পিলুর ঠোঁট দুখানা তখনো কাঁপছে, চোখের কোণে জল। বিন্থুর দিকে তাকিয়ে বললে—তোর সঙ্গে।

ওকে ছেড়ে দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে সোজা হয়ে দাঁড়ালো বিন্থু। সুঞ্জার মুখখানা বিবর্ণ দেখাচ্ছে।

একটু সামলে নিয়ে পিলু বলতে লাগলো—একদিন আমার যে মা ছিলো, সে এসেছিলো। ঘরে আসেনি, পাগলা ফোরি যেখানে থাকে, গাছপালায় আঁকিবুকি কাটে, আর আমাদের জাতের কত লোক মরলো আর এলো খোঁজ রাখে,—সেখানে আমাকে ডেকে নিয়ে গিয়েছিলো। ফোরি তখন ছিলো না, সাদা মানুষদের 'মাণ্ডে' গেছে। আমায় ছুঁলো না আমার যে মা ছিলো, সে। দূর থেকে দাঁড়িয়েই বললে—লক্ষ্মী হয়ে থাকিস বিন্থুর ঘরে। তুই বিন্থুর বউ।

সুঞ্জা তার ফ্যাকাশে মুখখানার ওপর ম্লান একটু হাসি টেনে আনে, বলে—দেখলি ত? সত্যি বলেছিলাম কি না, টুরা আসে মেয়েকে দেখতে লুকিয়ে লুকিয়ে?

বিম্বুর চওড়া বুকখানা হাপরের মতো ওঠা-নামা করছে। সে বললে—কিন্তু এ কী সাংঘাতিক কথা মেয়ের মনে ঢুকিয়ে গেছে সে! না না, এ হয় না—কিছুতেই হয় না।

বলে এগিয়ে এসে দুখানা হাত জড়িয়ে ধরে সুঞ্জার। বলে—তুই ওকে নিয়ে যা সুঞ্জা, তুই ওকে এখুনি নিয়ে যা।

তেমনি ম্লান হাসে সুঞ্জা, বলে—ও কার কাছে কোন্ ঘরে থাকবে সে তো ঠিক হয়ে গেছে, এখন আর এসব কথা তুলছিস কেন?

বিম্বু তাড়া দিয়ে ওঠে—তুই ওকে নিবি কি না?

—না।

সুঞ্জার কণ্ঠের দৃঢ়তা বিম্বুকে বিস্মিত করে দেয়। সে ওর দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে, কিছুক্ষণ কথাই বলতে পারে না।

সুঞ্জা বলে—টুরা তার মেয়ের ব্যবস্থা ঠিকই করে গেছে। মেয়ের ম্যাট্রিক্সনি হলেই মায়ের দায়িত্ব যে শেষ হয়ে যায়, একথা কে না জানে!

বিম্বু বললে—ওসব কথা আমি মানি না। তুই ওকে নিবি কি না, শেষ কথা বলে দে। কেউ যদি ওকে না নেয়, আমি ওকে শেষ পর্যন্ত বাদাগাদের কাছে দিয়ে দেবো। রাখালকেই বলবো। সেখানে ও সুখেই থাকবে।

ম্লান হাসে সুঞ্জা, বলে—সে তুই পারবি না।

—আলবৎ পারবো।—চীৎকার করে ওঠে বিম্বু, বলে—রাখাল কালই আসবে আমার কাছে, ওর হাতে দিয়ে দেবো।

সুঞ্জা বলে—বদনাম হবে না?

—কিসের বদনাম?

সুঞ্জা একটুক্ষণ চুপ করে থেকে তারপরে বলে—টোডা মেয়েকে বাদাগার হাতে তুলে দিয়েছে কখনো কেউ?

আরও যেন ক্ষেপে যায় বিম্বু, বলে—কে বললে ও টোডা মেয়ে! ওকে তোরা সমাজ থেকে, জাত থেকে বার করে দিয়েছিস। এমন কি

পাগলা ফোরি পর্যন্ত গাছের গুঁড়িতে একটা দাগ বাড়িয়ে রেখেছে পিলুর নাম করে। তার বিচারে ও মরে গেছে।

হঠাৎ কী হলো, একথা শুনে পাঁচ বছরের মেয়েটা হু-হু-করা কান্নায় ভেঙে পড়লো একেবারে।

—কী হলো ?

সুঞ্জা এগিয়ে আসে।

ছ'হাতে মুখ ঢেকে কাঁদতে কাঁদতে মেয়েটা বললে—আমি মরে গেছি।

সুঞ্জা ওর হাত ধরে ওকে শান্ত করার চেষ্টা করতে থাকে।

বিম্বু বলে—ওকে ছুঁলি যে! জাত যাবে না ?

সুঞ্জা উত্তর দেয়—তোর যেমন জাত গেছে, আমারও না হয় তেমনি যাবে।

বিম্বু বলে—তাহলে আর আপত্তি কেন ? ছুঁয়েছিস যখন, সঙ্গে করে নিয়ে যা না।

সুঞ্জা বললে—না। আমি 'পেলল' হবো ঠিক করেছি।

[ওদের ভাষায় 'পেলল' বলতে যা বোঝায় তা খানিকটা আমাদের পূজারী বা পুরোহিতের মতো। ওদের মধ্যে মূর্তিপূজা তখনো ছিল না, ওরা সূর্যের সামনে দাঁড়িয়ে হাতের মুদ্রায় প্রণাম করে, অর্ঘ দেয়। অন্যের হয়ে এই সব অর্ঘ যারা দেয় তাদের বলে 'পেলল'। পেললরা শুদ্ধাচারী থাকে। নারীসঙ্গবর্জিত। নারীসঙ্গ যেদিন করবে সেদিন সে আর 'পেলল' রইলো না। কিছুদিন সংসারী থাকার পর আবার সে নারীসঙ্গ বর্জন করে 'পেলল'গিরি করতে পারে।]

বিম্বু বললে—হঠাৎ এরকম চিন্তা এলো যে ?

সুঞ্জা বললে—ওকে কাছে ডেকে নে, বড্ড কাঁদছে। আমি নতুন ধরণের 'পেলল' হবো। সাদা মানুষদের খাতা লেখে ঐ যে পণ্ডিতের কথা বললাম, তার সঙ্গে আমার খুব ভাব হয়ে গেছে। সে আমাকে

হিন্দুদের মতো মন্দির বানিয়ে দেবে, আমি সেই মন্দিরে থাকবো 'পেলল' হয়ে, কোথাও যাবো না।

—হিন্দুদের দেবতাকে পুজো করবি তুই টোডা হয়ে?

সুঞ্জা বললে—না, তা ঠিক নয়। পণ্ডিত বলেছে, মন্দিরে বসেও 'টিয়েকজ্রি'র পুজো করা যায়। পণ্ডিত সব দেখিয়ে শুনিয়ে দেবে।

—পার্থ-কাই কিছু বলবে না?

সুঞ্জা বললে—পার্থ-কাই নিজেই ভিতরে ভিতরে ভয় পেয়ে গেছে সব দেখে-শুনে। সাদা মানুষরা দলে দলে আসছে তাদের মাণ্ডে। যদি তারা এই পাহাড়ে পাহাড়ে ছড়িয়ে পড়ে? সেদিন আমরা যাবো কোথায়? নইলে পিলু আজও বেঁচে থাকতে পারে? আগেকার দিন হলে মায়ের বুক থেকে ওকে ছিনিয়ে নিয়ে দিয়ে আসতো দেবতার কাছে।

'পিলু' নামটা কানে আসতেই হঠাৎ কী হলো বিম্বুর মনের মধ্যে, সে দু'হাত বাড়িয়ে মেয়েটাকে কাছে টেনে নিলো। মেয়েটা তখনও কাঁদছিল ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে। তাকে অস্ফুট স্বরে সান্ত্বনা দিতে লাগলো সে—ভয় নেই রে, ভয় নেই।

সুঞ্জা বললে—আমি যাই। পার্থ-কাই আজ যাবে সাদা মানুষদের মাণ্ডে। আমিও দলের সঙ্গে যাবো, পণ্ডিতের সঙ্গে দেখা করে আসবো।

মাথা নীচু করে রইলো বিম্বু, কিছু বললে না। সুঞ্জা কয়েক পা এগিয়ে গিয়েও ফিরে দাঁড়ালো, বললে—বিম্বু, তুই আমাকে মারলি বটে, কিন্তু ভালো করলি না। আমি কারুর কোনো ক্ষতি করবো না, কিন্তু নিজের ওপরেও ত একটা ঘেন্না আসতে পারে। সেই ঘেন্নাতেই 'পেলল' হবার চেষ্টা করবো তাড়াতাড়ি। তোদের টুরা আর তোদের পিলুরাণীকে নিয়ে তোরা সুখে থাক।

উত্তরে বিম্বু মুখ তুললো শুধু, কিছু বললো না। সুঞ্জা হনহন করে এগিয়ে গিয়ে ধীরে ধীরে টিলার আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল।

বিন্দু পিলুকে ছেড়ে দিলো। বললে—ঘরে যা। আমি মোষগুলোকে চরতে দিয়ে এসেছি, দেখি গিয়ে কী করছে।

মেয়েটা কেঁদে কেঁদে এবার চুপ করেছে। চোখের নীচে গালের ওপরে চোখের জল শুকিয়ে আছে, বড়ো বড়ো চোখের কোণ দুটি লাল। বিন্দু ওকে ছেড়ে কিছুদূর চলে যেতেই মেয়েটা আর থাকতে না পেরে পিছন থেকে বলে উঠলো—আমি মা'র কাছে যাবো না।

থমকে দাঁড়ালো বিন্দু, বললে—কেন যাবি না? যদি নিতে আসে?

দুর্দান্ত জেদের সঙ্গে মেয়েটা বলতে লাগলো—যাবো না, কিছুতেই যাবো না। না না।

বলতে বলতে আবার চোখে জল এসে গেল ওর।

বিন্দু কাছে এসে দাঁড়ালো। দূর থেকে একটা মোষ বুঝি ডেকে উঠলো, একটা বাছুর সাড়া দিলো সঙ্গে সঙ্গে। বাচ্চাটা বোধ হয় চলতে চলতে পিছিয়ে পড়েছিল, তাই বুঝি তার মা তাকে কাছে ডেকে নিলো।

বিন্দু পিলুবাণীর হাত ধরলো, বললে—তোর মা তোর কাছে যে লুকিয়ে একদিন এসেছিল এ কথা আমাকে বলিসনি কেন?

—বারণ করে দিয়েছিলো বলতে।

—তুই ওর বারণ শুনলি কেন?

মেয়েটা চুপ করে রইলো। পাঁচ বছর মাত্র বয়স, কিন্তু ভাবভঙ্গী দেখে মনে হয় বয়স আন্দাজে ও ঢের বেশী বুঝতে শিখেছে, বয়স আন্দাজে ঢের বেশী জেনেও গেছে। সম্ভবতঃ ওর পাঁচ বছরের বিচিত্র জীবনে যেটুকু অভিজ্ঞতা হয়েছে, সেই অভিজ্ঞতাই ওকে বয়স অনুপাতে ধারণা করতে শিখিয়েছে বেশী।

বিন্দু বললে—আমার কাছেই থাকতে চাস?

—হ্যাঁ।

ছোট থেকে ত ওরই কাছে আছে মেয়েটা। ওর ওপর বিন্দুর মায়াও অপরিসীম। কিন্তু আজ যেন সবই ওলট-পালট হয়ে যাচ্ছে।

টুরা যে মনে মনে তাকেই পিলুর বর ঠিক করে রেখেছে, এ-চিন্তা এতো অভিনব, এতো অদ্ভুত যে, মেনে নেওয়া একপ্রকার অসম্ভবই বলা চলে। আর, যখনই চিন্তাটা ফিরে ফিরে আসছে, তখনই ভিতরটা যেন দাউদাউ করে জ্বলে উঠছে। মনে হচ্ছে, টুরা একটা নিদারুণ প্রতিশোধ নিতে চায় মেয়েকে তার সঙ্গে বিয়ে দিয়ে। টুরাকে সে মনে মনে ভালোবেসেছিল, টুরাকে সে মনে মনে পেতে চেয়েছিল। টুরা তার কাছে এলো, কিন্তু সেভাবে থাকলো না, মেয়ের ভার সম্পূর্ণ তার ওপর ফেলে তার স্বামীর কাছে ফিরে গেল।

কথাগুলো ভাবতে ভাবতে ততক্ষণে ঘরের মধ্যে চলে এসেছে বিম্বু পিলুর হাত ধরে। ঘরটা চৌকো, মাঝখানে একটা অনুচ্চ বেড়া বেঁধে রেখেছে বিম্বু অভ্যাস মতো। নইলে, যার জন্য বেড়া দেওয়া, সেটা সে মেনে চলে না। এবং মেনে চলে না বলেই কোনো টোডা তার ঘরেও ঢোকে না। এমনি দৃঢ় তাদের সংস্কার। বেড়ার একধারে ঘি, ঘোল, মাখন তৈরি করবার যন্ত্রপাতি আর হাঁড়িকুড়ি, আর অন্যধারে ছোট্ট উনুন, ভাতের হাঁড়ি, রান্না করবার তৈজসপত্র। রান্নার জায়গায় মেয়েরা থাকতে পারে, কিন্তু ঘি-ঘোল-মাখনের দিকে মেয়েরা যেতে পারে না বা ওসব ছুঁতেও পারে না। বিম্বুর মনে পড়লো, টুরার প্রথম সন্তান মেয়ে বলে তাকে দেবতার কাছে বলি দেবার কথা থাকলেও সে সংস্কারের বিরুদ্ধে প্রাণপণে রুখে দাঁড়ালো, অথচ সেই টুরাই এই ঘরের ভিতরে কখনো বেড়া পার হয়ে মাখন তৈরীর হাঁড়িকুড়ি ছোঁয়নি। এতে নাকি তাদের দেবী, যিনি ঝড় বৃষ্টি আনেন, মহিষ ধরায় সাহায্য করেন, তিনি নাকি রেগে যান। দেবীর নাম 'টিয়েকৃজ্রি'—তিনি কোনো কারণে ক্রুদ্ধ হলে আর রক্ষা নেই।

[মনে রাখতে হবে আমি বলছি ১৮২৪ সালের কথা, তখন আমাদের বাংলাদেশে শ্রীমধুসূদন জন্মেছেন মাত্র, আর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের বয়স চার বছর। আমাদের দেশে কেউ বিধবা বিবাহের কথা তখনো ভাবতে পারেনি, কুলীন পুত্রেরা তখনও একের পর এক

বিয়ে করেন, বিবাহ করাটা তখন বহু কুলীন সন্তানেরই ব্যবসা। রামনারায়ণ তর্করত্নের বয়স তখন মাত্র দুই বছর, 'কুলীনকুল-সর্বস্ব' নাটক লেখা হতে তখনও অনেক দেরী। এমন কি ভয়াবহ সতীদাহপ্রথা পর্যন্ত তখনও নিরোধ হয়নি। তখনো গঙ্গাসাগরে সন্তান ফেলে দিয়ে আসবার প্রথা বন্ধ হয়নি বাংলাদেশে। এক কথায়, বাংলাদেশ তখনও বহু অন্ধসংস্কারের দাসত্বে শৃঙ্খলিত। আর, যেখানকার কথা বলছি, সেই নীলগিরি-উপত্যকার সন্নিহিত 'কুর্গ' রাজ্যে প্রচণ্ড আলোড়ন চলছিল তখন। মাত্র চার বছর আগে কুর্গের "বাররাজা" সিংহাসনে উঠে আত্মীয়স্বজন যাঁকে পেয়েছেন তাঁকেই নির্বিচারে হত্যা করেছেন। কিছু কিছু লোক প্রাণে বেঁচেছেন কোনোরকমে, তাঁদের মধ্যে একজন চলে এসেছেন নীলগিরি-উপত্যকায় সাদা মানুষ বা ইংরেজদের মাণ্ডে, যার নাম ইংরেজরা দিয়েছে উটকামণ্ড। পলাতক লোকটি ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত সেজে ইংরেজদের খাতা-লেখার কাজ করেন। সুঞ্জার সঙ্গে আলাপ হয়েছে তাঁর সম্প্রতি। তিনি ইংরেজদের মাণ্ডে থাকতে থাকতে ওদের ভাষা কিছু কিছু শিখে নিয়েছেন এরই মধ্যে।]

কিন্তু যে-কথা বলছিলাম। পিলু কিন্তু অনায়াসে চলে যায় ঘি আর হাঁড়িকুড়ির কাছে, তাকে কেউ বারণ করেনি। বিষ্ণুর বুকটা প্রথম দিন কেঁপে উঠেছিল অজানা ভয়ে, কিন্তু পরে সেও মনটাকে শক্ত করে নিয়েছে। ভেবেছে, 'টিয়েকৃজ্রি' রাগ করবেন না, কারণ ও-মেয়ে ত সমাজের বাইরের লোক, টোডাদের ও কে!

ঠিক সেই কথাটাই ঘরের ভিতরে এসে বিষ্ণু বললে পিলুবাণীকে। বললে—তুই টোডাদের কেউ নোস্। তোকে যদি বাদাগাদের হাতে দিয়ে দেই তাহলে আমার কোনো পাপ হবে না।

মেয়েটা ঠিক বুঝতে পারে না ব্যাপারটা। সে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে বিষ্ণুর দিকে। তারপরে কী ভেবে জড়িয়ে ধরতে যায় বিষ্ণুর হাতখানা। বিষ্ণু রাগ করে ছাড়িয়ে নেয়, বলে—ভাগ্!

তারপরে একটু সামলে নিয়ে নরম গলায় বলে—খেয়েছিস সকালে কিছু ? খেয়ে নে। আমি মাঠ থেকে ঘুরে আসছি।

ওকে রেখে বিম্মু চলে গেল উপত্যকার অন্য দিকে, চারণভূমিতে, যেখানে ওর মোষগুলো চরছে নিজের মনে। মাত্র দুটো মোষ ওর। আরও দুটো দরকার। তার ওপরে টুরা যদি আসে মোষ চাইবার প্রার্থনা নিয়ে ? তখন প্রাণ হাতে করে বুনো মোষ ধরতে তাকেই ত যেতে হবে জঙ্গলের মধ্যে ? তখন টুরার স্বামীও আসবে না, শ্বশুরও আসবে না।

নিজের মনে মনেই বকবক করতে লাগলো বিম্মু, কেন, আমার কাছে কেন ? পার্থ-কাই রাজা, তার 'টু-এল্'-এ যতো মোষ আছে এমন কারো নেই। তার কাছে যাও না ? চাইতে পারো না একটা মোষ ? যাও, আমি দেবো না। ঐটুকু মেয়েকে আমার বউ করে ফেলে দিয়ে পালিয়ে যাবার সময় মনে ছিল না ! যাকে আমি বাচ্চা থেকে পাঁচ বছরেরটি হতে দেখলাম চোখের সামনে, সে আমার বউ ? ছি ছি ! আমি কালই ওকে তুলে দেবো রাখালের হাতে।

হঠাৎ এই সময় একখণ্ড কালো মেঘ উড়ে এলো বনের কিনারা থেকে, হাওয়া এলো ঘূর্ণির মতো। খাড়া-খাড়া ঝাউগাছগুলো নড়ে উঠলো, যেন বলতে চাইলো—সাবধান, সাবধান ! দূরের মোষগুলো তৃণ থেকে মুখ তুলে তাকালো, বাছুরগুলো ছুটে গেল তাদের মায়ের কাছে।

সারারাত বিম্মু ঘুমোতে পারেনি। চোখে একটু তন্দ্রার ঘোর এসেছে কি আসেনি, অমনি দুঃস্বপ্নের মতো জেগে উঠেছে টুরার মুখখানা। সে যেন পাগলের মতো হাসছে, আর বলছে, কেমন জব্দ ! দুর্দান্ত পুরুষ তুমি, তোমাকে বাঁধতে পারবো না ! ঐ মেয়ে দিয়েই বাঁধবো !

ধড়মড় করে জেগে ওঠে বিম্মু। পাশ ফিরে হাঁটু দুটো একটু মুড়ে

অতি নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে আছে পিলু। ঐটুকু মেয়ে মাকে ছেড়ে আছে। ছেড়ে আছে তারই মুখ চেয়ে। কিন্তু কী মন্ত্র ঢুকিয়ে দিয়ে গেছে ওর মা! এই প্রায়-চল্লিশ-বছর-বয়সের-মানুষটা আমি ঐ পাঁচ বছরের মেয়েটার বর! না না, হতেই পারে না।

কিন্তু যতোবার ঘুমোবার চেষ্টা করে বিম্বু ততোবার নিষ্ঠুর হাসি নিয়ে সেই মুখখানা ভেসে ওঠে সামনে, পাগলের মতো বলতে থাকে—কেমন জব্দ!

ভোর হতে-না-হতেই উঠে পড়ে বিম্বু। ওদের মহিষ থাকে যৌথভাবে একটা গোহালে যার নাম 'টু-এল্'। কিন্তু সমাজবিবর্জিত বিম্বুর 'টু-এল্' তার ঘরের পাশেই। মোষ দুটোকে দুইয়ে বাছুর ছেড়ে দেয়। তারপরে টুকিটাকি কাজকর্ম সেরে মোষ দুটো আর বাছুর দুটোকে নিয়ে মাঠের দিকে চলে যায়। ফিরে আসে একটু পরেই। দুধ দিয়ে চাল সেদ্ধ করে দুজনে খেয়ে নেয়। তারপরে, রোদ্দুর বেশ উঠে যাবার পর বাদাগাদের রাখাল আসে ওর কাছে।

বিম্বু বলে—হ্যাঁ হে রাখাল, কাল শুনলাম কথাটা। তোরা নাকি আমাদের আর 'গুডু' দিবি না?

রাখাল একটুক্ষণ চুপ করে থাকে, তারপর বলে—সাদা মানুষরা তা-ই শেখাচ্ছে বটে।

—কেন?

—তা জানি না,—রাখাল বললে—সাদা মানুষরা বলছে, খাজনা আমাদের কাছে দিবি, আমরা এখন রাজা।

—খাজনা!

রাখাল ওকে বোঝালো—'গুডু'কেই ওরা বলে খাজনা। কথাটা বেশ, না?

বিম্বু বলে—তা তুইও খাজনা দিবি না নাকি আমাকে?

—ছিঃ, কী যে বলিস!—রাখাল বললে—এই দেখ, পুটকলী ছিঁড়ে গেছে বলছিলি না? এনেছি।

একটা থলি মতো ছিল রাখালের হাতে। তার থেকে লাল বর্ডার দেওয়া মোটা একটা চাদর, যেমন তাদের চাদরগুলো হয় ঠিক তেমনিই বটে, বার করলো রাখাল। বললে—দাম বেশ বেড়ে গেছে। দাম পুরো একটা সিক্কা টাকা। খাজনা বাবদ তোকে দিলুম, এই নে।

হাত পেতে বিষ্ণু নিলো পুট্‌কলীটা। তারপরে বললে—আমার নয়, পিলুবাণীর জন্য চেয়েছিলাম। ঠিক আছে, এটা আমার জন্য রইলো ; এতো বড়ো পুট্‌কলী নিয়ে ও কী করবে ? ওকে ছোট্ট একটা বানিয়ে দিস।

আকাশ থেকে পড়লো রাখাল—বানিয়ে দেবো কোত্থেকে ! হিন্দুদের কাছ থেকে কিনতে হয়, তা জানিস ? আমার হাতে আর সিক্কা কই ?

অল্প একটু হাসলো বিষ্ণু, বললে—সিক্কার অভাব হবে না পিলুবাণীর জন্য। বরং আমাকে তুই দশটা সিক্কা উল্টে দিয়ে যাবি।

—কেন ?

বিষ্ণু বললে—তোর তো বউ নেই। বউ পাচ্ছিস না মনের মতো। টাকাও তো অনেক দরকার তোদের জাতে বউ পেতে, নয় কী ? নিয়ে যা তুই পিলুবাণীকে—ও-ই তোর বউ হবে। দেখিস, যত্নআত্তি করবি তো ? বড্ড অভিমানী মেয়ে।

বিস্ময়ে উঠে দাঁড়িয়েছে রাখাল। কয়েক মুহূর্ত তার গলার স্বরই ফুটলো না। তাদের জাতের মেয়েদের মতো কালো কুচ্ছিত নয়, টোডা মেয়েরা হয় রীতিমতো সুন্দরী। ফরসা রঙ, টিকোলো নাক, টানাটানা চোখ, মাথাভরতি পাতলা রেশমের মতো চুল। সাদা মানুষদের পর্যন্ত নজর পড়েছে, হয়তো কালে কালে টোডা মেয়েদের সবাইকে ধরে নেবে সাদা মানুষরা। ওদের হাতে সাংঘাতিক অস্ত্র আছে, দুম্ করে একটা শব্দ, ব্যস, সঙ্গে সঙ্গে মরে গেল একটা মানুষ। সুতরাং ওরা সব পারে।

কিন্তু তার আগে ওদের কেউ কেউ যদি বাদাগাদের ঘরে আসে,

সেটা মন্দ কী ? তবে কথা হচ্ছে, নিজেদের মধ্যে টোডারা যতোই উদার হোক না কেন, বাইরের লোকের ব্যাপারে ওরা ভয়ানক কড়াকড়ি করে থাকে। সেক্ষেত্রে ঐ শান্ত মানুষগুলো যেন একেবারে ক্ষেপে যায়। তার ব্যাপারেও ওরকম হয় যদি ? ওদের রাজার কাছ থেকে বরং অনুমতি চেয়ে নেওয়া যাবে।

বিম্বু ওর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে, বলে—ভাবছিস কী ?

—সত্যি ?

বিম্বু বলে—সত্যি। ওকে তুই নিয়ে যা—এখুনি নিয়ে যা।

—তুই বললেই হয়ে যাবে ?

—হ্যাঁ।

—ওর মা ?

—দরকার নেই।

—রাজা ?

—কোনো দরকার নেই। পিলু টোডা-সমাজের বাইরের মেয়ে।

রাখাল বলে—বাচ্চা মেয়ে, বড়োসড়ো হতে কোন্ না দশ বছর। দশ-দশটা সিক্কা চাইছিস, একটু বেশী হয়ে গেল না দরটা ?

বিম্বু হাত পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়ে মাটির ওপরে, বলে—ওসব বুঝি না। দশটা সিক্কা ফেলো আর নিয়ে যাও। নইলে, কেটে পড়ো।

রাখাল কী ভেবে আর কথা বাড়ায় না, কোমরের গেঁজেজাতীয় একটা থলি থেকে গুনে গুনে সিক্কা টাকা বার করে দশটা, বিম্বুর হাতে তুলে দেয়। তারপরে বলে—এইবার দে।

অদূরের ঘরটা দেখিয়ে বিম্বু বলে—ভিতরেই আছে। নিয়ে যা না ? ও এখন তোর।

পায়ে-পায়ে সত্যিই ঘরের দিকে এগিয়ে যেতে থাকে রাখাল। পলুবাণী ততক্ষণে খাওয়াদাওয়া সেরে আপনমনে কাঠের টুকরোটাকরা নিয়ে খেলা করছে। একটা ছোট্ট টুকরো সাজিয়ে রেখে বললে—এটা বাবা।

অন্য একটা পাশাপাশি রেখে বলে উঠলো—এটা মা।

আরেকটি ততোধিক ছোট টুকরো বেছে নিয়ে একটু দূরে রাখলো, বললে—এটা মেয়ে।

তার পাশে শোয়ালো আরেকটা বড়ো কাঠ, রাখতে রাখতে নিজেই হেসে উঠলো, বললে—বর। বিম্বু।

আর ঠিক সেই মুহূর্তেই তার হাতে এসে পড়লো শক্ত একখানা হাত। চমকে কেঁপে উঠলো পিলু, মুখ তুলে রাখালকে দেখে আতঙ্কে চীৎকার করে উঠলো মেয়েটা।

কিন্তু কে তার আর্তনাদ শোনে! তাকে হাতে ধরে টেনে তুললো রাখাল, তারপরে দু' হাতে পাঁজাকোলা করে নিয়ে ঘরের বাইরে চলে এলো। কিন্তু, কোথায় বিম্বু! পাছে মেয়েটার চীৎকার কানে আসে তাই সে প্রাণপণে ছুটে চলেছে মাঠের দিকে, যেখানে তার মহিষ চরছে সেখানে।

দূর থেকে তাকে তাড়া করে আসছে একটা তীক্ষ্ণ স্বর—বিম্বু, বিম্বু!

দূরে দূরে অন্য সব টোডা পল্লীতেও গিয়ে পৌঁছলো একটা চীৎকার, মেয়েরা কাজ করতে করতে মুখ তুলে তাকালো, একজন প্রশ্ন করলো—কে কোথায় চীৎকার করছে? কচি মেয়ের চীৎকার!

—কে জানে!

প্রতিবেশিনী আবার তার কাজে মন দিলো।

রাজা চলেছিলেন সাদা মানুষদের মাণ্ডের দিকে, সঙ্গে তাঁর বেশ বড়ো একটা দল। তিনিও থমকে দাঁড়ালেন মুহূর্তের জন্য। বললেন—কে কাঁদছে না?

—তা হবে।

—বুনো মোষ কাউকে তাড়া করলো না তো!

চুপচাপ তিনি দাঁড়িয়ে পড়ে শোনবার চেষ্টা করতে লাগলেন ঠিক

কোন্ দিক থেকে আসছে শব্দটা। টিলার পর টিলা যেন ঢেউ তুলে তুলে চলে গেছে। দুই ঢেউয়ের মাঝামাঝি জায়গাটায় গাছপালা লতাপাতা কিশোর-কিশোরীর মতো মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। আর ঢেউয়ের ওপরে তৃণলতা যেন লীন হয়ে আছে মায়ের বুকে শিশুটির মতো।

একজন বললে—নীচে থেকে আসছে শব্দটা। বোধ হয় বাদাগাদের গাঁয়ে একটা কিছু হয়েছে।

—তা হতে পারে।

নিস্পৃহ নিরুৎসুক চিত্তে সাদা মানুষদের মাণ্ডের দিকে চলতে লাগলেন রাজা। বাদাগারা গুডু দেওয়া বন্ধ করছে, সাদা মানুষরা তার বদলে গুডু চাইছে, এর মানেটা কী? তিনি ও-অঞ্চলটা ওদের ছেড়ে দিয়ে এলেন অশান্তি যাতে না হয় সেই ভেবে। কিন্তু তা বলে সমগ্র উপত্যকাটাই তো তিনি দিয়ে দেননি ওদের? না না, এর একটা নিষ্পত্তি হওয়া দরকার।

বেলা যখন পড়ে এসেছে, তখন পা টিপে টিপে ঘরের দিকে ফিরে আসছিল বিম্বু। পিছনে তার মোষ আর বাছুর দুটো। ওদের গোয়ালে ঢুকিয়ে সে ঘরে যাবে। ঘরে কেউ থাকবে না, পিলুর ছোট্ট বিছানাটা আজ খালি পড়ে থাকবে। রাত্রে স্বপ্ন দেখে ভয় পেয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠে আর কেউ তার গলাটা জড়িয়ে ধরবে না দুটি কচি কচি হাত দিয়ে। চোখ দুটি জলে ভরে উঠতে চায়, তবু নিজেকে প্রাণপণে সামলে রাখে বিম্বু। মনে মনে বলে, এ ছাড়া কী-ই বা করবার ছিল আমার! সুঞ্জা ওকে নিলো না, ওর বাবা-মা ওকে নিলো না, সমাজ ওকে স্থান দিলো না, আমি ওকে কাছে রাখতে পারতাম। কিন্তু এখানেও ওর সর্বনাশ করলো ওর মা! ঐটুকু মেয়ের সঙ্গে আমার 'ম্যাটসুনি'!...

আর মেয়েটি কে? না, টুরার মেয়ে। সেই টুরা, যাকে সে

মনে মনে একান্ত করে পেতে চেয়েছিল। এই অসম্ভব ব্যাপারটার বিরুদ্ধে দাঁড়াতে গিয়ে আজ সারাটা দিন তার জঙ্গলে ঘুরে ঘুরে কেটেছে। পাগল ফোরির সঙ্গে দেখা হয়েছিল। হাতে তার একটা বাঁশের চোঙা। বললে, দুধ নেই। একটু দুধ দিবি?

দুধ সে মাঠে ফিরে গিয়ে মোষ দুইয়েও দিতে পারতো। তা সে করলো না, ওর হাত থেকে চোঙাটা নিয়ে ছুটে গেল বনের দিকে। বললে—মাঠে আমার মোষগুলোকে দেখিস, আমি আসছি।

জানে কী বিপদের ঝুঁকি সে আজ মাথায় নিলো। টুরার প্রথম স্বামী আর সে ছিল বুনো মোষ ধরায় ওস্তাদ। শুধু মোষ ধরাই বা কেন, বুনো মোষ ধরে বনের মধ্যেই দুধ দুইয়ে এনেছে তারা। সে গেল মারা ক্ষ্যাপা বুনো মোষের ধারালো শিঙে এফোঁড়-ওফোঁড় হয়ে। বিম্বু রইলো বেঁচে, কিন্তু আজ যদি সে ঐভাবে বন্ধুর মতো অপঘাতে মারা যায় ত কোনো ক্ষতি নেই। এ নিদারুণ অন্তর্জ্বালা থেকে ত বাঁচবে অন্ততঃ!

পাহাড় থেকে খাঁজ ধরে ধরে সে নেমে এলো জঙ্গলের মধ্যে। জংলী কুরুম্বাদের গাঁ-টা বাঁদিকে রেখে সে এগিয়ে গেল ডানদিকে—আরও জঙ্গলের মধ্যে। বাঘ আসতে পারে, হাতি আসতে পারে, সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই, যেন বেঘোরে প্রাণটা দেবে বলেই পণ করে বেরিয়েছে বিম্বু।

চলতে, চলতে, চলতে, মাথার সূয্যি যখন পশ্চিমে হেলে পড়েছে, তখন সে দেখা পেলো বুনো মোষের। ছায়ার মতো কালো কালো একদল মোষ চরছে বনের মধ্যে এদিক-ওদিক। বিম্বু পিছিয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে। পিছিয়ে গিয়ে গুঁড়ি মেরে গাছপালার আড়াল দিয়ে সন্তর্পণে চলে গেল অন্য দিকে। বাতাস কোন্ দিকে বইছে দেখে নিলো। বুঝলো, যেদিক থেকে বইছে তার বিপরীত দিকেই সে এসে উপস্থিত হয়েছে। একটু নিশ্চিন্ত হলো

বিম্বু। বুনো মোষগুলোর ঘ্রাণশক্তি ভয়ানক তীব্র। যদি বাতাস তার গায়ের গন্ধ বয়ে নিয়ে ওদের নাসিকায় পৌঁছে দেয়, অমনি ওরা তৃণ থেকে মুখ তুলে তাকাবে, ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলবে, সামনের পা দুটো দিয়ে মাটি আঁচড়াতে থাকবে, আর তীক্ষ্ণ শিং বাঁকা করে ধরে বোঝবার চেষ্টা করতে থাকবে কোন্ দিক থেকে শত্রুর গায়ের গন্ধ আসছে ভেসে।

ভয়ংকর কঠিন কাজ এই বুনো মোষ ধরা। এবং তার থেকেও কঠিন কাজ হচ্ছে বুনো মোষের দুধ দুইয়ে আনা। টোডাদের এ বিষয়ে বিশেষ সুনাম আছে, তাও সব টোডা পারে না। যে দুজন পারত তাদের মধ্যে একজন মরে গেছে, বাকী আছে বিম্বু।

বিম্বু জন্তুর মতো উবু হওয়া অবস্থায় আরও পিছন দিকে হটে গেল। সব থেকে পিছিয়ে থাকা মোষদের মধ্যে যেটিকে সুবিধাজনক মনে হলো তার ঠিক পিছনে সমান্তরালভাবে বসে রইলো। একটা বাছুর তার মায়ের কাছে ঘুরঘুর করছে, মা তাকে পা দিয়ে যতো ঠেলে দেয় তত সে কাছে এগিয়ে যায়। এমনি করতে করতে বাছুরটা অবশেষে মাতৃস্তন্যে মুখ দিতে পারলো। আর ঠিক সঙ্গে সঙ্গে বাঘের মতো ক্ষিপ্র পায়ে এগিয়ে গেল বিম্বু। আশ্চর্য কৌশলে বাছুরের মুখটা সরিয়ে দুই হাতে তাড়াতাড়ি বাঁশের চোঙার মধ্যে দুইতে লাগল দুধ। বাছুরটা ডেকে উঠলো, আর আশ্চর্য, অনুরূপভাবে বিম্বুও মুখে শব্দ করতে লাগলো। মা বুঝলো, তার বাছুরের কাছে আরেকটা বাছুর এসেছে হয়তো। তবে তার বাছুরটিই স্তন্যপান করছে, বাইরের বাছুরটি কাছে দাঁড়িয়ে হতাশ হয়ে ডাকছে শুধু।

মাত্র কয়েক মিনিট। অসীম দুঃসাহসে বিম্বু বাঁশের চোঙাটা দুধে পূর্ণ করে তাড়াতাড়ি পিছনে হটে গেল হামাগুড়ির ভঙ্গিতে। তার পরের কাজ তত আর কঠিন নয়। সাড়াশব্দ না করে, গাছের ঝরাপাতায় মর্মর না তুলে অন্য দিকে সরে যাওয়া। তারপরে শুধু

লক্ষ্য রাখা বাতাসের গতি-প্রকৃতির দিকে, যেন তার শরীরটাকে ছুঁয়ে বাতাস না পৌঁছয় গিয়ে ওদের নাকে।

এবার আর আগের পথে নয়, অন্য দিক দিয়ে পাহাড়ে ওঠবার চেষ্টা করতে লাগলো বিম্বু। বনের এদিকটা বড়ো নির্জন, একটা পাখীর ডাকও শোনা যায় না, এখানে জন্তুজানোয়ার দিনের বেলায় পর্যন্ত নিশ্চিন্তে ঘুরে বেড়ায় বলে শোনা গেছে। ইরুলাদের কাছ থেকে পাওয়া ছোট একটা লোহার ডাণ্ডা আছে তার, যেটি সে মহার্ঘ সম্পদের মতো নিজের কাছে-কাছে রাখে। তার সেই যে তীরের ফলাটা নিয়ে পিলু খেলা করতো, সেটা আর আছে কি নেই, মনে পড়ছে না। কিন্তু তার ঘরের ভিতরে একটা কোণায় ঘিয়ের হাঁড়িকুড়ির আড়ালে সেই লোহার ডাণ্ডাটা যত্নেই রাখা আছে। সেটি মনের ভুলে তাড়াতাড়িতে সঙ্গে আনা হয়নি। আনলে ভালো হতো, সামনে কোনো জানোয়ার পড়লে, অন্ততঃ কিছুটা আত্মরক্ষা করতে পারতো সে।

গায়ের চাদরটা কোমরে শক্ত করে বেঁধে, এক হাতে দুধ-ভরতি চোঙাটা নিয়ে জঙ্গলের মধ্য দিয়ে সন্তর্পণে অগ্রসর হতে লাগলো বিম্বু। কোথায় কোন্ গাছে পোকামাকড়জাতীয় কোনো জীব কটর কটর করে ডেকে চলেছে ক্রমাগত। তাদের পুট্‌কলী যারা তৈরি করে, অনেক দূর হেঁটে, নীচে নেমে তাদের গাঁয়ে একবার গিয়েছিল বিম্বু। তারা ঠক্ ঠক্ ঠকাস্ করে কী এক হাতে-চালানো যন্তর দিয়ে তাদের পুট্‌কলী তৈরি করছিল—এখন, এই মুহূর্তে বনের মধ্য দিয়ে চলতে চলতে, পোকামাকড়ের কটর কটর শুনতে শুনতে, সেই যন্তরের শব্দটা হঠাৎ মনে পড়ে গেল বিম্বুর। খুব যে মিল আছে এমন নয়, তবু একটা শব্দ আরেকটাকে মনে পড়িয়ে দেয়।

একটা হাওয়া উঠলো কিছুক্ষণ পরে। শুকনো পাতা উড়তে লাগলো, ধুলো উঠতে লাগলো। বিম্বু মাথার ওপরে সূর্যের অবস্থান দেখে দিক নির্ণয় করতে লাগলো। তারপরে একটা কোণ ধরে এগিয়ে যেতে লাগলো ক্রমাগত।

অবশেষে পাহাড় এলো একসময়। খাঁজে খাঁজে পা দিয়ে কোনরকমে উঠতে লাগলো বিশ্বু। লম্বা লম্বা শরের ঝোপ ছড়িয়ে আছে এদিক-ওদিক। সেই ঝোপের শক্ত ঝুঁটি ধরে ধরে আস্তে আস্তে ওপরে চলে এলো সে। আবার সেই তাদের উপত্যকা, সেই তাদের ঢেউখেলানো তৃণভূমি, সেই ঝাউগাছের দল, আর সেই ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা হাওয়া।

একটু বসে, একটু জিরিয়ে, কোমরের চাদরটা খুলে গায়ে দিয়ে, বাঁশের চোঙাটা নিয়ে আবার চলা শুরু করেছিলো বিশ্বু। চোঙা থেকে কিছুটা দুধ চলকে পড়ে গেছে, কিন্তু তাহলেও যেটুকু আছে তাতে ফোরির চলে যাবে। ঘন টাটকা দুধ, চালের সঙ্গে সেদ্ধ করে খেলে দু'বেলার খাবার হয়ে যাবে ফোরির।

কিন্তু কোথায় সে? তার মোষ দুটো আর বাছুরগুলো আপনমনে চরছে, ধারে কাছে পাগলা ফোরি নেই। আশ্চর্য, গেল কোথায় লোকটা!

ডেকে ডেকে সাড়া নেবার অভ্যাস টোডাদের নেই। খুব একটা সাংঘাতিক ব্যাপার না হলে একজন আর একজনকে চীৎকার করে ডাকে না। বিশ্বু তাই ছুটতে লাগলো গ্রামের দিকে। ওর ঘরের দিকে নয়, ওর ঘরের বিপরীত দিকে বরং বলা যায়।

গ্রামের পথে যেতে যেতে একসময় আবার বাঁদিকে বাঁক নিলো বিশ্বু। সিরুভবানী নদীর দিকে যেতে যে রাস্তা পড়ে, সেই পথচিহ্ন ধরে ধরে কিছুটা অগ্রসর হলো, তারপরে আবার সেটা ছেড়ে দিয়ে ডানদিকে বেঁকলো। একটু উঁচুতে উঠতে হলো। বুড়ো কয়েকটা ঝাউগাছ ঘন হয়ে জটলা করছে এক জায়গায়। বিশ্বু মনে মনে জানতো এখানেই পাওয়া সম্ভব পাগল ফোরিকে। দিনের অধিকাংশ সময় এখানেই কাটায় পাগল ফোরি। মাথা ওর ঠিক নেই, বড়ো বড়ো গাছ কয়েকটা বেছে নিয়েছে, তার গুঁড়ির কোনোটাতে সমান্তরাল দাগ কেটেছে প্রচুর, কোনোটাতে লম্বালম্বি। যে টোডারা

পৃথিবীতে এলো, একটাতে তাদের হিসাব, আরেকটাতে অন্য হিসাব, যারা গেল তাদের জন্য।

একটা গাছের নীচে শুয়ে ঘুমোচ্ছিল ফোরি, বিস্থু গিয়ে তুললো তাকে। চোখ দুটো লাল, ফোরি উঠে বসে অবাক হয়ে দেখতে লাগলো।

বিস্থু ওর পাগলামি জানে, তাই আর কিছু না বলে ওর দিকে এগিয়ে দিলো দুধের চোঙাটা, বললে—এই নে দুধ। ঘরে গিয়ে খাবার তৈরি করে খা।

ধীরে ধীরে ঠোঁটের কোণে হাসির রেখা জেগে উঠেছিল পাগল ফোরির, বলেছিলো—খেয়েছি।

—কখন?

—অনেকক্ষণ।

—কে দিলো?

—বিস্থু।

না, কথাটায় অবাক হলো না বিস্থু। ফোরি যা চায় অথচ পায় না, তা সঙ্গে সঙ্গে কল্পনা করে নেয় যে সে পেয়েছে। ক্ষিদে পেয়েছিলো, দেখা হলো বিস্থুর সঙ্গে, অমনি বললে—দুধ দিবি একটু?

বিস্থু বললে—বোস। আনছি।

কিন্তু বিস্থুর দেরী দেখে আর অস্থিরতা নেই। কল্পনা করে নিলো বিস্থু এসে ওর চোঙাটা ভরতি করে দুধ দিয়ে গেছে, সেই দুধ দিয়ে চাল রান্না করে পেট ভরে ও খেয়েও নিয়েছে।

বিস্থু ওর মাথাটা ধরে ঝাঁকি দিলো, বললে—না। তুই খাসনি, বিস্থু আসেওনি। বিস্থু এই এলো, তোকে দুধের চোঙাটা দিলো। বুঝলি? এবার ঘরে যা।

ফোরি চোঙাটা হাতে নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে লাগলো। তারপরে বললে—দুধ?

—হ্যাঁ।

—তুই এনে দিলি ?

—হ্যাঁ।

ফোরি এবার খুশী হয়ে হেসে উঠলো, বললে—ঠিক আছে, আবার খাবো।

বিষ্ণু বললে—এখানে এসে বসে আছিস কেন ? তোকে না মোষ দেখতে বলে গিয়েছিলাম ?

ফোরি বললে—গাঁয়ে একটা ঘরে 'ওঁয়া-ওঁয়া' আওয়াজ। দেখতে গেলাম। গেন্না বলে একটা মেয়ে আছে না ? তার মেয়ে হয়েছে। প্রথম সন্তান। তাই এখানে এসে একটা দাগ বাড়িয়ে দিলাম। একটা টোড়া বাড়লো।

গেন্নাকে চেনে বিষ্ণু। লাজুক-লাজুক অল্পবয়সী শান্ত মেয়েটি। বললে—তার যে ছেলেপিলে হবে জানতুম না ত !

ফোরির মুখখানা মুহূর্তে বিষণ্ণ হয়ে গেল, বললে—তবে, দাগটা দিলেই বা কী হবে ? অন্য গাছেও অন্য একটা দাগ দিতে হবে। ওকে ত দেবতার কাছে দিয়ে আসতে হবে। মেয়ে সন্তান, তা-ও প্রথম।

চমকে উঠলো বিষ্ণু। সঙ্গে সঙ্গে পিলুবাণীর কথা মনে পড়ে গেল। ফোরির হিসাবে পিলুবাণী মরে গেছে। এই পিলুবাণীও ত দেবতার কাছে বলি হতো যদি না টুরা অমন করে পালিয়ে যেতো তাকে নিয়ে ! কিন্তু গেন্না কি সেটা পারবে টুরার মতো ?

ভাবতে ভাবতে অন্যমনে নিজের ঘরের দিকে এগিয়ে আসছিলো বিষ্ণু। অনেকদূর এসে থমকে দাঁড়ালো। মনে হলো স্বপ্নের জগৎ থেকে বাস্তবের কঠিন মাটিতে যেন ডানাভাঙা পাখীর মতো ধপ্ করে এসে পড়ে গেছে সে !

আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখলো, বেলা পড়ে এসেছে। এখন আর পিলুবাণী টুরা এদের কথা তার ভাবলে চলবে না। সে হনহন করে এগিয়ে গেল মাঠের দিকে। মাঠ থেকে মোষগুলোকে তাড়িয়ে

নিয়ে ফিরে আসতে লাগলো তাড়াতাড়ি। কিন্তু, তবু কি মনটাকে নিয়ে পারবার জো আছে? ঘুরে ফিরে দুটো নাম নিয়ে সে বার বার চিন্তার জাল রচনা করতে লাগলো—পিলুবাণী আর টুরা।

গোয়ালে মোষ আর বাছুরগুলোকে রেখে সে বাইরে এলো। সূর্য তখন পশ্চিম পাহাড়ের আড়ালে চলে গেছে। আকাশের কোণে আরক্তিম বর্ণালী। অভ্যাসবশে সেই দিকে মুখ ফিরিয়ে চোখ বুজে মনে মনে প্রণাম জানিয়ে মুখটা সে ফিরিয়েছে, এমন সময়—

এমন সময় মনে হলো মুহূর্তে সব আলো নিভে গেল, মুহূর্তে তার মাথার ওপরে পাহাড়ের চূড়াটা যেন ভেঙে পড়লো, তীব্র যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে সে লুটিয়ে পড়লো তার নিজেরই ঘরের দাওয়ার সামনে। তারপরে আরও মনে হলো, যেখানে সে পড়েছে সেখানকার ঘাস ভিজে, ঘাসে যেন অনেক বারিসিঞ্চন করেছে কেউ।

ঐ অবস্থায় দু'হাতে ভর দিয়ে মাথাটা তোলবার চেষ্টা করলো বিষ্ণু। আকাশ নয়, ঘরের দরজা নয়, তার মুখের সামনে ভেসে উঠলো আরেকখানা মুখ। এলোমেলো মাথার চুল, চোখ দুটি বিস্ফারিত, বন্য জন্তুর মতো নাসারন্ধ্র কাঁপছে, কাঁধ আর বুক থেকে চাদর খসে গেছে, কিন্তু নারী হয়েও সেদিকে তার ভ্রূক্ষেপ নেই। দাঁতে দাঁত চেপে হিংস্র ভঙ্গিতে তার দিকে তাকিয়ে আছে, হাতে শক্ত করে ধরা তার সেই অতি যত্নের লোহার ডাণ্ডাটা।

তার মুখের কাছে মুখ এনে উন্মাদিনী বলতে লাগলো—আমার মেয়ে কই?

মাথাটা যন্ত্রণায় ছিঁড়ে পড়ছে, বিষ্ণু মুখ ফিরিয়ে ভিজে ঘাসের দিকে তাকাতে গিয়েই দেখতে পেলো টপটপ করে লাল তাজা রক্ত পড়ছে সেই ঘাসের ওপরে। জল নয়, রক্ত। সঙ্গে সঙ্গে জ্যা-মুক্ত তীরের মতো উঠে দাঁড়ালো বিষ্ণু, বললে—মারলি! তুই আমাকে মারলি!

উন্মাদিনী নারী তার হাতের লোহার ডাণ্ডাটা আন্দোলিত করে বলে উঠলো—কোথায় আমার মেয়ে! তাকে তুই বাদাগাদের কাছে বিক্রী করে দিয়েছিস?

মাথার ক্ষতস্থানটায় হাত দিয়ে চেপে ধরলো বিষ্ণু, বললে—বেশ করেছি। তুই বলবার কে?

—আমি ওর মা।

গর্জে উঠলো বিষ্ণু—মিথ্যে কথা। তুই ওর মা নোস, তুই ওকে জন্ম দিসনি, তুই রাক্ষুসী, তুই ডাইনী, নইলে ঐটুকু মেয়েকে ছেড়ে তুই পালিয়ে চলে যেতে পারিস!

লোহার ডাণ্ডা ফেলে দিয়ে ছুটে এসে ঝাঁপিয়ে পড়লো টুরা বিষ্ণুর বুকের ওপর। কিল-চড়-ঘুষিতে ওকে বিপর্যস্ত করে তুললো মুহূর্তে, তারপর হুহু-করা কান্নায় ভেঙে পড়লো সে, দু'হাতে মুখ ঢেকে বলতে লাগলো—এ তুই কী করলি বিষ্ণু, এ তুই কী করলি!

নিজেকে সামলাতে বেশ কিছুটা সময় লাগলো বিষ্ণুর। কিছু ঘাস তুলে চিবিয়ে নিয়ে মাথার ক্ষতস্থানে চেপে ধরে কাপড় দিয়ে জোর করে বাঁধন দিলো বিষ্ণু। তারপরে একটু দম নিয়ে, একটু জিরিয়ে, ভিতরে গেল।

আমাদের প্রদীপ বা পিদ্দিমের মতো একটা বস্তু আছে ওদের, চকমকি ঠুকে সেটা জ্বালিয়ে দিয়ে ঢকঢক করে খানিকটা জল খেলো, তারপর এলো বাইরে।

বাইরে অন্ধকার হয়ে এসেছে। নিথর একটা পাথরের মূর্তির মতো বসে আছে টুরা, ও কাছে আসতেই যেন তার চমক ভাঙলো। তারপরে আশ্চর্য শান্ত কণ্ঠে বলে উঠলো—আমার সঙ্গে তুই যাবি বিষ্ণু?

—কোথায়?

টুরার ঊর্ধ্বাঙ্গ সম্পূর্ণ নিরাবরণ। বেশ ঠাণ্ডা হাওয়াও দিচ্ছে। মাটিতে পড়ে-থাকা চাদরটা তুলে নিয়ে গায়ে দেবে এমন হুঁশটাও বুঝি ওর নেই। মুখ ফিরিয়ে বললে—নীচে বাদাগাদের গাঁয়ে।

চুপ করে রইলো বিস্মু, বললে—পুটুকলীটা গায়ে তুলে নে।

অলস ভঙ্গিতে পুটুকলীটা কাছে টেনে নিলো টুরা, কিন্তু গায়ে দিলো না। বললে—এটা ছিঁড়ে গেছে।

বলে সেটা ওর সামনে মেলে ধরলো। মোটা শক্ত ওদের চাদরগুলো, অনেকটা নরম কম্বলের মতো, সেটা দু'তিন জায়গায় বড়ো বড়ো ফালি দিয়ে ছিঁড়ে যাওয়া। যেন হিংস্র ভালুক এসে ওটা চরম আক্রোশে ছিন্নভিন্ন করে দিয়ে গেছে।

—কবে ছিঁড়লো ?

বুকের ওপর ওটা আলগোছে ফেলে দিয়ে টুরা উঠে দাঁড়ালো, বললে—আজ।

—কী করে ?

ওর মুখের দিকে তাকালো টুরা, বললে—আমার স্বামী রাগে এটাকে টুকরো টুকরো করে দিয়েছে।

—রাগ কেন ?

সে কথার উত্তর না দিয়ে ওর মাথায় হাত রাখলো টুরা, বললে—বেশী কাটেনি, কী বল ? রক্ত বন্ধ হয়েছে ত ?

—হয়েছে।

টুরার বড়ো বড়ো চোখ দুটি হঠাৎ ভরে এলো জলে, বললে—মেয়েটা চীৎকার করে কাঁদছিল, তোর কানে কি তা যায়নি ? কেমন করে মুখ ফিরিয়ে ছিলি বল দেখি ?

ওর হাতটা তার মাথা থেকে কাঁধের ওপর এসে মৃদুভাবে ছুঁয়ে ছিল, সেটা সরিয়ে দিয়ে বিস্মু বলে উঠলো—কথাটা তুই জিজ্ঞাসা করবি, না, আমি করবো ? আজ মেয়ে-মেয়ে করে এসে কাঁদছিস, কোথায় ছিল তোর এই কান্না যখন তুই ওকে ফেলে পালিয়ে গেলি ?

টুরার মুখখানা শক্ত হয়ে গেল। একটুক্ষণ থেমে থেকে তারপরে বললে—আমাদের টোডা জাতের মধ্যে এটা কি খুব একটা অদ্ভুত ঘটনা ? মেয়ে পাঁচ বছরের হবার আগেই ত ম্যাট্‌সুনি হয়ে যায়।

বিষ্ণু বললে—তা হয়ে যায়, কিন্তু তা বলে তখ্‌খুনি কি আর বরের বাড়ি চলে যায় !

টুরা উত্তর দিলে—যায় বইকি। দু'তিন বছরের মেয়ে যায় না, কিন্তু পাঁচ বছরের মেয়ে খুবই যায়। তখন কী করে মেয়ের মা? মনের দুঃখ মনেই চেপে রাখে না কী? তারপরে কালে কালে একদিন সব সয়ে আসে।

বিষ্ণু একটু অসহিষ্ণু কণ্ঠেই এবার প্রশ্ন করে—তা বলে তুই?

টুরা অবাক হয়ে বলে—কেন? আমি কি টোডা জাত থেকে আলাদা?

বিষ্ণু ওর চোখের দিকে তাকিয়ে কী যেন বোঝবার চেষ্টা করে, একটুক্ষণ থেমে থেকে তারপর বলে—জাত থেকে আলাদা না হলেও মেয়ে হিসাবে আলাদা বইকি। তুই স্বামীর ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়লি, সুঞ্জা তোকে ঘর দিতে চাইলো, গেলি না। এলি কিনা আমার কাছে। আমার কাছ থেকে ফিরে গেলি আবার স্বামীর ঘরে। আমাদের জাতের মধ্যে অবশ্য এটা আছে, কেউ কিছু মনে করে না। কিন্তু, নিজের মেয়েটাকে যেভাবে তুই বাঁচালি, সেটা দেখলে তোকে আলাদা ধরনের মেয়ে ছাড়া আর কী ভাববে লোকে !

টুরা অস্ফুটকণ্ঠে বললে—মাত্র সেজন্যই আমি আলাদা? আর কিছুর জন্য নয়?

ওর চোখের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে বিষ্ণু হঠাৎ বলে ওঠে—হ্যাঁ, আর একটা কারণ আছে।

—কী?

বিষ্ণু বললে—তুই সুন্দর।

একটু লজ্জা পায় বোধ হয় কথাটায়, মুখখানা চট করে নামিয়ে নেয়। তারপরে এসব প্রসঙ্গের ওপরে যবনিকা টেনে দেয় যেন জোর করে। বলে—ঘরে ঢোক। মশালটা ধরা।

—কেন?

—অন্ধকার হয়ে গেল না!

—তা গেল।

—তবে? বাদাগাদের গাঁ কি কাছে?—বলেই একটু থামলো সে, তারপরে কান্নাভেজা কণ্ঠে পুনর্বার বলে উঠলো—কেঁদে কেঁদে মেয়েটা হয়ত হাত-পা এলিয়ে নিস্তেজ হয়ে শুয়ে পড়ে আছে।

কী ভেবে বিম্বু আর দ্বিরুক্তি করলো না। ঘরের ভিতরে গেল, মশালটা জ্বাললো, ধুতির খুঁটে দশটা সিক্কা টাকা বাঁধা ছিল, সেটা ঠিক আছে কি না দেখে নিয়ে জ্বলন্ত মশাল নিয়ে বাইরে এলো।

মশালের লালচে আলোয় অদ্ভুত দেখাচ্ছে বিম্বুর মুখ। সেদিক থেকে জোর করে মুখ ফিরিয়ে নিলো টুরা। বিম্বু বললে—মেয়েকে নিয়ে আসবি ত?

—হ্যাঁ।

—নিজের কাছে নিয়ে গিয়ে রাখবি ত?

টুরা কোনো উত্তর করলো না, পাশাপাশি চলতে লাগলো ওর।

—কী, কথা বলছিস না যে!

টুরা বললে—মেয়েকে ত আগে নিয়ে আসি।

বিম্বু বললে—দশটি সিক্কা টাকা লাগবে, তা জানিস?

চলতে চলতে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো টুরা, ভ্রূ দুটি বাঁকা করে তির্যক্ ভঙ্গিতে ওর দিকে মুখ ফিরিয়ে তাকালো, তারপরে বললে—সত্যি সত্যিই বিক্রী করেছিস?

—হ্যাঁ।

—দশ সিক্কায় বুঝি?

—হ্যাঁ।

টুরা বললে—তাহলে তোর মাথায় লোহার ডাণ্ডা মেরে অন্যায় কিছু করিনি। তুই চামার।

দাঁড়িয়ে পড়লো বিম্বু, বললে—কী বললি?

টুরা বললে—তুই চামার, তুই কসাই, তুই ডাকাত, তুই

বদমাইশ! আমার মেয়েকে তোর হাতে দিয়েছি বলে তুই তাকে বিক্রী করিস কোন্ সাহসে?

বিন্মু রেগে ওঠে, বলে—বেশ করেছি। লজ্জা করে না তোর এ-কথা বলতে?

টুরা এবার চলা শুরু করে। চলতে চলতে উত্তর দেয়—না, লজ্জা করে না। কিন্তু টাকাটা সঙ্গে নিয়েছিস ত?

বিন্মু বলে—যদি বলি না?

টুরা বলে—সে সব বুঝি না। মেয়েকে আমার চাই-ই। না হলে তোকেও মারবো, নিজেও মরবো। মনে রাখিস।

বিন্মু কী মনে করে অল্প একটু হেসে উঠলো, বললে—তা তুই পারিস। যে ভাবে লোহার ডাণ্ডা মেরেছিস আমার মাথায়!

টুরা আর কিছু বলে না, চুপচাপ চলতে থাকে ওর পাশাপাশি।

মশাল হাতে নিয়ে আদিমকালের দুটি নরনারী যেন পথ দিয়ে চলেছে, সে পথ কোথাও উঁচু কোথাও নীচু—এমনি ঢেউখেলানো ভাবে যেতে যেতে একসময় ঢালু হয়ে সোজা নীচে নেমে গেছে। এখানে দুপাশে সব বড়ো বড়ো গাছ, বড়ো বড়ো সিঁড়ির মতো ধাপে ধাপে নেমেছে সব চষা ক্ষেত। ওদের দেখে মনে হচ্ছিল যেন দুটি গুহা মানব-মানবী গুহা ছেড়ে সভ্যতার সীমান্তে এসে পদক্ষেপ করলো। বনস্পতির শিরে একটি পেচকজাতীয় পাখী ডেকে উঠলো, দূর থেকে আর একটি পেচক বুঝি তার উত্তর দিলো। মনে হলো ওরা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করলো বুঝি এদেরই কথা—পাহাড়ী মানুষ, হুঁশিয়ার!

নীরবতা ভঙ্গ করলো বিন্মুই প্রথমে। বললে—আমি যে কতদূর ছোট হয়ে গেলাম তা জানিস? বাদাগারা কী মনে করবে! জিনিস দিয়ে আবার ফিরিয়ে নিচ্ছে কিনা টোডারা! ছিঃ!

টুরা বললে—কী বললি! ছোট হয়ে গেলি, না? তুই কি

নিজেকে খুব বড়ো মনে করিস নাকি? চামার কোথাকার! মানুষ বিক্রী করেছিস, মুখ নেড়ে কথা বলতে তোর লজ্জা করছে না!

বিষ্ণু চট্ করে ফিরে দাঁড়ালো ওর মুখোমুখি। মশালটা ওর মুখের কাছে ধরে কী যেন দেখতে লাগলো নিবিষ্টচিত্তে।

টুরা একটু বুঝি ভয় পেলো। অস্ফুটকণ্ঠে বলে উঠলো—কী, দেখছিস কী?

বিষ্ণু গম্ভীরকণ্ঠে বললে—তোর স্বামী তোর চাদর ছিঁড়ে দিয়েছিল কেন বল তো? অতো রাগ কিসের তার?

চোখের কোণে জল এসে পড়লো টুরার, কোনক্রমে সামলে নিয়ে বলে উঠলো—সে আর শুনে তুই কী করবি?

বাঁহাতে মশালটা নিয়ে, ডানহাতটা দিয়ে টুরার একটা হাত শক্ত করে ধরলো বিষ্ণু, একটু ঝাঁকি দিলো, বললে—দরকার আছে।

হাতটা ছাড়াবার বৃথা চেষ্টা করতে করতে টুরা বললে—না, কোনো দরকার নেই। হাত ছাড়্। লাগছে।

বিষ্ণু আরও শক্ত করে ধরলো ওর হাত, বললে—আমি যে চামার, অতো সহজেই কি ছাড়ি!

—কী করবি তুই?

চোখ দুটি থেকে যেন আগুন ঠিকরে বেরুচ্ছে। বিষ্ণু বললে—তোর ছেঁড়া পুটকলীটা কেড়ে নেবো, মশালটা নিভিয়ে দেবো, আর তারপরে—

অস্ফুট একটা চীৎকার করে ওঠে টুরা। বিষ্ণু বললে—চীৎকার করলে কিছু হবে না। এ হচ্ছে বাদাগাদের এলাকা, এখানে টোডাদের জাতের মধ্যে কী হচ্ছে না হচ্ছে ওরা দেখতেও আসবে না।

এতক্ষণে সমস্ত দৃপ্ত ভঙ্গি ওর শিথিল হয়ে আসে, ভীরু পাখীর মতোই কাঁপতে থাকে টুরা, আর্ত কণ্ঠস্বরে বলতে থাকে—আমাকে ছেড়ে দে বিষ্ণু, তোর দুটি পায়ে পড়ি—

সত্যিসত্যিই ওর পুটকলীতে টান দেয় বিষ্ণু, জোর করে ওর দেহ

থেকে ছাড়িয়ে সেটা ফেলে দেয় পথের ওপরে। দুটি হাতে তাড়াতাড়ি টুরা ঢেকে ফেলে তার বুক। বিষ্ণু আদিম গুহামানবের মতোই ক্ষিপ্র পায়ে গিয়ে পড়ে ওর ওপর। টুরা বসে পড়ে পথের ওপর ঐভাবে দুই হাতে বুক ঢেকে, ব্যাকুল হয়ে বলতে থাকে—ওরে, আমাকে ছেড়ে দে—আমি মা!

অসীম ঘৃণায় ওর দেহে পা দিয়ে একটা ধাক্কা দেয় বিষ্ণু, বলে—ঘেন্না বলে বস্তু আমার শরীরেও আছে। তোকে সত্যিসত্যিই ছুঁতাম না, একটু লাঞ্ছনা করাই আমার উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু, তুই বলছিস, তুই মা!

থু-থু করে মুখ ফিরিয়ে শব্দ করে থুথু ফেললো বিষ্ণু, বললো—মা হলে মেয়েকে ছেড়ে স্বামীর বুকে গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়িস!

ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ায় টুরা, বলে—আমার চাদরটা দে শীগগির!

—না।—বিষ্ণু জোর গলায় বলে ওঠে—ছেঁড়া চাদর পরে তুই রাখালের দরজায় গিয়ে দাঁড়াবি, তা হবে না। আমি টোডাদের ছেলে হয়ে টোডা মেয়ের হীনতা সহ্য করতে পারবো না। এই নে তুই আমার পুট্‌কলী। বলে, নিজের গায়ের ভালো কম্বলটা ওর গায়ের ওপরে ছুঁড়ে ফেলে বিষ্ণু। নিজে উঠিয়ে নেয় টুরার ছেঁড়া কম্বলটা। তারপরে বলে—চল এবার।

বেশ করে নিজেকে ঢেকে নেয় টুরা, একটু দম নিয়ে তারপরে বলে—আমার স্বামীর ব্যাপারে তোর খুব হিংসে আছে মনে মনে। কেন আছে বল দেখি?

—বাজে কথা। কোন হিংসে নেই।

টুরা বলে—জানি, কথাটা স্বীকার করবি না। আমার ওপরে তোর যে সত্যিসত্যি ঘেন্না নেই এটা স্বীকার করবি ত?

বিষ্ণু বলে—কেন করবো? তোর ওপরে ঘেন্না আছে, রাগ আছে, আবার অন্য একটা জিনিসও আছে।

টুরা গম্ভীরকণ্ঠে বলে—সেই অন্য জিনিসটি তোকে ছাড়তে হবে।

থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে বিষ্ণু, সবিস্ময়ে বলে ওঠে—মানে ?

টুরা বলে—আমার স্বামীর রাগ পুরোপুরি তোর ওপর। তুই তাকে যতটা হিংসে করিস, তার থেকে ঢের ঢের বেশী হিংসে করে সে তোকে। আমি কি সাধে মেয়েকে তোর কাছে রেখে পালিয়ে গেলাম! তোর ঘরে যখন থাকতাম তখন আমার স্বামীকে প্রায়ই দেখতাম টিলার ওপরে দাঁড়িয়ে থাকতে। সে চোখে এমন একটা কিছু থাকতো যাতে মায়া হতো। কিন্তু তার থেকেও মারাত্মক জিনিস তার ছিল। একদিন হাত তুলে দেখালো চকচকে একটা লম্বা জিনিস। বললে সাদা মানুষদের কাছ থেকে যোগাড় করে এনেছে। এক কোপে মানুষ তো কোন্ ছার মোষ পর্যন্ত কাটা যায়, এমনি ধারালো।

—বটে !

টুরা বললে—আমি ভয় পেয়ে গেলাম। একদিন এগিয়ে গেলাম কাছে। বললাম, কী চাও ? উত্তরে সে কী বলেছিল জানিস ? বলেছিল, বাচ্চাটাকে কেটে ফেলবো। শিউরে উঠেছিলাম। সে বলেছিল, টোডাদের মধ্যে মানুষ খুন করার রীতি নেই, কিন্তু সমাজের চোখে যে মরে গেছে, তাকে মারলে কোন দোষ নেই, রাজা কিছুই বলবে না। কেঁদে বলেছিলাম, মারবে কেন ওকে ? তুমি বাপ না ? রেগে বলেছিল, ও দেবতার জিনিস। ওকে বাঁচিয়ে রেখেছিস বলে আজ সাদা মানুষগুলো পাহাড়ে এসে আমাদের রাজাকে তাড়িয়ে ঘরবাড়ি দখল করে বসলো। এর পর আরো কী ঘটবে কে জানে! আমি বলেছিলাম, আমি ওসব মানি না। সে বললে, আমি মানি। আমার ভয় হলো। মেয়েকে চোখে-চোখে রাখতে লাগলাম। কী জানি, কখন কী করে বসে কে জানে! ওসব লোককে বিশ্বাস নেই। তবুও কি স্থির থাকা যায়! আরেকদিন কাছে গেলাম। বললাম, মেয়ের পাঁচ বছর বয়স হলো। ওকে মেরো না। উত্তরে বললে কী জানিস ? বললে, বিষ্ণুর ঘর ছেড়ে যদি আমার ঘরে ফিরে আসিস,

তাহলে কথা দিচ্ছি, মেয়েকে কিচ্ছু করবো না। কেঁদে বলেছিলাম, না, বিষ্টুর ঘর ছেড়ে যাবো না। সে বললে, বিষ্টু তোর যে ভালোবাসার লোক তা আমি জানি। দরকার হলে জঙ্গলে গিয়ে একদিন লুকিয়ে ওকেও খতম করে আসবো। একটু সামলে নিয়ে বলেছিলাম, আর আমাকে যদি পাও? একটু হেসে বলেছিল, তাহলে আর কোনো কথাই ওঠে না। হাতের ধারালো অস্তরটা ঘরের কোণে যেমন পড়ে থাকে তেমনি থাকবে। বিষ্টু, তারপর থেকে আমার দিনরাতের চিন্তা হয়ে দাঁড়ালো, আমি কী করবো? যাবো, কি যাবো না? শেষ পর্যন্ত গেলাম। ভাবলাম, এতে যদি শান্তি হয় ত হোক। এতে যদি আমার মেয়ে বাঁচে ত বাঁচুক। এতে যদি বিষ্টু—

বিষ্টু হতবাক হয়ে কথাগুলো শুনছিল, এতক্ষণে বাধা দিয়ে বলে উঠলো, থাক থাক, বিষ্টুর কথা থাক। অন্য আর কী ঘটনা হলো তাই বল। রাগ করে তোর চাদরটা এমনভাবে ছিঁড়ে দিলো কেন?

টুরা বললে—মেয়ের কাছে ছুটে আসবারও আমার অধিকার নেই। বললে, যদি যাস ত চিরকালের মতো চলে যা। তুই আমার আর বউ নোস।

রুদ্ধনিশ্বাসে বিষ্টু বলে ওঠে—উত্তরে তুই কি বললি?

টুরা বললে—বললাম, মেয়েকে নিয়ে তোর ঘরে আমি আসতে চাই না, ওকে বিষ্টুর কাছে ফিরিয়ে দিয়ে আসবো।

—সে কী বললে?

টুরা একটুক্ষণ থেমে থেকে তারপরে বললে—সে বললে, আমি বিশ্বাস করি না তোকে। তুই ছল খুঁজছিস বিষ্টুর কাছে যাবার। আমার আর মাথার ঠিক রইলো না বিষ্টু, আমি রেগে উঠে বললাম, বেশ তাই। আর আসবো না তোর কাছে। বলামাত্র সে কী করলো জানিস? আমার হাতটা চেপে ধরলো শক্ত করে। বললে,

আর তুই রাজার কাছে। রাজার সামনে দাঁড়িয়ে আমাদের বিয়ে যে কাটান গেল সেটা বলে দিই।

[টোডাদের শেষ রাজা পার্থ-কাই, তাঁর সামনে গিয়ে স্বামী-স্ত্রী যদি উচ্চারণ করতো কথাটা, তাহলেই বিবাহ-বিচ্ছেদ হয়ে যেতো। অবশ্য রাজার অনুমতির প্রয়োজন হতো।]

টুরা বলতে থাকে—হাত ধরে হিড়হিড় করে আমাকে টেনে নেয়ে গেল রাজার কাছে। রাজা কিন্তু বাড়ি ছিলেন না, তিনি গেছেন দলবল নিয়ে সাদা মানুষদের মাগে, আমার শ্বশুরও গেছে তাঁর সঙ্গে। তখনো ফেরেননি। স্বামীর রাগ কিন্তু কিছুতেই পড়লো না, সে বিয়ে কাটানোর অন্য ব্যাপারটা করে বসলো। আমার পুটুকলীটা টান দিয়ে খুলে নিয়ে জায়গায় জায়গায় ছিঁড়ে দিলো। বললে, রাজা যখন গাঁয়ে নেই, তখন টিয়েকৃজ্রির শপথ নিয়ে বলছি তুই আর আমার বউ নোস। যা তুই বিষ্ণুর ঘর করতে, আমাকে আর মুখ দেখাস না।

—তারপর ?

টুরার চোখ দুটো ছলছল করে এলো, মশালের আলোয় স্পষ্ট দেখতে পেলো বিষ্ণু, ওর চোখের কোলে মুক্তোর মতো টলমল করছে অশ্রুর বিন্দু। কোনক্রমে সামলে নিয়ে টুরা বললে—বিষ্ণু, আজই বাপের সঙ্গে ঝগড়া করে সে বেরিয়ে এসে অন্য টিলার পাশে ঘর বেঁধেছে। আমাকে নিয়ে সে থাকবে, মোষ যোগাড় করবে, কতো কী কথা ছিল! অথচ মেয়ের জন্য আমার প্রাণটা যখন কেঁদে উঠলো, তখন সে আমার মনটাকে ঠিক বুঝলো না, তোকে সন্দেহ করে, তোকে হিংসে করে একেবারে টিয়েকৃজ্রির শপথ নিয়ে আমার গায়ের চাদর দিলো ছিঁড়ে, বিয়ে কাটিয়ে দিলো।

বিষ্ণু আর কোনো কথা বললো না, মশালটা ঠিক করে ধরে ধীর পায়ে এগিয়ে যেতে লাগলো বাদাগাদের ঘরের দিকে। টুরা

পিছনে পিছনে আসতে আসতে হঠাৎ থেমে গেল, বললে—তোমার ডাণ্ডাটা নিয়ে আসা উচিত ছিল। মেয়েকে যদি না দেয়?

ওর হাতটা ধরলো বিম্বু, বললে—আয় আমার সঙ্গে।

বাদাগাদের গাঁয়ে অনেক খোঁজাখুঁজির পর রাখালের ঘর পাওয়া গেল। গাঁয়ের একেবারে এক ধারে। মদ খেয়ে বেহুঁশ হয়ে পড়ে ছিল খড়ের বিছানায় রাখাল। আর অন্যদিকে কাঁথা-কম্বলের মধ্যে পিলুবাণী—চোখের জল ছুটি গালে স্পষ্ট রেখার সৃষ্টি করে শুকিয়ে আছে, কেঁদে কেঁদে ঘুমিয়ে পড়েছে।

এগিয়ে গিয়ে ছুটি হাতে তাকে তুলে ধরে বুকের ওপরে চেপে ধরলো টুরা। মেয়ে প্রথমটায় হকচকিয়ে গিয়েছিল, আচমকা ঘুম ভেঙে যাওয়ার পর সে যে এভাবে তার মাকে দেখতে পাবে এটা সে স্বপ্নেও ভাবেনি। ছুটি ছোট ছোট হাতে মায়ের গলা জড়িয়ে ধরলো সে প্রথমে, ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদেও উঠলো বুঝি, তারপর হঠাৎ কী হলো, ছুরন্ত অভিমানে হাত-পা ছুঁড়তে লাগলো, কোল থেকে নেমে যাবার চেষ্টা করতে লাগলো, বলতে লাগলো—না না, যাবো না তোর কাছে, যাবো না।

মা যতো তাকে শান্ত করবার প্রয়াস পায়, তত সে অস্থির হয়ে ওঠে।

বিম্বু ওদিকে রাখালের হাতে দশটি সিক্কা টাকা গুণে গুণে দিয়ে দেয়, বলে—নিয়ে চললাম পিলুকে।

ঢুলু ঢুলু চোখ ছুটো তুলে রাখাল বলে—টাকা দিলেই সব মিটে গেল! টোডা জাতের এমন অধঃপতন হয়েছে!

মুহূর্তে গর্জন করে ওঠে বিম্বু—কী বললি!

টলতে টলতে উঠে দাঁড়ালো রাখাল, বলে—ভিন জাতের মেয়েকে এনেছি বলে কতো টাকা আমার গাঁয়ের লোকদের দিতে হয়েছে জানিস? নগদ সাত-সাতটা সিক্কা। সারা গাঁটাকে মদে একেবারে

চুরচুর করে দিয়েছি, সব বেহুঁশ। নইলে তোদের দেখে সবাই ছুটে আসতো।

বিম্বু বলে—জাত তুলে কথা বললি কেন?

রাখাল বলে—নিশ্চয়ই বলবো। টোডাদের কথার দাম সাংঘাতিক। যে-কথা তারা দেয় তার নড়চড় হয় না। তোদের পার্থ-কাই এক কথায় তার বাড়ি-ঘর সাদা মানুষদের ছেড়ে দিয়ে চলে এলো, ফিরে গিয়ে চাইলেও ত পারতো আরেকবার। চাইলো কি? কিন্তু, তুই? আমায় বউ দিয়ে বউ আবার ফিরিয়ে নিয়ে চললি।

টুরা অবাক হয়ে বলে—এই পাঁচ বছরের দুধের মেয়েটা তোর বউ?

—নিশ্চয়ই!—রাখাল বলে—ও ডাগর হলেই আমার বউ হবে। আদরের বউ।

টুরা বললে—টোডা জাতের মেয়ে অন্য কারুর বউ হতে পারে না।

রাখাল উত্তর দিলো—পারে না ত আমার হাতে ওকে তুলে দিলো কী করে বিম্বু? দশটা সিক্কার বদলে?

বিম্বু চীৎকার করে বলে—সেই সিক্কা তোকে ফেরত দিয়েছি, গুণে নে।

রাখাল বলে—নিয়েছি। কিন্তু, কথা? স্বীকার কর যে টোডাদের অধঃপতন হয়েছে। কথা দিয়ে কথা আর তারা রাখছে না?

বিম্বু কথা বলতে পারে না, কথা বলে টুরা। মেয়েটাকে জোর করে বুকে চেপে রেখে বলতে থাকে—কিন্তু, ও কে কথা দেবার? আমি ওর মা, তা জানিস?

রাখাল বলে—বাজে কথা। মা হলে ওকে ফেলে রেখে চলে যাস!

যেন চাবুক এসে পড়ে ওর মুখের ওপর, পাংশু হয়ে যায় মুখখানা,

চোখ বুজে কোনো রকমে বলে—তোদের সঙ্গে সেসব কথা আলোচনা করতে চাই না। টাকা পেয়েছিস, মেয়েকে তুই ফিরে দিবি কি না বল?

রাখাল বললে—সেটি হচ্ছে না, আমার মুখ থেকে কথা বার করতে পারবে না। ওকে নিয়ে যদি যাও ত বুঝবো, বিষ্ণুই কথা খেলাপ করে ওকে জোর করে ধরে নিয়ে গেছে।

বিষ্ণু বলে—বেশ তাই। আমরা চললাম। আয় টুরা।

টুরা তবু যায় না। বলে—বিষ্ণু ত নিয়ে যাচ্ছে না, নিয়ে যাচ্ছি আমি। এর মধ্যে বিষ্ণুর কথা-খেলাপের ব্যাপারটা আসছে কেন?

রাখাল ঠোঁটের কোণে বাঁকা একটু হাসে, বলে—একই কথা। তোর সঙ্গে সঙ্গেই ত বিষ্ণু এসেছে।

টুরা বললে—তা-ও না হয় মানলুম। কী হলে বিষ্ণুকে তুই তার কথা থেকে মুক্তি দিবি বল?

রাখাল টাকাগুলো বিষ্ণুর পায়ের কাছে নামিয়ে রাখে, বলে—টাকা চাই না। মেয়েও নিয়ে যা। কিন্তু একটা কথা দিতে হবে। মেয়ে যেদিন ডাগর হবে, সেদিন ওকে আমার হাতে ফিরিয়ে দিয়ে যেতে হবে।

কথাটায় শুধু অবাকই হয় না টুরা, কিরকম যেন ভয়ার্ত হয়ে ওঠে ও হঠাৎ, তারপরে অস্ফুটকণ্ঠে বলে ওঠে—না, হয় না, তা হয় না।

রাখাল গলায় জোর দিয়ে বলে—কেন হয় না?

টুরা বলে—আমি যে টিয়েকৃষ্ণির নাম নিয়ে বিষ্ণুর সঙ্গে পিলুর ম্যাটৃস্থনি করেছি।

মুহূর্তে সমস্ত নেশার ঘোর যেন ছুটে যায় রাখালের, সবিস্ময়ে বলে ওঠে—তাহলে বিষ্ণুই হয়ে দাঁড়ালো পিলুরাণীর বর!

—হ্যাঁ।

বিষ্ণু বলতে যায়—কী সব যা তা তুই বকছিস টুরা!

—তুই থাম।—চীৎকার করে ওঠে টুরা, বলে—হ্যাঁ। পিলুর বর হলো বিম্বু।

রাখাল বিস্ফারিত চোখে ওদের দিকে তাকায়। সব দেখে শুনে পিলুরাণীও হতবাক হয়ে গেছে। সে আর হাত পা ছুঁড়ে মার কোল থেকে নেমে আসবার প্রয়াস করে না, মায়ের বুকে মাথাটা হেলিয়ে দিয়ে চুপচাপ পড়ে থাকে।

তার মুখ থেকে বিম্বুর মুখের দিকে তাকালো রাখাল, তারপরে আবার টুরার দিকে। দেখতে দেখতে তার ঠোঁটের কোণে ফুটে উঠলো টুকরো হাসি, বললে—টোডা জাতের মধ্যেও এটা দেখা যায় না।

—কী দেখা যায় না? বিম্বু বলে উঠলো।

রাখাল তখনো মিটিমিটি হাসছে, বললে—টোডাদের মধ্যে ভাইরা মিলে এক বউ বিয়ে করে, অভাবে পড়লে টোডারা বউ বাঁধা দিয়েও কর্জ করে, টোডাদের মধ্যে মেয়েদের ব্যাপার-স্যাপার ঠিক আমাদের সমাজের মতো নয়। কিন্তু, তবু বলছি, টোডাদের মধ্যে এটা কখনই দেখা যায় না যে সতীন হয়েছে মা ও মেয়ে।

বিম্বু আর টুরা একসঙ্গে গর্জন করে উঠলো—কী বললি!

রাখাল দু পা পিছিয়ে যায়, বলে—কী রে, মারবি নাকি?

বলতে বলতে হঠাৎ নীচু হয়ে ঘরের কোণ থেকে কাস্তের মতো চকচকে একটা বস্তু বার করে। বলে—মারামারি করবি ত এগিয়ে আয়, আমার হাতেও ধারালো ধান-কাটা অস্তর রয়েছে।

বিম্বু ভয় পাবার মানুষই নয়, দুটি হাত মুষ্টিবদ্ধ করে সে এগিয়ে যায় ওর দিকে, বলে—কিন্তু কথাটা তুই কী বললি?

রাখাল বলে—টুরার খবর রাখি না ভাবিস! আমাদের গাঁয়ের একটা লোক সব জেনে এসেছে। টুরার স্বামী ওকে তাড়িয়ে দিয়েছে। ও এখন তোর কাছেই থাকবে, তাই না?

বিম্বু বলে—হ্যাঁ, থাকবে। তাতে হয়েছে কী?

রাখাল বলে—মানেটা কী দাঁড়ালো? পিলু যদি তোর বউ হয় ত টুরা কী দাঁড়ালো সম্পর্কে? ছি ছি, এটা টোডা জাতের মধ্যেও হয় না। নিন্দা হবে।

মেয়েকে নিয়ে অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে টুরা। বিম্বুও কেমন যেন বিহ্বল হয়ে যায় মুহূর্তের জন্য। মাথাটা আপনিই তার নীচু হয়ে আসে।

কিছুক্ষণ কেটে যায় অদ্ভুত নীরবতার মধ্য দিয়ে। টুরা মেয়েকে কোল থেকে একটি বারের জন্যও নামায়নি, সে ঐ অবস্থায় কয়েক পা দরজার দিকে এগিয়ে গিয়েও হঠাৎ ফিরে দাঁড়ায়, তারপর রাখালের চোখের দিকে চোখ রেখে বলতে থাকে—আজ তুই শুনে রাখ, বিম্বুর আমি শাশুড়ী, আর কেউই নয়।

বলেই আর দাঁড়ায় না, দরজা থেকে বেরিয়ে হনহন করে এগিয়ে যেতে থাকে। অন্ধকার পায়ে-চলা পথ। বার বার পাথরে পাথরে আঘাত পায়, তবু চলতে থাকে। বেশ কিছুক্ষণ পরে পিছনে পিছনে একটা সঞ্চরায়মান আলোর বিন্দু যেন মাথা উঁচু করেই এগিয়ে আসতে থাকে। তারও কয়েক মুহূর্ত পরে পিছন থেকে ডাক শোনা যায়—টুরা!

থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে টুরা। বিম্বুই আসছে মশাল নিয়ে। রাখালের সঙ্গে নিশ্চয়ই একটা মিটমাট হয়ে গেছে তার। ওদিকে মেয়েটা কিন্তু চুপচাপ এক ভাবে পড়ে আছে। সব দেখেশুনে হতবাক হয়ে গেছে পাঁচ বছরের মেয়েটা। টুরা তার মাথায় ধীরে ধীরে হাত বুলায়, ফিসফিস করে বলতে থাকে—তোকে কি আমি ছেড়ে যেতে পারি, পিলু? আমি কি সত্যিই থাকতে পারি তোকে ছেড়ে?

মেয়েটার চোখে জল এসে পড়ে, সে ছোট ছোট হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে মায়ের গলা, ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে বলতে থাকে—যাবি না ত আমাকে ছেড়ে?

মা উত্তর দেয় না, ওর মাথায় হাত বোলায় শুধু।

রাত্রে মেয়েকে নিয়ে তারই ঘরে একই ছাউনির নীচে চুপচাপ শুয়ে থাকে টুরা। বেড়ার আড়ালে চাটাইয়ের ওপরে শুয়ে বিষ্ণুও ছটফট করে, তার চোখেও ঘুম আসে না। রাত তখন অনেক, বিছানা ছেড়ে হঠাৎ সে উঠে বসে। ঘরটা অন্ধকার। পিদিমটা কখন আপনিই কাঁপতে কাঁপতে তৈলবিহীন অবস্থায় পুড়ে শেষ হয়ে গেছে কে জানে! ধীরে ধীরে পা ফেলে আন্দাজে আন্দাজে সে দরজার কাছে এলো, আগড়টা খুললো, মাথা নীচু করে বাইরে এসে দাঁড়ালো। দূর থেকে 'দোদাবেতা' পাহাড়ের চূড়াটাকে দেখা যায়, তার পিছনে একফালি বাঁকা চাঁদ অর্ধনিমীলিত নেশাগ্রস্ত মানুষের মতো তাকিয়ে আছে। বেশ ঠাণ্ডা বাইরেটা, গায়ের চাদরটা ভালো করে জড়িয়ে নিয়ে তার প্রিয় পাথরটির ওপরে এসে বসলো বিষ্ণু। এবং বসামাত্রই ঘরের ভিতর থেকে একটা অদ্ভুত চাপা স্বরে আহ্বান এলো—বিষ্ণু!

সাড়া না দিয়ে নিথর হয়ে বসে রইলো বিষ্ণু। সঞ্চারিণী ছায়ার মতো ঘর থেকে পরক্ষণেই বাইরে এলো টুরা। ওকে দেখে নিয়ে তারপর ধীরে ধীরে কাছে এলো, বসলো ওর পাশে, পাথরের ওপরে। বললে—ঘুম এলো না।

—মেয়ে?

—ঘুমুচ্ছে।

বিষ্ণু বললে—তোর চোখে ঘুম নেই কেন?

অল্প একটু হাসলো টুরা, বললে—তোরই বা নেই কেন?

বিষ্ণু বললে—কারণটা খুব স্বাভাবিক। সারাদিন কী ঝড়ই না গেছে!

টুরা বললে—আমারও ত তাই।

বিষ্ণু ওর মুখের দিকে তাকালো, বললে—আমার কাছেই থাকবি ত?

—না।

—কেন?

টুরা ওর চোখের দিকে মেলে ধরলো তার বিষণ্ন দৃষ্টি, বললে—রোজ আসবো। এসে দেখে যাবো।

খপ্ করে ওর একখানা হাত চেপে ধরলো বিষ্ণু, বললে—আবার ফিরে যাবি স্বামীর কাছে?

চোখ দুটি মুহূর্তে ভরে গেল জলে, মুখখানা নীচু করতেই কয়েক বিন্দু টলমল করে ঝরে পড়লো শিশিরের মতো। পাণ্ডুর আর অস্পষ্ট চাঁদের আলোয় সেই বিন্দুগুলোও যেন প্রত্যক্ষ করতে পারলো বিষ্ণু, ওর হাতে একটু নাড়া দিয়ে বলে উঠলো—কী হয়েছে?

মুখ তুললো টুরা, চোখের জল আর গোপন করলো না, বলে উঠলো—স্বামী কে? আর আমার স্বামী কেউ নেই। সে আমাকে টিয়েক্‌জ্রির শপথ নিয়ে ত্যাগ করেছে, চাদর ছিঁড়ে দিয়ে বিয়ে কাটিয়ে দিয়েছে। তার কাছে আর তো ফেরা যায় না।

সাগ্রহে ওর হাত দুটো ধরে ওকে নিজের কাছে টেনে আনবার চেষ্টা করতে লাগলো বিষ্ণু—তবে?

ঈষৎ বাধা দিলো প্রথমটায়, ওর চোখের দিকে তাকিয়ে টুরা যেন বুঝতে চাইলো, এই শেষ রাত্রের হিমেল হাওয়ার মধ্যে উন্মুক্ত প্রকৃতির পরিবেষ্টনীব কোলে বসে পুরুষ কী চায়! তারপর ধরা দিলো ওর নিবিড় বন্ধনে, সাড়া দিলো ওর আগ্রহান্বিত দুটি ব্যাকুল ওষ্ঠের আহ্বানে। কিন্তু কয়েকটি মুহূর্ত মাত্র। তারপরই জোর করে নিজেকে ছাড়িয়ে নিলো টুরা, বললে—বিষ্ণু, এই আমি প্রথম পাপ করলাম।

—কেন?

টুরা ওর চোখের দিকে শান্ত স্নেহমণ্ডিত দৃষ্টিতে তাকালো, ঠোঁটের কোণে টেনে আনলো করুণ কোমল হাসি, বললে—সাধ মিটেছে তো? এবার তোকে কথাটা বলতে পারি?

—কী কথা ?

টুরা বললে—আর কখনো এমন কাজ করিস না আমার সঙ্গে। আমাকে একটা জিনিস দিবি, বিস্থু ?

—কী ?

টুরা বললে—ছোট একখানা কাপড়।

কথাটা ভালো করে না বুঝেই বলে ওঠে বিস্থু—কেন, ছোট কাপড় দিয়ে কী করবি ? পিলুর জন্যে ?

ম্লান একটু হাসে টুরা, তারপরে বলে—শাশুড়ীর একখানা কাপড় পাওনা হয়, জানিস না ?

পাথরের ওপর বসে থাকা মূর্তিটা যেন মুহূর্তে পাথরেই পরিণত হয়। টুরাও আর কিছু বলে না, চুপচাপ করে বসে থেকে নিজের মনেই কী যেন ভাবতে থাকে। দোদাবেতা পাহাড়ের অন্তরালে চাঁদ ডুবে যায়, আর সঙ্গে সঙ্গে বন্য মহিষের দলের মতো অন্ধকার যেন ছুটে আসতে থাকে তাদের কাছে, তাদের উপত্যকায়।

অনেকক্ষণ পরে যেন চমক ভাঙে টুরার, নীরবতা ভঙ্গ করে বলে ওঠে—কী, দিবি না একখানা কাপড় ?

বিস্থু এবার কথা বলে। বড়ো গম্ভীর শোনায় ওর কণ্ঠস্বর, বলে—তোর এই স্বামীকে তুই খুব ভালোবাসিস, না ?

টুরার সর্বাঙ্গ যেন থরথর করে কেঁপে ওঠে। মনে হয়, তার ভিতরের রক্তের স্রোতে যেন একটা হাহাকারের ঘূর্ণি উঠেছে, তার শিরায়-উপশিরায় যেন এক অভাবনীয় স্পর্শ লেগেছে। স্বপ্নে যেমন আচ্ছন্নের মতো কথা বলে ওঠে মানুষ, তেমনি কণ্ঠস্বরে বলতে লাগলো টুরা—আমার কথা থাক। সে যে আমাকে কতোখানি ভালোবাসত, সে এক আমিই জানি। ভালোবেসেছে, কিন্তু কখনো বউয়ের কাছে কোনো ব্যাপারে মাথা নীচু করেনি বা হার স্বীকার করেনি। একরোখা বুনো মোষের মতোই তার স্বভাব। বাইরে থেকে বোঝা যায় না। বাইরে চুপচাপ। ভিতরে ভিতরে ভয়ানক জেদী। যেটা সে বিশ্বাস

করে, যেটা সে নিজে স্থির করে, তার বিরুদ্ধে হাজার যুক্তি দিলেও সে তা শুনবে না। বিয়ে সে কাটিয়ে দিয়েছে, এখন তার কাছে গিয়ে মাথা কুটলেও সে আর আমাকে নেবে না। অথচ ভিতরে ভিতরে আমার জন্য ভালোবাসায় তার বুকটা যে চৌচির হয়ে যেতে থাকবে এ-ও আমি জানি।

মন দিয়েই ওর কথাগুলো শোনে বিম্বু, এবং শুনতে শুনতে আর একটা জগৎ যেন সমস্ত সুষমা নিয়ে ওর চোখের সামনে ভেসে ওঠে। সেখানে হিংসা নেই, হানাহানি নেই, বিপুল স্নেহের ঢেউ এসে যেন সমস্ত কিছুকে ভাসিয়ে নিয়ে চলেছে। কী এক দুর্বোধ্য আবেগে ভরে যায় বিম্বুর অন্তর, বলে ওঠে—চল্, এই শেষ রাত্রে তোকে ওর কাছে পৌঁছে দিয়ে আসি। আমি নিজে সব বলবো, তারপরে দেখি, তোকে ও ফিরিয়ে নেয় কি না?

—আর পিলু?

—রইলো আমার কাছে।

বিষণ্ণতায় করুণ হয়ে আসে টুরার চোখের দৃষ্টি, বলে—ও লোককে তোরা কেউ চিনিস না বিম্বু। ও আমাকে আর নেবে না। টিয়েকৃজ্রির নাম নিয়ে শপথ, এটা কোনো টোডাই ভাঙতে পারে না, আর ভাঙবে ও!

ঠিক এমন সময়, সেই শেষ রাত্রে, শান্ত উপত্যকায় হঠাৎ একটা স্বর জেগে ওঠে। ঝাউগাছগুলো ঝিমুতে ঝিমুতে যেন হঠাৎ মুখ তুলে তাকায়। ওরাও চকিত হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে। কে যেন চীৎকার করে কাকে ডাকছে দূরে। মশালের একটা আলোর বিন্দু দূরে যেন দেখা যায়। ওরা ছুটে গিয়ে কাছের টিলার ওপরে ওঠে। দেখে, একটি নয়, পর পর তিনটি আলোর বিন্দু এক জায়গায় এসে জড়ো হয়েছে। একটি মানুষের স্বর নয়, অনেকগুলো মানুষের স্বর একত্রিত হয়ে কলরবের সৃষ্টি করেছে এবার। কথা বোঝা যায় না, কিন্তু শব্দের রেশ যেন পাহাড়ে পাহাড়ে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরতে থাকে।

সে রাত্রে ঘরে প্রদীপ জ্বালিয়ে সুঞ্জাও জেগে ছিল প্রায় সারাটা রাত। পার্থ-কাইকে সাদা মানুষরা ফিরতে দেয়নি, আদর-আপ্যায়ন করে রাত্রের মতো রেখে দিয়েছে, সঙ্গে তার রয়েছে মাত্র তুজন লোক, আর সবাই ফিরে এসেছে। সুঞ্জাও এসেছে, তবে তার সঙ্গে এসেছে সেই মানুষটি যে সাদা মানুষদের খাতা লেখে, যার নাম পণ্ডিত। পণ্ডিত সারা রাত ধরে ওকে মন্দিরের কথা বুঝিয়েছে। বলেছে—দেয়ালে টিয়েক্‌জ্রি দেবীর ছবি এঁকে রাখ, তোদের সূর্যদেবতা পীর্‌জ-এর মূর্তি এঁকে রাখ, তাহলেই পুজো করা যাবে তাঁদের, ঘরের মধ্যে বসে। তবে এসব পুজোর নিয়মকানুন আছে বইকি! সেই সব নিয়মকানুন মানলে সত্যিকার 'পেলল' হওয়া যায়। আর পেললরাই তো পারে গাঁয়ের সব অমঙ্গল দূর করতে।

—আমাকে তুমি শেখাবে সব ?

পণ্ডিত বললে—শেখাবো। তবে আমাকে এখানে থাকতে হবে লুকিয়ে। আমার আর সাদা মানুষদের কাছে গেলে চলবে না।

—রাগ করবে না সাদা মানুষরা ?

পণ্ডিত বললে—জানতে পারবে কী করে! আমি তো দিনরাত ঘরের ভিতরে থাকবো, আমিও তো পেলল হবো। পেলল হলে ঘরের বাইরে যাবার নিয়ম নেই।

—রাজাকে জিজ্ঞাসা করতে হবে।

পণ্ডিত বললে—নিশ্চয়ই করবো। রাজা আপত্তি করবে না। দেখে শুনে সে ভয় পেয়ে গেছে। সাদা মানুষরা দলে দলে এসে পাহাড়ে ছড়িয়ে পড়ছে, সঙ্গে আমার মতো হিন্দুরাও আসছে। নতুন নতুন কতো গাছ পুঁতেছে জানিস!

—কী গাছ ?

পণ্ডিত বললে—সাহেবরা বলে ইউক্যালিপ্‌টাস্‌। খুব বড়ো হবে নাকি গাছগুলো। পাতায়-পাতায় গন্ধ। ঠাণ্ডা লাগলে ওষুধও হয়। একদিন দেখবি এই সব পাহাড় ঐ ইউক্যালিপ্‌টাস্‌ গাছে ভর্তি হয়ে গেছে।

—কোথা থেকে এসেছে ঐ গাছ ?

পণ্ডিত বললে—চারাগাছ নিয়ে এসেছে, বীজ নিয়ে এসেছে—কোথা থেকে জানিস ? অনেক দূর থেকে। জাহাজে করে।

—জাহাজ কী ?

—সমুদ্রে চলে।

—সমুদ্র কী ?

একটু বিব্রত বোধ করলো পণ্ডিত। এদের এতো কথা সে বিশ্বাস করাবে কী করে ? অথচ এদের বন্ধুত্ব তার চাই-ই। বীররাজার চর মাণ্ডেও উঠে এসেছে তার খোঁজে। টের পেলে ধরে নিয়ে গিয়ে মা-ভবানীর মন্দিরের সামনে পশুর মতো বলি দেবে। মুখে দাড়ি রাখতে হবে, লম্বা চুল রাখতে হবে, ঘর থেকে বেরুনো হবে না, এদের মধ্যে একেবারে মিশে যেতে হবে।

—বললে না ?

পণ্ডিত বললে—পরে একদিন বুঝিয়ে বলবো। আজ পূজোর ব্যাপারটাই বুঝে নে। আমাদের মতো নীচে যারা থাকে, তারা তোদের পীরজ-এর মতো যাকে পুজো করে তাকে বলে, রাম। আমি রামের পূজো শেখাবো না, তোদের দেবতার পূজোই শেখাবো।

—রামের পূজো কেন তারা করে, 'পীরজ'-এর পূজো করে না কেন ?

পণ্ডিত বললে—তাহলে বলি শোন। অনেক—অনেক আগে এদিকে এক রাজা ছিল, তার নাম রাবণ। সেই রাবণের সঙ্গে যুদ্ধ করতে এলো দূর দেশ থেকে এক বনবাসী রাজপুত্র—তার নাম রাম। এদিককারই অন্য জাতের কিছু লোক নিয়ে বিরাট সৈন্যদল তৈরী করলো রাম। কিন্তু রাবণের মতো রাজার সঙ্গে যুদ্ধে পেরে ওঠা অতো সহজ নাকি! তার ওপরে তার সৈন্যরা হচ্ছে অনেকটা ভাড়া করা সৈন্যের মতো। তারা বেশ জানে তারা পরের হয়ে যুদ্ধ করছে। তাহলে যুদ্ধের চেহারা কেমন হতে পারে এইবার কল্পনা

করে নে। রাম সেটা হাড়ে হাড়েই বুঝলো। বুঝে কী করলো জানিস্? শোন্ তাহলে। এখানকার লোক অর্থাৎ যাদের থেকে সৈন্য তৈরী করেছিল রাম, তারা করতো মা-ভবানী বা মহিষমর্দিনীর পুজো।

—মহিষমর্দিনীর পুজোটা কী?

পণ্ডিত একটু ভেবে নিয়ে বললে—বুনো মোষের উৎপাত ছিলো এদিককার জঙ্গলে ভীষণ। তাই তারা পুজো করবে বলে এমন এক দেবীর কল্পনা করলো, যিনি কিনা দুরন্ত বুনো মোষকে কেটে ফেলছেন।

—তারপর?

—তারপর আর কী? মা-ভবানীর মূর্তি তৈরী করে রাম নিজে পুজো করলো এদের সবার সামনে। তাই দেখে সঙ্গে সঙ্গেই সৈন্যদের মধ্যে একটা পরিবর্তন এলো। তাদের মনের জোর বেড়ে গেল, সেই দিন থেকে তারা রামকে নিজের লোক বলে মনে করতে লাগলো। এইভাবে রাবণকে হারিয়ে দিলো রাম।

রুদ্ধনিশ্বাসে গল্পটা শুনছিল সুঞ্জা, বলে উঠলো—তাহলে আমিও তো রামের মতো কাজ করতে পারি!

—কী কাজ?

সুঞ্জা বললে—সাদা মানুষরা ঘর বানিয়ে আলো জ্বেলে দেবতার পুজো করছে তো? আমিও যদি ওদের মতো ঘরের মধ্যে আলো জ্বালিয়ে পুজো করি, তাহলে তো ওরাও আমাকে নিজেদের লোক বলে মনে করতে থাকবে? তখন তো আর আমাদের মাগুগুলো ওরা একের পর এক নিয়ে নেবে না!

মনে মনে চমৎকৃতই হলো পণ্ডিত। বললে—আমিও তো সেই কথাই বলছি। ওদের মতো ঘর হোক, আলো জ্বাল, দিনরাত ঘরে থেকে পুজো শুরু করে দে। তবে ওদের দেবতা নয়, নিজেদের দেবতা। তা নইলে তোদের নিজেদের লোকেরা ক্ষেপে যাবে। চোখ

বুজে ধ্যান করবি আর ভাববি, হে দেবী টিয়েকৃজ্রি, সবার ভালো করে দাও।

সুঞ্জা সে রাত্রে অভিভূত হয়ে ওকে কথাই দিয়ে ফেললো, পণ্ডিত যা তাকে করতে বলবে তা-ই সে করবে।

পণ্ডিত মনে মনে কৃতজ্ঞতা জানায় তার নিজের ইষ্টদেবতাকে। বীররাজা যাতে কোনোরকমে তার সন্ধান না পায়, সে জন্য তার দিনরাত লুকিয়ে থাকা দরকার। মন্দিরে সে দিনরাতই থাকবে লুকিয়ে, সঙ্গে থাকবে ওই সুঞ্জা। এইভাবে ওদের মধ্যে একদিন নিয়মই হয়ে যাবে, পূজারী বা 'পেলল' হতে গেলে মন্দিরে দিনরাত লুকিয়েই থাকতে হবে। মানুষের মনে এইভাবেই তো সবার অলক্ষ্যে সংস্কার গড়ে উঠতে থাকে।

পণ্ডিত সুঞ্জার মুখের দিকে তাকালো, বললে—আমিও সঙ্গে থাকবো তোর।

তারপরে একটু থেমে আবার বললে—রাবণের বংশধর তোরা, রামের তাড়া খেয়ে এইখানে এসে লুকিয়েছিল তোদের পূর্বপুরুষ।

সুঞ্জা অবাক হয়ে বললে—একথা আবার কে বললে? আমরা রাম-রাবণ কাউকেই চিনতাম না।

পণ্ডিত বললে—সে কথা আর বলিস না। তুই পেলল হলে সবাই তোর কথা মানবে। তখন এই কাহিনীই তুই প্রচার করবি। নইলে তোদের বাইরের লোক মনে করবে নীচের লোকেরা, তোদের কোনো সাহায্যেই তারা এগিয়ে আসবে না। আর, আজ যতোই পার্থ-কাইকে নিয়ে ওরা আদর-আপ্যায়ন করুক, ঐ সাদা মানুষরা ভয়ানক স্বার্থপর লোক, দরকার বুঝলে তোদের নিশ্চিহ্ন করে দিতেও ছাড়বে না। তখন তোদের পাশে এসে যদি কেউ দাঁড়ায় তো নীচের লোকেরাই এসে দাঁড়াবে।

সুঞ্জা বললে—বুঝেছি তোমার কথা। তাহলে রাবণের লোক কেন, রামের লোক বলেই নিজেদের চালিয়ে দিই না ?

পণ্ডিত বললে—বিশ্বাস করানো শক্ত হবে। চেহারায় পর্যন্ত তোদের সঙ্গে ওদের মিল নেই !

সুঞ্জা ভাবতে লাগলো কথাটা। কথায় কথায় রাত যে কখন কেটে গেছে ওরা কেউ টের পায়নি। হঠাৎ একটা চীৎকার আর কলরব শুনে ওরা চকিত হয়ে উঠলো। পণ্ডিত ওর হাত চেপে ধরে ফিসফিস-করা গলায় বললে—বীররাজাদের লোক নয় তো ? আমায় ধরতে আসেনি তো ?

সুঞ্জা উঠে দাঁড়ালো, বললে—দেখছি।

মাথা নীচু করে হামাগুড়ি দিয়ে ঘরের বাইরে এলো সুঞ্জা। ওদের ঘরগুলোর চাল ছিলে-পরানো ধনুকের মতো অর্ধগোলাকার। চারিদিক বন্ধ, জানালা বলতে কিছু নেই, সামনের দিকে শুধু ছোট্ট নীচু একটা দরজা, হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকতে আর বেরুতে হয়।

সুঞ্জা বাইরে এসে কয়েকটা ধাপ এগিয়ে যেতেই পাগল ফোরির সঙ্গে একেবারে মুখোমুখি হয়ে গেল বলা যায়।

—কী হয়েছে রে ফোরি ?

ফোরি তার পাশ কাটিয়ে ওপরের দিকে উঠে গেল। পিছনে পিছনে ছুটে গেল সুঞ্জা। পিছন থেকে ওর হাতটা টেনে ধরে ওকে থামিয়ে দিয়ে বলে উঠলো—কী হয়েছে ?

ফোরির মুখখানা ঘামে ভর্তি, মাথার বড়ো-বড়ো চুলগুলো মুখে এসে পড়েছে। এমন ভাবে ছুটে এসেছে যে ঠাণ্ডার দিনেও ঘেমে উঠেছে একেবারে। তার দিকে উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি স্থাপিত করে ফোরি বললে—ছাড় আমাকে, এখুনি আমাকে ছুটতে হবে আমার সেই গাছগুলোর কাছে। খরচের খাতায় একটা দাগ টানতে হবে।

—কেন, কী হয়েছে !

ফোরি বললে—একজন টোডা খতম।

—কে ?

ফোরি বললে—সিরুভবানীর জলে ডুবে মারা গেছে। সেই সাঁঝরাত্তির থেকেই খোঁজ পাওয়া যাচ্ছিল না, মশাল নিয়ে ওর বাপ-টাপ সবাই বেরিয়ে পড়েছিল। খোঁজ পাওয়া গেল এই একটু আগে। মড়া নিয়ে এসেছে, দেখ্ না গিয়ে, জল খেয়ে ফুলে ঢোল !

—কিন্তু, কে ?

হো-হো করে হেসে উঠলো পাগল ফোরি, তারপরে বললে—তোদের বন্ধু। টুরার স্বামী।

আশ্চর্য, দিনের পর দিন যেতে লাগলো, মাসের পর মাস, টুরা কাঁদলো না, কিছু না, কিন্তু কেমন যেন নিষ্প্রাণ যন্ত্রের মতো হয়ে গেল। খিদে পেলে বিশ্বুর ঘরের দরজায় গিয়ে উপস্থিত হয়, মর্জি হলে এক-একদিন মেয়ের কাছে শুয়ে থাকে, আর নয়ত সুঞ্জার পরিত্যক্ত ঘরখানায়,—একেবারে একা। সুঞ্জা তার নিজের ঘর ছেড়ে দিয়ে টুরা আর টুরার স্বামী মিলে যে ঘর তৈরি করেছিল, সেই ঘরে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে। চালাটা গোলাকার, মাথায় লাল নিশান, ঘরের চারিদিকে পাথরের পর পাথর বসিয়ে দেওয়াল তৈরি করা। এই দেওয়ালের ভিতরে কোনো মেয়েমানুষ ঢুকতে পারে না, রাজার নিষেধ আছে। টুরা মনের ভুলে যদিও বা কোনোদিন আসে, দেওয়ালের বাইরে একটা জায়গায় পাথরের ওপর পাথর বসিয়ে যে স্তম্ভের মতো জিনিসটা গড়ে তোলা হয়েছে, তার কাছে ধপ করে বসে পড়ে। সুঞ্জা দূর থেকে টের পেলেই ঘরের ভিতরে চলে যায়। সে পেলল হয়েছে, তার চত্বরের বাইরে আসা নিষেধ, মেয়েদের সঙ্গে কথা বলাও নিষেধ।

সুঞ্জার এই নতুন ঘরখানা হয়েছে টিয়েকৃজ্রি দেবীর মন্দির, এ মন্দিরে থাকে সেই হিন্দু পণ্ডিত আর সুঞ্জা। পার্থ-কাই-এর লোক এসে মন্দিরের পাশে একটা টু-এল্ তৈরী করে দিয়ে গেছে, সেখানে

থাকে কয়েকটা মোষ। পার্থ-কাই-এর লোকেরাই মোষগুলোর পরিচর্যা করে, শুধু দুধ দুইয়ে নেয় এসে সুঞ্জা নিজে। ভিতরে সমস্তটা মেঝে একেবারে নিকোনো, ঝকঝকে। দরজার ঠিক বিপরীত দেওয়ালেই দেবীর বেদি, পাথর বসিয়ে বসিয়ে খানিকটা উঁচু করা হয়েছে। সেই পাথরের ওপর দাঁড় করানো আছে লম্বা একটি পাথর, সেই পাথরের মাথায় দুটি চোখ আঁকা কালো রঙে, তার নীচে লাল ঠোঁট। প্রতিদিন এই চোখ আর ঠোঁট আঁকতে হয়। পণ্ডিত বলেছে, দেবী টিয়েক্‌জ্রি পাথরে এসে বাঁধা পড়েছেন, ওঁকে পূজো করলে সারা টোডা গাঁয়েরই মঙ্গল হবে। ফুল দিয়ে পূজো নয়, সিরুভবানীর জলের ধারা দিয়ে পূজো, ঐ যে মন্দিরের টৃ-এল্‌-এ বাছা বাছা মোষগুলোকে রাখা হয়েছে, সেই পবিত্র মোষের দুধের ধারা দিয়ে পূজো।

পার্থ-কাই তা-ই মেনে নিয়েছেন। না মেনে নেওয়া ছাড়া উপায় ছিল না। এতে গাঁয়ের মঙ্গল যদি হয়, হোক। জলে ডুবে মারা গেল টুরার স্বামী। নিশ্চয়ই টিয়েক্‌জ্রি দেবী রেগে গিয়েছিলেন। নইলে শক্তসমর্থ জোয়ান ছেলেটা অমন করে পাগলের মতো সিরুভবানীর জলে ঝাঁপিয়ে পড়বে কেন? ছেলে ছুটে গেল, বাপ ছুটলো পিছনে পিছনে। কিন্তু সে বুড়ো মানুষ, তার সঙ্গে পারবে কতক্ষণ! মুহূর্তে ফোরির গাছগুলোর আড়ালে সে অদৃশ্য হয়ে গেল। তখন যদি বৃদ্ধ বুঝতে পারতো সে জলের দিকে গেছে, তাহলে কি এই অনাসৃষ্টি ঘটতে পারতো! হাতে ধরে বুঝিয়ে সুঝিয়ে সে তাকে ঠিক ফিরিয়ে আনতো। তা না করে বৃদ্ধ গেল জঙ্গলের দিকে। কতো ডাকাডাকি করলো, ছেলের সাড়া আর পেলো না। ফিরে এলো গাঁয়ে, বৃদ্ধর তখন মাথা ঘুরছে, হাত-পা কাঁপছে থরথর করে। গাঁয়ের ছেলেরা মশাল জ্বালিয়ে বেরিয়ে পড়লো। বনের পথে পথে কতো খুঁজলো, কতো ডাকলো, পেলো না। তারপর যখন ভোর

হয়ে এলো তখন একটি ছেলের খেয়াল হলো, বললে—নদীর ধারে খুঁজে দেখি চল্ তো!

দেখা গেল সিরুভবানীর অপরিসর জলে সে গলায় পাথর বেঁধে ডুবে আছে। জল খেয়ে খেয়ে শরীরটা ফুলে গেছে। এ-ও দেবীর রোষ ছাড়া আর কী!

ওদিকে আরও একটা ব্যাপার ঘটেছিল। সেই যে মেয়েটি—গেন্না, যার প্রথম সন্তান হয়েছে মেয়ে, সে মেয়েটিকে নিয়ে পালিয়ে যাচ্ছিল সাদা মানুষদের মাণ্ডের দিকে। ধরা পড়লো। মেয়েটি কেঁদে বলতে লাগলো—টুরা যেমন করে তার মেয়েকে বাঁচিয়েছিল আমিও তেমনি করে বাঁচাবো।

তাকে ধরে আনা হয়েছিল পার্থ-কাই-এর কাছে। পার্থ-কাই-এর সভাসদ জনৈক বৃদ্ধ বললে—ভালো কথা নয়। তখনই বলেছিলাম, টুরার মেয়েকে বাঁচতে দেওয়া ঠিক হলো না। অন্য মেয়েরা এতে জোর পাবে, দেবতা-টেবতা না মেনে পালিয়ে যেতে চাইবে।

পার্থ-কাইকে সাদা মানুষরা যে সব উপহার দিয়েছিল তার মধ্যে কতোগুলো বোতল ছিল। সেই বোতলের রঙীন পানীয় পান করে তার চোখ দুটি তখন ঘোর লাল, সে বললে—না, তা হবে না, বাচ্চাটিকে জোর করে কেড়ে নিয়ে মেরে ফেলা হোক।

গেন্না তবু পালিয়ে গিয়েছিল আরেকবার। পালিয়ে একেবারে টুরার কাছে। বলেছিলো—দিদি, তোর মেয়ের মতো একেও বাঁচিয়ে দে।

বাচ্চাটা কোলে নিয়ে হি-হি করে হেসে উঠেছিল টুরা, তারপরে বলেছিলো—ম্যাট্‌সুনি করে দে।

—কার সঙ্গে?

টুরা উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি মেলে তাকালো, তারপরে বললে—আমার ছেলের সঙ্গে।

—তোর ছেলে কই?

ঝরঝর করে কেঁদে ফেলেছিলো টুরা, বলেছিলো—মিথ্যা বলিসনি! আমার ছেলে নেই? তাকে নিয়ে আমার স্বামী সিরুভবানীর জলে খেলা করতে যায়নি?

ভয় পেয়ে ওর কোল থেকে নিজের মেয়েকে ফিরিয়ে নিয়েছিলো গেন্না—ঈস! টুরার মাথাটা একেবারে খারাপ হয়ে গেছে।

টুরার কান্না ততক্ষণে থেমে গেছে, চোখ দুটি বড়ো-বড়ো করে স্থিরদৃষ্টিতে সে তাকিয়ে রইলো গেন্নার দিকে। বললে—আমার স্বামী চলে গেছে সিরুভবানীর জলের সঙ্গে মিশে, ছেলে যেদিন বড়ো হবে সেইদিন আসবে ফিরে।

উত্তেজনায় গেন্নারও তখন বুঝি মাথার ঠিক ছিল না, সে শোক-গ্রস্তাকে হঠাৎ বলে বসলো—তোর স্বামীকে চিতায় নিয়ে গিয়ে সবাই পুড়িয়ে মারলো, তোকে স্নান করিয়ে নতুন কাপড় পরালো মেয়েরা, সে সব তুই মনে করতে পারছিস না? তোর স্বামী মরে গেছে, আর তোর কোনোকালে ছেলে ছিলও না।

—খবরদার, মিথ্যে কথা বলবি না!—লাফিয়ে ওর কাছে ঘন হয়ে এলো টুরা—যাকে ওরা পুড়িয়েছে সে আমার স্বামী নয়, আমার স্বামীর পুতুলটা। নইলে হাত-পা ছিল, নাড়েনি কেন? চোখ ছিল, দেখেনি কেন? মুখ ছিল, কথা বলেনি কেন?

গেন্না অবাক হয়ে ওর দিকে তাকিয়ে রইলো কিছুক্ষণ। বুকের ভিতরটা মোচড় দিয়ে উঠতে লাগলো। বুঝতে পারলো, কী নিদারুণ আঘাত পেয়ে টুরার মাথাটা খারাপ হয়ে গেছে!

সে নিজের মেয়েকে বুকে চেপে ধরে বলতে লাগলো—দিদি, তোর মেয়ে রয়েছে না! তার মুখ দেখে শোকটা সামলে নেবার চেষ্টা কর। আর সঙ্গে সঙ্গে আমার মেয়েকেও বাঁচা। তুই ওকে বুকে করে রাখলে কেউ আর কেড়ে নিতে পারবে না।

কী ভেবে উন্মাদিনী ধীর পায়ে পিছিয়ে যেতে লাগলো, কিন্তু এগিয়ে এলো পরক্ষণেই। হাত দুটো প্রসারিত করে বললে—দে।

গেন্নার সংশয় তখনো যায়নি। টুরা যেভাবে সংগ্রাম করে মেয়েকে বাঁচিয়েছিলো, সে সব কথা পল্লবিত হয়ে প্রতিটি টোডা নারীর কানেই পৌঁছেছিল। তাতে করে সবারই ভিতরে ভিতরে একটা সম্ভ্রমের ভাব গড়ে উঠেছিলো ওর সম্পর্কে। সেই সম্ভ্রম থেকে একটা অদ্ভুত বিশ্বাস। কিন্তু এখন ওর অসংলগ্ন কথাবার্তা আর উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি দেখে গেন্না ইতস্ততঃ করতে লাগলো। টুরা আবার বললে—দে।

গেন্না পিছিয়ে গেল কয়েক পা, বললে—ও আমার কোলেই থাক। তুই আমাকে যেখানে নিয়ে যাবি সেখানে চল।

টুরা ওর হাতের ওপর রাখলো তার হাতখানা, বললে—আয় আমার সঙ্গে।

বলে ঘুরে ঘুরে যে-পথ দিয়ে ওরা চলতে লাগলো সে পথ গিয়ে শেষ হলো পাগল ফোরির রাজ্যে। যেখানে গায়ে গায়ে অসংখ্য রেখা নিয়ে গাছগুলো দাঁড়িয়ে আছে নির্বাক প্রহরীর মতো। ফোরি থাকলে হুঙ্কার দিয়ে উঠতো, কিন্তু সে ছিলো না। সাদা মানুষদের মাণ্ডে তারও একটা বন্ধু জুটেছে, কতো কী খেতে দেয় নাকি তাকে। ছোট্ট সাদা মতন একটা পাত্রে গাঢ় বর্ণের গরম একটা কী যেন ঢেলে দেয় সে ওর জন্য, আস্তে আস্তে চুমুক দিয়ে ওটা খেতে হয়, নইলে জিভ পুড়ে যায়। তারই লোভে ফোরি যে ঘনঘন আজকাল ছোটে সাদা মানুষদের মাণ্ডে, একথা টোডাদের মধ্যে কে না জানে ?

যাই হোক, ফোরির গাছগুলো ছাড়িয়ে ওরা চলতে লাগলো আরও নীচের দিকে। বাচ্চাটা ঘুম ভেঙে ককিয়ে কেঁদে উঠলো একবার, গেন্না বসে পড়ে তাকে স্তন্যপান করালো কিছুক্ষণ, অস্ফুটকণ্ঠে বলতে লগেলো—আমার চাঁদের কণা, আমার আকাশের তারা।

আর ওর প্রতিটি কাজ, প্রতিটি পদক্ষেপ বিস্ফারিত বিস্মিত দৃষ্টি দিয়ে দেখতে লাগলো টুরা, যেন নতুন এক জগৎকে সে প্রত্যক্ষ করছে !

তারপর আবার শুরু হলো চলা। চলতে চলতে এক সময় ওরা এসে দাঁড়ালো সিরুভবানীর জলের ধারে। টুরা বললে—দেখছিস ?

একটা বড়ো পাথরে ধাক্কা খেয়ে জল টুকরো টুকরো কাঁচের মতো ছড়িয়ে যাচ্ছে। সিরুভবানীর নীলাভ বারিরাশি ওখানে স্ফটিকের মতো শুভ্রতা ধারণ করে তরল কাঁচের মতো কণায় কণায় উদ্বেল হয়ে উঠে কিছুদূর পর্যন্ত প্রবাহিত হয়ে আবার নিলীমায় বিলীন হয়ে যাচ্ছে।

টুরা বললে—এইখানে আমার স্বামী শুয়ে ছিল। তুই দে না ওকে ওখানে ফেলে। আমার স্বামী নিয়ে নেবে—কোনো ভয় নেই।

অস্ফুট আর্তনাদ করে পিছিয়ে এলো গেন্না। টুরা বললে—দে না ফেলে। মেয়ের বদলে ছেলে ফিরে পাবি। আমার স্বামী আমাকে বলতো, মেয়েটাকে মেরে ফেল, ছেলে পাবি। আমাদের জাতের মধ্যে মেয়ের আদর নেই, ছেলেরই আদর। কী করবি ওকে নিয়ে ? ফেলে দে।

মেয়েকে বুকের ওপরে চেপে ধরে গেন্না চীৎকার করে বলে—না। তুই পেরেছিলি তোর মেয়েকে ফেলতে ?

টুরা লাফ দিয়ে এগিয়ে এসে দু'হাত রাখলো ওর কাঁধের ওপর, বললে—আমার মেয়ে কই ?

—কেন, পিলু ?

টুরা ওর ঠোঁটের ওপর আঙুল রাখলো, বললে—চুপ ! আমার স্বামী শুনলে রাগ করবে। পিলু আমার মেয়ে নয়। পিলু হচ্ছে বিম্বুর বউ !

সব মিলিয়ে এতক্ষণে সত্যিই ভয় করতে থাকে গেন্নার। সে টুরার মুখের দিকে তাকাতে তাকাতে পিছু হটে। টুরা চেঁচিয়ে ওঠে—যাচ্ছিস কোথায় ?

পিছন ফিরে গেন্না আর দাঁড়ায় না, প্রাণপণে ছুটতে থাকে। কিছুক্ষণ থেমে থাকবার পর টুরাও ছুটতে থাকে ওর পিছনে পিছনে।

পায়ে চলা পথ ধরে দুটি মেয়ে ছুটে চললো, সে এক অভাবনীয় দৃশ্যই বটে।

হয়ত গেন্না গিয়ে ঠিক পোঁছত সাদা মানুষদের মাঝে, লোকচক্ষু এড়িয়ে। কিন্তু টুরার চীৎকারই সব পণ্ড করে দিলো। ও ছুটেছে, আর চীৎকার করছে টুরা—মেয়েকে দে, মেয়েকে দে—এই গেন্না, গেন্না!

গাঁয়ের পিছন দিকে এসে দাঁড়িয়ে ছিল পার্থ-কাই-এর লোকজন টুরার স্বর লক্ষ্য করে। রূপকথার অজগরের ব্যাদিত মুখগহ্বরে যেমন করে এসে পড়তো সম্মোহিত পশুপক্ষী, তেমনি করে গেন্না যেন ছুটে এলো ওদের মধ্যে। একটা মোটা বাঁশের মুগুর ছিল একজনের হাতে। ওটা দরকার হয় ওদের ঘরবাড়ি তৈরি করতে। সেটি সটান একজন মাথায় বসিয়ে দিলো গেন্নার। গেন্না মেয়ে নিয়ে ছিন্নলতিকার মতো লুটিয়ে পড়লো মাটিতে জ্ঞান হারিয়ে। সেই সুযোগে একজন নিলো মেয়েটাকে ছিনিয়ে মায়ের কোল থেকে, অন্যজন বেঁধে ফেললো মেয়েটার হাত-পা। একটি লোক শুধু পরিচর্যা করতে লাগলো গেন্নার। সে হচ্ছে ওর স্বামী।

পিছন থেকে টুরা চীৎকার করে উঠলো—দে মেয়ে।

—কেন? কী করবি এই মেয়ে নিয়ে?

—সিরুভবানীর জলে দিয়ে আসবো।

—কেন?

—ওখানে আমার স্বামী শুয়ে আছে।

কে যেন হেঁকে বললে—ওকেও বাঁধ। পাগলকে বিশ্বাস নেই।

যে শিশুকন্যাটিকে বিসর্জন দিতে হবে তার অন্ততঃ আট দিন বয়স হওয়া চাই। কিন্তু রাজা পার্থ-কাই বললেন—না, আর দেরি করা চলবে না। আজই ওকে মুকেতি পাহাড়ে দিয়ে এসো। এখুনি।

[মনে রাখতে হবে, বাংলাদেশে আমরাও তখন গঙ্গাসাগরে সন্তান

বিসর্জন দিচ্ছি। বাংলাদেশে আমরাও তখন সদ্য-বিধবাকে ধরে এনে চিতার আগুনে জীবন্ত পুড়িয়ে মারছি। এই ঘটনার আরও পাঁচ বছর পরে আমাদের দেশে সতীদাহ-প্রথার আইনগত অবসান ঘটে— ৪ঠা ডিসেম্বর ১৮২৯ সালে।]

ওদের সেই শ্যামল উপত্যকায় সভ্যতার দিক থেকে প্রহার-খাওয়া ভীতসন্ত্রস্ত কয়েকটি মানুষের মিছিল সেদিন দূরবর্তী মুকের্তি পাহাড়ে উঠে কচি একটি শিশুকে বিসর্জন দিয়ে এলো। এ-প্রথা এমন স্বাভাবিক হয়ে উঠেছিল ওদের মধ্যে যে কোনো মা এ নিয়ে মুখ ফুটে কোনোদিন কোনো প্রতিবাদ করেনি। তারা এই সান্ত্বনা পেতো, মেয়ের দেহটা যাবে, আত্মাটা মরবে না, আত্মা ছেলের দেহ নিয়ে আবার মায়ের কাছে ফিরে আসবে। টুরাই হচ্ছে প্রথম টোডা মেয়ে যে এই সংস্কারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়। সে নিজে স্বামী হারিয়ে বুদ্ধিভ্রংশ হয়ে পড়ে বটে, কিন্তু তার কাহিনী টোডা মেয়েদের প্রেরণা দিতে থাকে ভিতরে ভিতরে। তা না হলে গেন্না অমন করে মেয়ে নিয়ে সাদা মানুষদের গাঁয়ে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করতো না।

মাসখানেক কেটে যায় তার পর। গেন্না নিজেকে কিছুটা সামলে নিয়েছে ততদিনে। ততদিনে টুরাও অনেকটা শান্ত হয়ে আসে। স্বাভাবিক বুদ্ধি আর জ্ঞান ফিরে আসেনি বটে, তবু সবার কথা অল্প-বিস্তর সে বুঝতে পারে. কখনো-সখনো তাকে দেখে মনে হয় সে বুঝি সম্পূর্ণ সেরে গেছে। রাত্রে সে চলে যায় বিষ্ণুর ঘরে, মেয়ের কাছে শুয়ে থাকে। দিনমানে সে আপনমনে এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়ায়, কখনো যায় সুঞ্জার মন্দিরের সামনে, কখনো সিরুভবানীর জলের ধারে গিয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে, কখনো বা গেন্নার কাছে গিয়ে বসে, আবার কখনো বা ফোরির সঙ্গে গল্প জুড়ে দেয়।

ফোরি তার নতুন-পাওয়া ঘটিবাটি টুকরোটাকরা জিনিস নিয়ে তার সেই প্রিয় গাছতলায় চলে যায়। পাতা কুড়িয়ে জড়ো করে এক জায়গায়, চকমকি ঠুকে আগুন জ্বালায়, বাটি করে জল গরম করে,

আর তারপরে তার বন্ধুর দেওয়া জিনিস কৌটো থেকে খানিকটা ঢেলে দেয় সেই গরম জলে, একটু দুধ মেশায়, গুড় মেশায়, তারপরে আরেকটা পাত্রে ঢেলে ধীরে ধীরে চুমুক দিতে থাকে। দিতে দিতে আরামে চোখ বুজে আসে তার। টুরাকে দেখতে পেয়ে বলে—এই টুরা, খাবি ?

—না।

—খা না। ভালো জিনিস। ওরা বলে, কাফি।

—কোত্থেকে পেলি ?

—বন্ধু দিয়েছে।

—কে বন্ধু ?

—একজন সাদা মানুষ।

টুরা ওর কাছে এসে বসে পড়ে। বলে—সাদা মানুষ তোকে খুব ভালোবাসে ?

—খুব।

—কেন ?

ফোরির কাছে তার ঠাকুর্দার পাওয়া সেই যে কী একটা অদ্ভুত জিনিস ছিল, একটা ছোট্ট সাদা মানুষের পুতুল, কাঠের ওপর হাত দুটো মেলে দিয়ে হাতে পায়ে পেরেক ঠুকে দিয়েছে, মাথায় দিয়েছে কাঁটার মুকুট। সেটির কথা এবার বলে ফোরি। বলে—সাদা মানুষকে ঠাকুর্দার জিনিসটা দিয়ে দিয়েছি, না হলে সে আমাকে কাফি দেবে কেন ? জানিস ? ওরা এখানকার পাহাড়ে মাটি চষে কাফির গাছ তৈরি করছে। আয়, আমার এখানে আমরাও কাফির গাছ লাগাই।

টুরা উঠে যায় ওর কাছ থেকে। সুঙ্গার মন্দিরে যায়। সুঙ্গা দূর থেকে ওকে দেখতে পেয়েই চলে যায় ঘরের ভিতরে। হিন্দু পণ্ডিত শুধু বেরিয়ে আসে, বলে—এখন তুই যা এখান থেকে। এখানে এখন মোষ বলি হবে। বিষ্ণু একটি বুনো মোষ ধরেছে।

সেই মোষটাকে এই পাথরের কাছে ধরে রেখে বলি দেওয়া হবে। তোর স্বামীর সেই চকচকে ধারালো অস্তরটা তোর শ্বশুরের কাছে আছে না? সেই অস্তর দিয়েই ওকে শেষ করা হবে।

মোষ-মারার কথা কখনো এর আগে শোনেনি টুরা। মোষ তাদের অতি আদরের, এই মোষ-পালনকে কেন্দ্র করেই তো তাদের জীবন ও জীবিকা। টুরা সবিস্ময়ে বলে—মোষ মারবি কেন?

পণ্ডিত বলে—টিয়েক্‌জ্রি দেবী স্বপ্নে আদেশ দিয়েছেন। তা না হলে ঘোর অমঙ্গল।

টুরা প্রশ্ন করে—সুঞ্জা কই?

পণ্ডিত বলে—সে তোর সামনে আসবে না। তোর সামনে কেন, কোনো মেয়ের সামনেই না।

—কেন?

পণ্ডিত বলে—দেবীর স্বপ্নাদেশ। আঠারো বছর সে যদি এরকম পেলল হয়ে থাকতে পারে, তাহলে সে সেদিন যা চাইবে তাকে তাই দিতে হবে। যদি দশটা মোষ চায়, তাই দিতে হবে। যদি কোনো মেয়েকে বউ হিসেবে পেতে চায়, তাও তাকে দিতে হবে।

—রাজা বলেছে?

পণ্ডিত বলে—বলেছে বইকি! না বলে উপায়? সাদা মানুষরা এই সব পাহাড় জঙ্গল একে একে নিয়ে নিচ্ছে, এর পর যদি তোদেরও তাড়িয়ে দেয়? রাজা তাই টিয়েক্‌জ্রি দেবীর আরাধনা করে রোজ এসে। দেবী যা স্বপ্নে আদেশ করবেন আমাদের, তা-ই মেনে নিতে হবে রাজাকে।

এতগুলো নতুন নতুন কথা মস্তিষ্কের মধ্যে একসঙ্গে বুঝি ধরে রাখতে পারে না টুরা, সে অস্বস্তি বোধ করে উঠে আসে। নিজের মনে ভাবতে ভাবতে চলে আসে গেন্নার কাছে। গেন্না স্নান সেরে চুল বেঁধে নতুন কাপড় আর পুটকলী পরে চুপচাপ বসে আছে।

ধারেকাছে কেউই নেই। পুরুষরা যে যার কাজে বেরিয়ে গেছে, মেয়েরাও বোধ হয় জলটল তুলে আনতে ব্যস্ত।

—গেন্না!

মুখ তুললো শুধু মেয়েটা, আর কিছু বললো না।

—আজ বুঝি চান করেছিস?

—হ্যাঁ।

গেন্নার চোখ দুটি হঠাৎ ছলছল করে এলো।

—কিরে, কোথাও যাবি?

—হ্যাঁ।

বলতে বলতে ঝরঝর করে কেঁদে ফেললো সে।

—কাঁদিস কেন? টিয়েক্‌জ্রি রাগ করবেন।

ওর চোখের দিকে চোখ তুলে তাকায় গেন্না, বললে—এসব কথা তুমিও বলতে শিখেছো?

ঠোঁটের কোণে হাসি টেনে আনে টুরা, বলে—শিখবো সব। মোষবলি শিখেছি।

অস্ফুট আর্তনাদ করে ওঠে মেয়েটা, বলে—মোষবলি তাহলে হচ্ছে?

—হচ্ছে। আরও কতো হবে।

গেন্না বললে—মোষবলির পরই আমার পালা। তুই জানিস না দিদি, আমার স্বামী আমার বিয়ে কাটান করে দিয়েছে রাজাকে বলে।

তীক্ষ্ণ একটা সুরে চীৎকার করে ওঠে টুরা, বলে—কাটান! পুটকলী ছিঁড়ে দিয়েছে?

গেন্না বলে—দিয়েছে। এটা নতুন। ঐ যে পণ্ডিত, ওর দেওয়া। মোষবলির পর ওর ঘরে গিয়ে আমাকে থাকতে হবে। মন্দিরের পিছন দিকে টিলার ওপারে নতুন একটা ঘর হয়েছে দেখিসনি?

টুরা ধপ করে বসে পড়ে মাটির ওপর গেন্নার কাছ ঘেঁষে। তার

চোখের সামনে দিয়ে কতোগুলো ছবি যেন দ্রুত ভেসে যেতে থাকে। তার পুট্টকলী ছিঁড়ে দেওয়া, দেবতার নামে শপথ করে বিয়ে কাটান দেওয়া, আর তারপরে গলায় পাথর বেঁধে সিরুভবানীর জলে গিয়ে শুয়ে থাকা। তাদের জাতের মধ্যে কখনো এমন শোনা যায়নি, একটা মেয়ের জন্য পুরুষ কিনা শেষকালে জীবনটা দিয়ে দিলো!

এতদিন পরে মানসিকতার আঘাতের বিচিত্র প্রতিক্রিয়ায় টুরার মনের আচ্ছন্ন ভাবটা, অসাড় ভাবটা বুঝি কেটে যেতে থাকে। তার মনে হতে লাগলো, তার একরোখা স্বামী তাকে কতো নিবিড়ভাবে ভালোবাসত! না হলে তার বিয়ে কাটিয়ে দেবার পর সে আর স্থির থাকতে পারলো না, সিরুভবানীর জলে গিয়ে নিজেকে নিঃশেষ করে দিলো!

টুরা দুটি হাতে অকস্মাৎ বেষ্টন করে ধরে গেন্নাকে, তারপরে ঝরঝর করে কাঁদতে থাকে।

ওর কান্নার সঠিক কারণ মেয়েটা বুঝতে পারে না, তবু ওর চোখেও অশ্রুর বিরাম নেই। একটু সামলে নিয়ে মেয়েটা বলতে থাকে—দিদি গো, আমার বড়ো কষ্ট। এই দেখ।

বলে, নিজেকে একটু ছাড়িয়ে নেয় ওর হাতের বেষ্টনী থেকে। তারপরে ধীরে ধীরে গায়ের পুট্টকলীটা খুলে ফেলে। উনিশ বিশ বছর বয়সের স্বাস্থ্যবতী তরুণীর উদ্ভিন্ন বক্ষসম্পদ। হাত দিয়ে নিজেই নিজের স্তনদুটি চেপে ধরে, বলে—ব্যাথায় টনটন করে, কাউকে বলতে পারি না। দুধে ভর্তি, কিন্তু আমার খুকু কই যে টেনে টেনে খাবে!

ওকে আবার টুরা কাছে টেনে নেয় সস্নেহে, চোখের উদ্গত অশ্রু মুছিয়ে দিতে দিতে বলে—শান্ত হ।

তারপর পুট্টকলী টেনে নিয়ে ওর গায়ের ওপর ছড়িয়ে দেয়। ওদিকে মন্দিরের কাছ থেকে শিঙা আর ঢোলের শব্দ শোনা যায়। বাদাগারা এসেছে বাজনাবাদ্যি নিয়ে। মোষবলি হবে। তাদের

উৎসব বা নাচগানের আসর বসলে বাদাগারা চলে আসে, তারাই তাদের সঙ্গতি আর বাজনদার।

এর পরে আরও আঠারো বছর কেটে গেছে। আমাদের সেই পাঁচ-বছরের ছোট্ট পিলুবাণী এখন তেইশ বছরের পূর্ণাঙ্গ যুবতী। আঠারো বছর মন্দিরের আবেষ্টনীতে থেকে পেলল-জীবন যাপন করার পর সুঞ্জা বাইরে এসেছে। আঠারো বছর ধরে টিয়েক্জ্রির পুজো করার ফলে গাঁয়ের কতদূর কী মঙ্গল হয়েছে কে জানে, তবে সাদা মানুষরা আর এগিয়ে আসেনি, বা বাদাগাদের খাজনা নিজেরা নেয়নি। কোনো কোনো বাদাগা-পল্লী কাউকেই কোনো খাজনা দেয় না, আবার কোনো কোনো পল্লী এখনো ওদের খাজনা দিয়ে চলেছে। নতুন কোনো অশান্তি আর ঘটেনি বললেই হয়, এমন কি এই আঠারো বছরে আর কোনো শিশুকন্যাকেও মুকেতি পাহাড়ে দেবতার উদ্দেশ্যে বলি দেওয়া হয়নি। কারণ, কোনো টোডা মেয়েরই প্রথম সন্তান মেয়ে হয়নি এর মধ্যে। আরও একটা আশ্চর্যের কথা, ওদের মধ্যে মেয়ে জন্মাচ্ছেও কম। সাদা মানুষরা সম্প্রতি গুণে দেখেছে, ছোট-বড়ো মিলিয়ে এখন ওরা সংখ্যায় হাজারেরও কম, আটশোর কিছু বেশী মাত্র, ছড়িয়ে ছিটিয়ে উপত্যকার চারধারে পড়ে আছে। সেই মহিষপালন ছাড়া আর ওরা কিছুই করে না বা করতে শিখলো না। যেটা শিখলো, যেটা মেনে নিলো সেটা হচ্ছে টিয়েক্জ্রির আধিপত্য। এমন কি সর্বশক্তিমান 'পীরজ'-এর থেকেও তিনি আজকাল বেশী শ্রদ্ধা পান ওদের কাছ থেকে। তাই পেললগিরি ছাড়বার দিনে সুঞ্জা পূর্ব শর্ত মতো চেয়ে বসলো যখন এক অদ্ভুত জিনিস, তখন কেউ আর 'না' করতে পারলো না। সুঞ্জা দশটা মোষ চাইলো না, ঘর চাইলো না, এমন কি গেন্নাকে পর্যন্ত চাইলো না। গেন্নাকে যেদিন সেই হিন্দু পণ্ডিত মোষবলির পর ঘরে তুলে নেয়, তার ঠিক ছয় বছর পরে পণ্ডিত হঠাৎ ওদের ছেড়ে চলে গেলেন তাঁর নিজের দেশ কুর্গে।

কুর্গে তখন বীররাজা ইংরেজ কোম্পানির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন। যুদ্ধে পরাজিত হয়ে ইংরেজদের মাদ্রাজ-বাহিনীর হাতে সব কিছু ছেড়ে দিয়ে পালিয়ে যেতে বাধ্য হন বীররাজা। ফলে ইংরেজ কুর্গ রাজ্যটিকে আত্মসাৎ করে। এটা শুনে তাঁর বউ গেন্না আর দু'বছরের শিশুপুত্র অজিতকে ছেড়ে তিনি এককথায় চলে গেলেন কুর্গে, একবারের জন্যও ফিরে তাকালেন না। সাদা মানুষরা নিশ্চয়ই তাঁকে কোনো উচ্চপদ দিয়েছিল, নইলে তিনি হয়ত ফিরে আসতেন। তা তিনি আসেননি, আর কেউ কোনোদিন শোনেনি ঐ হিন্দু পণ্ডিতের কথা। এ হচ্ছে ১৮৩৪-৩৫ সালের কাহিনী।

সুঞ্জা যেদিন পেললগিরি থেকে মুক্তি নিলো, সেটা হচ্ছে ১৮৪২ সাল। পার্থ-কাই মারা গেছেন, মারা গেছে টুরা ঐ সিরুভবানীর জলে ডুবেই। কেউ বলে, চান করতে করতে জলে আত্মহত্যা করেছে। কেউ বলে, ভেসে গিয়েছিলো পিছল পাথরে পা পড়ে। সঠিক কারণ কেউ জানে না। পিলুবাণীও না। সিরুভবানীর জল যখন কলসী করে তুলে আনতে যায়, তখন জলের উচ্ছ্বসিত স্রোতের দিকে এক একদিন নিষ্পলক তাকিয়ে থাকে সে। তার বাবা-মা দুজনকেই নিয়েছে সিরুভবানী, তাকেও কি নেবার জন্য মাঝে মাঝে চঞ্চল হয়ে ওঠে সে? বিশেষ করে যেদিন আকাশের মাথায় কালো মেঘ জমে, ঝরঝর করে বৃষ্টি হয়, আর অপরিসর সিরুভবানী অমনি উন্মাদিনীর রূপ ধরে, সংহার-মুর্তি নিয়ে প্রবলবেগে ফিরতে থাকে উপত্যকার পাদমূল বেষ্টন করে।

শেষের দিকে কেমন যেন হয়ে গিয়েছিল তার মা। তার কাছে রাত্রে অভ্যাসমতো শুতে আসতো বটে, কিন্তু ঘুমাতো কতটুকু! যখনই ঘুম ভেঙেছে, চমকে তাকিয়ে দেখেছে, একটা ছায়ামূর্তির মতো চুপচাপ বসে আছে তার মা। গায়ে ধাক্কা দিতো, বলতো—উঠে বসেছো কেন, ও মা?

—উঁ?

—শোও।

আর কিছু না বলে শুয়ে পড়তো। কিন্তু এটুকু বুঝতো পিলু যে, ঘুমোচ্ছে না তার মা, ছটফট করে কাটাচ্ছে।

বুকটা কেমন ধড়াস-ধড়াস করছে। অমুচ্চ বেড়াটার ওধারে ঘি-তৈরীর সরঞ্জামের কাছে চাটাই পেতে শুয়ে আছে বিম্নু, তাকে সে ডাকবে নাকি?

পরক্ষণেই মনে হয়, কী-ই বা হবে ডেকে? তার মা বিম্নুর সঙ্গেই কি ভালো করে কথা বলে নাকি? কারুর সঙ্গেই বলে না। সব সময় যেন অন্যমনস্ক হয়ে আছে। এক একদিন আবার নিজের মনেই বিড়বিড় করে বকতে থাকে। বলে—বিয়ে কাটান দিয়েছো, আবার ডাকো কেন? আমি যাবো না। সিরুভবানীর জল খুব ঠাণ্ডা। শীত করবে।

প্রথম দিকে তারা ভাবতো মা বোধহয় ভালো হয়ে গেছে। গেন্নার সঙ্গে মা'র খুব ভাব হয়েছিল, প্রায়ই যেতো গেন্নার নতুন সংসার দেখতে। তারপরে যেদিন পণ্ডিত চলে গেল ছেলে বউ রেখে নিজের দেশে পালিয়ে, সেদিন থেকে আবার মাথাটা কেন যেন খারাপ হয়ে গিয়েছিল মায়ের। বিড়বিড় করতো, বলতো—কেন ছিঁড়ে দিয়েছিলে পুটকলী? বিম্নু আমার জামাই, আমি ওর শাশুড়ী। ছি ছি, ওকে নিয়ে—

অথচ পিলু জানে তার মা তাকে বিম্নুর বউ মনে করলেও, বিম্নু তা মনে করে না। সে যেমন ছোট থেকে বিম্নুর কাছে আছে, তেমনিই রয়ে গেল। কেউ কিছু বললে প্রতিবাদও করে না, অথচ সে বড়ো হওয়া সত্ত্বেও তাকে বউ হিসাবে গ্রহণ করে না। এমনি করে করে সে যখন তেইশ বছরে পা দিলো, তখনো কেউ জানে না যে সে সত্যিই কুমারী।

পার্থ-কাই মারা গিয়েছিলেন পেটের অসুখে। ঐ যে সাদা মানুষরা বোতল পাঠাতো, সে বোতলের রঙীন জল খেয়েই লোকটা মারা গেল।

ঐ জল অতো খায় মানুষ? শেষ পর্যন্ত দিনরাত ঐ জল মুখে করে কাটাতো বলা চলে। কোনো-কিছু দেখতো না, যার যা ইচ্ছা করতো। টিয়েক্‌ভ্রি দেবীর স্বপ্নাদেশ, একথা বললেই হলো, আর কোনো প্রতিবাদ নেই। এক দিক থেকে দেখতে গেলে সেই হিন্দু পণ্ডিতই চলে যাবার আগে পর্যন্ত তাদের রাজার কাজ চালিয়ে গেছে।

তার ঘরে গিয়ে গেন্নার কোলে যে ছেলেটি এসেছিল, তার নাম অজিত। ১৮৪২ সালে সুঙ্গা যখন পেলল-পদ থেকে মুক্তি নিলো, তখন সে রীতিমতো প্রৌঢ়। লোকের আশা ছিল, গেন্নাকে নিয়েই বুঝি সে ঘর বাঁধবে। অন্ততঃ বিষ্ণু মনে মনে সেই অভিলাষই পোষণ করতো। রাজা মারা যাবার পর বিষ্ণুই সবাইকে ডেকে একটি সভা করে। সেই সভায় আটশো টোডা মিলে স্থির করে যে, তাদের রাজা আর কেউ রইলো না। রাজার বদলে তৈরি হলো 'নিয়াম'। আমরা যাকে পঞ্চায়েৎ বলি সেই ধরনের ব্যাপার কতকটা। নিয়ামে বাদাগা থেকে দুটি লোক নেওয়া হলো, আর তাদের মধ্যেকার বিভিন্ন গাঁ থেকে এলো কিছু কিছু লোক। সবসুদ্ধ আঠারো জন লোক। আঠারো জন বিচার-সালিসি করবে সব বিষয়ে, বিধানও দেবে, এই স্থির হলো। আর প্রত্যেক গাঁয়ের 'কুঁড়' বা প্রধান যিনি, তিনি নিজের বিচারবুদ্ধি অনুসারে ছোটখাট ঝগড়াঝাঁটি মিটমাট করে দেবেন, এই কথা হলো।

পেলল-মুক্তির দিনে নিয়ামের সামনে সুঙ্গা চেয়ে বসলো, অন্য কাউকে নয়, পিলুবাণীকে। শর্ত অনুযায়ী ওকে ওর হাতে সবাই দিতে বাধ্য। বিষ্ণু আপত্তি করলো না, নিজের হাতে করে পিলুবাণীকে নিয়ে এসে ওর ঘরে তুলে দিলো। নিজের টু-এল্‌ থেকে দুটো মোষ এনে দিলো।

সুঙ্গার ঘরও তৈরি করে দিলো গাঁয়ের লোকেরা। সেদিন ছোটখাট উৎসবও হলো একটা। বিষ্ণু জনকয়েক তরুণ ছেলেকে নিয়ে বুনো মোষ ধরতে বেরুলো। ধরে আনলোও হৈহৈ করতে

করতে। তাকে এনে মন্দিরের সামনে মাথায় মুগুরের বাড়ি বসিয়ে মেরে ফেললো। মোষ কেটে মাংস রান্না করে খেতে লাগলো সবাই। মাংস খাওয়া তাদের মধ্যে ছিল না, এটিও তারা শিখেছিল সেই হিন্দু পণ্ডিতটির কাছ থেকে। খাওয়াদাওয়ার পর নৃত্যগীত চলতে লাগলো ওদের মধ্যে, আর নিয়াম-এর নির্দেশে পিলুবাণীর হাত ধরে প্রৌঢ় সুঞ্জা চললো বনের দিকে। বেশ কিছুক্ষণ ওখানে কাটিয়ে ফিরে আসবে ওরা দুজন, তখন হবে উৎসব সমাপ্তি, বরবধূ চলে যাবে তাদের ঘরে।

উৎসব চলেছে, দূর থেকে 'আ—হা—হা—আ' ধরনের রেশটানা একটা বিলম্বিত লয়ের সুর শোনা যাচ্ছে, সুঞ্জার হাতে হাতখানা কাঁপছে পিলুবাণীর, ঘেমে উঠছে। ধীরে ধীরে তারা একসময় এসে দাঁড়ালো পাগল ফোরির সেই গাছগুলোর কাছে। গাছগুলোর ঠিক নীচে, সিরুভবানীর দিকে যাবার পথের ওপরে একটা ছোট্ট অথচ নতুন ধরনের ঘর উঠেছে। পাথরের দেয়াল ঘেরা চৌকো ঘর, ওপরে সাদা মানুষদের মাণ্ডে যে-ধরনের বাড়ি কিছু কিছু দেখা যায়, সেই রকম লাল টালি বসানো ঢালু ছাদ। ছাদের মাথায় একটি ক্রশ-চিহ্ন। তার পাশেই আবার একটা ছোট ঘর, তবে সে ঘরটা তাদেরই মতো খড়-ছাওয়া। পাগল ফোরির সেই যে সাদা মানুষ বন্ধু ছিল একটি, ফোরি মারা যাবার পর সেই বন্ধুটি এসে এখানে ঘর বেঁধে বাস করছে। লোকটি লম্বা জামা পরে, কখনো ধবধবে সাদা, কখনো ঘোর কালো। লোকে ওকে 'পাদরী' বলে ডাকে, ও-ই সবাইকে ওভাবে ডাকতে শিখিয়েছে। পাদরী মানুষটি ভালো, মুখে তার হাসি সব সময় লেগে আছে, তাদের টোডা ভাষা বেশ রপ্ত করেছে এতদিনে। লোকজন দেখলেই আলাপ করে, বলে—এসো না ঘরে। কাফি খেয়ে যাও।

ক্রশ-চিহ্ন দেওয়া ঘরের ভিতরে তাদের টিয়েক্‌জ্রি দেবীর বেদীর মতোই বেদী, সেখানে প্রদীপ জ্বলে সর্বক্ষণ, প্রদীপের আলোয় দেখা যায় পাগল ফোরির কাছে যে ছোট্ট মূর্তিটি থাকতো সেটি শোভা

পাচ্ছে। তাদের মাগু থেকে কেউ যায়নি, কিন্তু দূর-দূর থেকে অন্য মাগুের কেউ কেউ এসে পাদরীর ধর্ম নিয়েছে শোনা যায়। তারা টিয়েক্‌জ্রিকে মানতে চায় না, 'পীরজ'-ও মানে না, তাদের নতুন দেবতা হয়েছে। পীরজকে বলে তারা যীশু, টিয়েক্‌জ্রিকে বলে, মেরী। এমন কি, শোনা যায়, তাদের মেয়েদের কেউ কেউ বিয়ে পর্যন্ত করেছে সাদা মানুষদের।

পাদরী গাছের নতুন চারা লাগাচ্ছিল। ইতিমধ্যে অর্থাৎ এই আঠারো বছরে তাদের উপত্যকার এদিকে-ওদিকে নতুন ধরণের গাছ ডালপালা মেলে বড়ো হয়েছে। তাদের নিজস্ব যে সব ঝাউগাছ ছিল, সে সব ঝাউয়ের এক শ্রেণীকে সাদা মানুষরা খুব পছন্দ করে নাম দিয়েছে 'সিলভার ওক'। পাদরী যে-চারাটা রোপণ করছিল, সেটা কিন্তু সিলভার ওক নয়, ইউক্যালিপ্‌টাস্‌। ইউক্যালিপ্‌টাস্‌ কথাটাও ততদিনে শিখে ফেলেছে ওরা, তাদের উপত্যকার বহু জায়গায় এই আঠারো বছরে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে ইউক্যালিপ্‌টাসের সারি।

পাদরী ওদের দেখে উঠে দাঁড়ালো, হাসলো মাথাটা নুইয়ে, তারপরে বললে— যাচ্ছো কোথায়?

সুঞ্জা উত্তর দিলো—ঐ বনের দিকে।

পাদরী এবার স্পষ্টই হেসে উঠলো, বললে—'মধুদিবস' যাপন করতে বুঝি?

লজ্জায় আরক্ত হয়ে উঠলো পিলুবাণীর মুখ, হাতটা সে ছাড়িয়ে নিতে গেল, কিন্তু সুঞ্জা ছাড়লো না, শক্ত করে ধরে রইলো, তারপর ইতস্ততঃ করে পাদরীর কথার উত্তরে বললে—না, মানে—

পাদরী কৃত্রিম গাম্ভীর্যে বলে উঠলো—'পেকি উর্‌স্‌ইয়োটি, নে উস্‌ট্‌ উব্‌স্‌ট্‌।'

একেবারে সাবলীল টোডা ভাষা, যার অর্থ—সত্য বলবে, মিথ্যা কথা নয়।

এবারে সলজ্জ হাসি ফুটলো সুঞ্জার মুখে, তার শ্মশ্রুগুম্ফমণ্ডিত

মুখমণ্ডলও আরক্ত হয়ে উঠলো। পাদরী হো-হো করে হাসতে হাসতে সরে গেলো একদিকে।

দূর থেকে ওদের উৎসব-সংগীতের রেশ তখনো ভেসে আসছে, এতক্ষণে সুরের লয় একটু দ্রুত হয়েছে। ওরা কিছুটা এগিয়ে গিয়েও ফিরে দাঁড়ালো। ফোরির সেই গাছগুলোর ডালপালায় হাওয়া জেগেছে, ফোরির আত্মা যেন অস্ফুট কণ্ঠে ডাকছে—আয়, একবার কাছে আয়, তোদের একটু দেখি ভালো করে।

পায়ে পায়ে ওরা এসে আবার দাঁড়ালো ফোরির তরুকুঞ্জে। গাছগুলোয় ফোরি যে দাগ কাটতো, এতদিনে সে সব কিছু কিছু মিলিয়ে গেছে, একটা গাছের নীচে গভীর একটা দাগ, সেটা সব থেকে শেষে রেখায়িত হয়েছিল বলে আজও তেমনি আছে, বিবর্ণ হয়ে যায়নি।

ফোরির বয়সও হয়েছিল যথেষ্ট, শেষ বয়সে ঠাণ্ডা লেগে জ্বর হলো, সবাই বুঝলো, অন্তিম অবস্থা ওর। পাগল একসময় সবার অলক্ষ্যে ঘর থেকে উঠে চলে আসে তার প্রিয় তরুবীথিকায়, একটা গাছের নীচে বসে বসে দাগ কাটতে থাকে। কিছুক্ষণ পরে সবাই খুঁজতে খুঁজতে এসে দেখে গাছটার তলায় ফোরির নিষ্প্রাণ দেহটা পড়ে আছে, হাতে তার গাছে দাগ কাটবার ছোট্ট ছেনি। নিজের দাগ নিজেই কেটে দিয়ে স্বস্তিতে শেষ নিশ্বাস ফেলে গেছে ফোরি।

সুঞ্জার মনটা স্বাভাবিকভাবেই ভারী হয়ে আসে, সে ছেড়ে দেয় পিলুবাণীর হাত। কিন্তু পরক্ষণেই চমকে ওঠে সে ভিতরে ভিতরে। সে আজ প্রৌঢ়, আর কতোদিনই বা সে বাঁচবে, তাদের জাতের লোকেরা কেন কে জানে বেশীদিন বাঁচেও না। কোন্‌দিন ফোরির মতো তারও বুকে ঠাণ্ডা জমবে, সেও মারা যাবে। কিন্তু, তার আগে—

তার আগে জীবনটা সে নিশ্চয়ই জেনে যাবে। টুরা নেই, কিন্তু টুরার মেয়ে আছে, হুবহু টুরার প্রতিমূর্তি। আঠারো বছর ধরে দেবতার কাছে সে কাটিয়েছে, কিন্তু একদিনের জন্যও সে কি ভুলতে পেরেছে টুরাকে? মন্দিরের সংলগ্ন তার ঘরে শুয়ে কতো রাত যে

তার ছটফট করে কেটেছে তার হিসাব কে রাখবে? সবাই তাকে পূজারী বলে সম্মান জানিয়েছে, আর সে রাতের বেলা পূজারীর মুখোশটা ছিন্নভিন্ন করে দেবার প্রয়াস করেছে। কিন্তু, দিনের আলো ফোটবার সঙ্গে সঙ্গে আবার ধীর হয়ে এসেছে তার মন, আবার নিস্তেজ হয়ে পড়েছে। এমনি করে দিনের পর দিন। রাত্রে সে এক-একদিন উন্মাদ হয়ে গেছে। পুটকলী ছুঁড়ে ফেলেছে, কাপড় খুলে দিয়েছে, নিজের নিরাবরণ দানব দেহটাকে লক্ষ্য করেছে নানান ভাবে। কী চায়, কী চায় এই দানবটা? কাকে ছিঁড়েকুটে খেতে চায়?

বছরের পর বছর গেছে, আর সংকল্প তত দৃঢ় হয়েছে। গেন্না—? না। টুরা—? না। তারপরে টুরার মৃত্যুসংবাদ যখন শুনলো, তখন গেন্নার সঙ্গে সঙ্গে আর একটা নাম তার মনের মধ্যে কেটে কেটে বসে যেতে লাগলো—পিলুবাণী। তাকে সে দেখতে পায় না, গেন্নাকেও না। কিন্তু রাতের বেলা গেন্নার মুখ সে কল্পনা করে, আর টুরার চেনা মুখখানা বসায় বালিকা পিলুবাণীর মুখের ওপর। ক্রমে ক্রমে পিলুবাণী বড়ো হলো। তরুণী পিলুবাণীকে সে যে দূর থেকে লুকিয়ে দেখেনি এমন নয়, কিন্তু না দেখলেও বোধ হয় পিলুর চেহারা সে হুবহু বর্ণনা করতে পারতো। তার কল্পনা একেবারে বাস্তব রূপ নিয়েছে। পিলু হয়ে দাঁড়িয়েছে একেবারে টুরা।

লোকে জানে, গেন্নাকেই সে বউ করবে, অজিতই হবে তার ছেলে। শুধু ছেলে কেন, তার পরবর্তী পেললই হবে অজিত। কিন্তু আঠারো বছরের কৃচ্ছ্রসাধনা কি বৃথাই যাবে? তোমাদেরি শর্ত, আমি যা চাইবো তা-ই দিতে হবে, যাকে চাইবো তাকেই দিতে হবে। না বিষ্ণু, না, আমি গেন্নাকে নেবো না, আমি নেবো পিলুবাণীকে। দেখি প্রাণে ধরে কেমন করে তাকে তুমি দিতে পারো আমার হাতে? ও পিলু নয়, ও তো টুরা, যাকে আমি চিরকাল মনে মনে কামনা করে এসেছি।

মিলেছে আজ তার পুরস্কার। পিলুর হাতখানা শক্ত করে চেপে

ধরে সে এবার দ্রুতপায়ে এগিয়ে চলে বনের দিকে। সিলভার ওক আর সাধারণ ঝাউয়ের আড়ালে ঝোপের পাশে শ্যামলীর তৃণ-বিছানো ভূমিশয্যায় ওকে নিয়ে বসলো সুঞ্জা। আজ তার একচ্ছত্র অধিকার এই সুন্দরী তরুণীটির ওপরে, ওর হাত সে হাতে নিতে পারে, ওকে জড়িয়ে ধরতে পারে, ওর স্ফুরিত ওষ্ঠাধরে চুম্বন এঁকে দিতে পারে।

এক ঝটকায় ওকে কাছে টানতেই ওর বুকে এলিয়ে পড়লো পিলুবাণী। কুমারী-কৌতূহলে মুহূর্তে সে আত্মহারাও হয়ে গেল। তার ঠোঁটে-গালে-কপালে-চোখের পাতায় ঘন ঘন চুম্বনের বিদ্যুৎ ঝলসে উঠতে লাগলো, সমস্ত শরীর নিঃঝুম হয়ে এলো, শিথিল হয়ে গেল সমস্ত বাধা-নিষেধের আবরণ।

ঘাসের শয্যায় সে শুয়ে আছে, তার পুট্‌কলীটা খুলে নিলো সুঞ্জা, তার পরনের কাপড়টিও যায় যায়—হঠাৎ সে তখন সংবিৎ ফিরে পেলো। ভয়ার্ত হরিণীর মতোই উঠে বসে পালাতে গেল। পরণের কাপড়টা ঠিকঠাক করে নিয়ে পুট্‌কলীটা গায়ে জড়ালো। সুঞ্জাও দাঁড়িয়েছে ততক্ষণে, হাত বাড়িয়ে আবার আকর্ষণ করতে লাগলো ওর পুট্‌কলীটা, জোর করে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে দূরে ছিটকে সরে গেল পিলু। বললে—না না।

সুঞ্জার ধৈর্য আর সীমা মানতে চায় না, সে নিষ্ঠুর ব্যাধের মতোই ধাবিত হলো হরিণীর দিকে। যখন ছুটোছুটির পর ওকে গিয়ে ধরলো, তখন সুঞ্জা দ্বিগ্বিদিকজ্ঞানশূন্য বলা যেতে পারে। জোর করে ওর গায়ের চাদর কেড়ে নিলো, জোর করে নীবিবন্ধ শিথিল করে দিলো। নিরাবরণ হয়েও পিলুবাণী আত্মরক্ষার চেষ্টা করতে লাগলো। বললে—না না, তোমার ছুটি পায়ে পড়ি।

—ভয় কিসের? আমার বউ না?

—তা হোক। আমাকে ছেড়ে দাও।

বলতে বলতে কেঁদে উঠলো পিলু, ওর পায়ের কাছে জড়পিণ্ডের মতো বসে পড়লো। আর ঠিক সেই সময় সুঞ্জার ইচ্ছা করছিল ওকে

প্রচণ্ড এক লাথি দিয়ে নীচের পাহাড়ে গড়িয়ে দিতে। চুরমার হয়ে যাক ও, ওর সুন্দর দেহটা কেটেকুটে ছারখার হয়ে যাক।

পিলু ওর পায়ে মাথা কুটে বলতে লাগলো—আমার কাপড় দাও। কেউ যদি দেখে ফেলে?

—কে দেখবে! চারিদিকে ওক গাছ পাহারা দিচ্ছে।

—কেউ যদি এসে পড়ে?

—আসবে না।

পিলু তখনো কাঁদছে—আমার কাপড়খানা দাও।

নীচু হয়ে চুলের মুঠি ধরে ওকে নিজের কাছে টেনে আনলো সুঞ্জা। বললে—আঠারো বছর লোকালয়ের মুখ দেখিনি, শুধু দেবতা-দেবতা করে কাটিয়েছি, সে কি এজন্য?

পিলু তখনো ওকে বাধা দিচ্ছে, আর্তকণ্ঠে বলছে—না না, আমার যদি মেয়ে হয়! তাকে তোমরা মেরে ফেলবে। সে আমি সইবো না। না না।

ওকে ছেড়ে দিয়ে শক্ত হয়ে উঠে দাঁড়ায় সুঞ্জা, ওর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকে, ছুঁড়ে দেয় ওর দিকে ওর কাপড় আর চাদর। তার তখন মনে হচ্ছিল, বুকের ভিতরটাতে যেন মোষ-মারা ভারী মুগুরের ঘা পড়ছে একের পর এক! সে যতদিন পেলল ছিল ততদিন কারুর কোনো অঘটন ঘটেনি সন্তান-সংক্রান্ত, কিন্তু আজ সে সংসারী হতে চলেছে, আজ যদি আবার ও-ধরণের কিছু ঘটে? যদি তার ঔরসে পিলুবাণীর গর্ভের অন্ধকারে তিল তিল করে বেড়ে উঠতে চায় কোনো শিশুকন্যা?

মুহূর্তে ফিরে দাঁড়ায় পিলুবাণীর দিকে। পিলুবাণী ততক্ষণে কোমরে তার কাপড়টা জড়িয়ে নিয়েছে, এবার উঠিয়ে নিচ্ছে তার পুটকলীটা। অতি সুন্দর সুপুষ্ট দেহসৌষ্ঠব পিলুবাণীর—এ-দেহ কোনো সন্তানকে উপত্যকার বুকে আনবে না টেনে?

দ্রুত এগিয়ে গেল সে পিলুর দিকে। পিলুর চোখের দৃষ্টিতে আবার জেগে উঠলো শঙ্কার কালো ছায়া।

সুঞ্জা বলে—আর যদি ছেলে হয়?

মুখখানা সঙ্গে সঙ্গে নামিয়ে নেয় পিলুবাণী, কিছু বলে না।

সুঞ্জা এগিয়ে এসে ওর দুই কাঁধে দুটি হাত রাখে, প্রশ্ন করে—আজই সোমত্ত হয়ে ওঠোনি, এতদিন বিস্থুর কাছে ছিলে, ছেলেও হয়নি মেয়েও হয়নি, তবে এখন ভয় পাচ্ছো কেন?

দর্পিণীর মতো মুখখানা তুললো পিলুবাণী, ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলতে লাগলো, বললে—বিস্থু তোমার মতো নয়, সে আমাকে চিরকাল মেয়ের মতো দেখে এসেছে। ও-কথা মুখে আনতে তোমার লজ্জা করলো না?

সুঞ্জা অবাক হলো, বললে—তবে লোকে বলে কেন? বিস্থুর মুখের সামনেই বলে। বিস্থু চুপ করে থাকে কেন?

পিলু বললে—বুঝতে পারো না? লোকে বদনাম দিয়েছে, সেই বদনাম আমাকে রক্ষা করেছে অন্যসব পশুদের হাত থেকে। বিস্থু নিয়ামের একজন, সেইজন্য ওর বউ যে হবে, তার দিকে চোখ দেবে কে? তুমি যদি পেলল হয়ে আমাকে না চাইতে তাহলে আমি বেঁচে যেতাম, চিরকাল থাকতুম কুমারী। তুমি জানো না, সন্তান-ধারণে আমার কতো ভয়! আমি দিনরাত স্বপ্ন দেখি, জল থেকে উঠে এসে আমার মা আমার চারিদিকে কেঁদে কেঁদে বেড়াচ্ছে, আর জোর বাতাসের মতো সোঁ-সোঁ সুরে বলছে, আমি তোর কোলে আসবো, বিস্থুর কাছে যা। ঐ যে পাশের ঘরে দশাসই মানুষটা ঘুমিয়ে আছে, ওকে জাগিয়ে তোল, মাতিয়ে তোল, নিজের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করে নে। আমি কতদিন ঘুম ভেঙে মাঝরাতে বেড়া ডিঙিয়ে বিস্থুর কাছে চলে গেছি, কিন্তু ওকে জাগাবো কী, ভয় পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে ফিরে এসেছি। কাঁদতে কাঁদতে মাকে বলেছি, মা, তুমি এলে তোমাকে কি আমি বাঁচিয়ে রাখতে পারবো? তোমাকে ওরা নিয়ে যাবে মুকেতি

পাহাড়ে, গেন্নার মেয়ের মতো তাকে দেবতার হাতে তুলে দিয়ে আসবে।

বলতে বলতে চোখে জল এসে পড়ে পিলুবাণীর, সে দুটি হাতে মুখ ঢাকে। সুঞ্জা ওকে ছেড়ে ধীর পায়ে অন্য একটা ওক গাছের ছায়ায় এসে দাঁড়ায়। ছায়া ক্রমে গভীর নিবিড় হয়ে ওঠে। কতো সময় পার হয়ে যায় কে জানে, চমক ভেঙে পিছন ফিরে দেখে অন্য একটা গাছের ছায়ায় চুপচাপ বসে আছে পিলুবাণী।

আস্তে আস্তে ওর কাছে যায় সুঞ্জা, বসে পড়ে, তার একটা হাত টেনে নেয় নিজের হাতের মধ্যে, পিলু বাধা দেয় না।

সুঞ্জা ফিসফিস করা সুরে বলে—সন্ধ্যা হয়ে আসছে কিন্তু।

মুখ তুলে তাকায় পিলু। বলে—উঠবো ?

—ওঠো। কিন্তু, তার আগে একটা কথা বলি ?

—কী ?

সুঞ্জা বলে—বিম্বুর কাছে তোমাকে ফিরিয়ে দেবো ?

পিলু উত্তর দেয়—তাতে লাভ ?

—লাভ জানি না, লোকসানই বা কী ?

পিলু বলে—আমাকে তবে চাইলে কেন ?

সুঞ্জা বললে—পছন্দ হলো বলে।

—এখনই বা অপছন্দ কেন ?

সুঞ্জা বিস্ময়ের সুরে বলে উঠলো—আমার অপছন্দ ত নয়, তোমার অপছন্দ।

পিলু বলে—না, আমি তা বলিনি। আমার ভয় শুধু একটা বিষয়ে।

সুঞ্জা চুপ করে রইলো। পিলু বললে—আচ্ছা, আমি একটা কথা বলবো ?

—বলো।

পিলু বললে—বিম্বু যেমন কাছাকাছি থেকেও আমাকে ছোঁয়নি, তুমিও কি তা পারো না ?

—কিন্তু কেন? আমি তোমার স্বামী না?

পিলু বললে—ছোঁবে না কেন? কিন্তু আমাকে মা হতে বাধ্য করো না।

সুঞ্জা সোজা হয়ে বসলো, বললে—এ প্রতিজ্ঞা করা কি সহজ?

—প্রতিজ্ঞা করতে বলছি না,—পিলু বললে—আমাকে রক্ষা করতে বলছি। তুমি আঠারো বছর সন্ন্যাসী ছিলে, তোমার পক্ষেই এটা পারা সহজ।

—ভুল কথা।

পিলু বললে—ভুল নয়, পারলে এক তুমিই পারো। নইলে তোমার কথা যখন শুনলাম, শুনলাম যখন এত মেয়ের মধ্যে আমাকেই তুমি বেছে নিয়েছো, তখন এক-কথাতেই আমি রাজী হয়ে তোমার ঘরে চলে আসতাম না। কী, পারবে না?

সুঞ্জা উঠে দাঁড়ালো, বললে—সন্ধ্যা হলো, এবার ঘরে ফেরো।

—কিন্তু, আমার কথার উত্তর?

সুঞ্জা বললে—ও-কথার উত্তর হয় না। পাশে যখন সুন্দরী বউ শুয়ে আছে তখন কেউই বলতে পারে না কে কী ধরনের আচরণ করে বসবে!

পিলুবাণী ওর চোখের দিকে তাকিয়ে মুখখানা নত করে, তারপরে আর কথা না বলে চুপচাপ চলতে থাকে ওর পাশাপাশি।

ওদের উৎসব শেষ হয়, নিয়াম বা পঞ্চায়েতের নির্দেশে যে যার গাঁয়ে ফিরে যায়। যাবার আগে স্থির করে যায়, হিন্দু পণ্ডিত আর গেন্নার সন্তান অজিতই হবে তাদের মন্দিরের পূজারী। আঠারো বছরের কৃচ্ছ্রসাধনা নয় সুঞ্জার মতো, সপ্তাহের তিনটি পবিত্র দিন, অর্থাৎ রবিবার, বুধবার ও শুক্রবার বাদ দিয়ে আর সব দিন সে কিছুটা স্বাধীনতা ভোগ করবে, মায়ের সঙ্গে দেখা করবে, ইত্যাদি। নইলে মন্দির ছেড়ে যাবার উপায় তার রইলো না, এমন কি মন্দিরের

মধ্যেই চলবে তার রান্নাবান্না। বিস্নু প্রধান হলেও নিজের মতটা বিশেষ খাটাতে চায় না। না হয় ত অনেক কিছুর বিরুদ্ধেই তার মন বিদ্রোহ করে উঠতে চায়। রাজা মারা যাবার পর অন্য কারুর রাজা হওয়া উচিত ছিল, রাজার ছেলে ছিল, মেয়েও ছিল। কিন্তু, অনেক বুদ্ধি খাটিয়ে রাজার বদলে সে 'পঞ্চায়েৎ' বা 'নিয়াম' সৃষ্টি করেছে। একে রক্ষা করতে হলে ধৈর্য চাই, স্থৈর্য চাই, সবাইকে মানিয়ে নিয়েই চলতে হবে, একার মত ধরলে আবার কোনো রাজার অভ্যুত্থান ঘটবার সম্ভাবনা।

সেও একটা কারণ। আরেকটা কারণ, টোডাদের আজ সমূহ বিপদ। বাদাগারা শেষ পর্যন্ত সভা করে খাজনা না দেওয়াই স্থির করেছে। এর ফলে টোডাদের নিশ্চিন্ত জীবন, যাযাবর মানসিকতা—দুই-ই বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়ে দাঁড়ালো। ওদিকে জংলী ইরুলারা সাদা মানুষদের সঙ্গে মিশে তাদের ধর্ম গ্রহণ করছে, কিংবা হিন্দুদের সঙ্গে নতুন ভাবে যোগাযোগ স্থাপন করে হিন্দুদের ধর্মকেই শ্রদ্ধার সঙ্গে অবলম্বন করছে। ইরুলাদের গাঁয়ে মন্দির পর্যন্ত তৈরি করেছে ওরা, নাম দিয়েছে রঙ্গস্বামীর মন্দির।

আর একটা জাত আছে, তাদের বলে কোটা। হাঁড়িকুড়ি দরকার হলে তাদের কাছ থেকেই কিনতে হয়। সিক্কা টাকা সহজেই পাওয়া যায় না, যেটুকু পাওয়া যায় ওরা তা জমিয়ে রাখবার চেষ্টা করে। সাধারণতঃ জিনিসের বদলে জিনিস কেনাই ওদের রীতি। এমনি এক কোটা মানুষের কাছে তাদের গাঁয়ে গিয়েছিল একজন টোডা মানুষ। এ-মানুষটি সুঞ্জা বিস্নুদের গাঁয়ের কেউ নয়, অন্য দিককার লোক।

কোটা মানুষটি চাক বসিয়ে মাটির ভাঁড় তৈরি করছে। তার সেই ঘূর্ণায়মান চক্রের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়েছিলো টোডা মানুষটি। কোটা বললে—হ্যাঁ হে, সাদা মানুষদের গাঁয়ে তোমাদের জাতের লোকও দেখি ঘোরাঘুরি করছে কাজকর্মের জন্য।

টোডা বললে—উপায় কী? বাদাগারা জমির খাজনা দেবে না। আমরা আর পয়সাকড়ি পাবো না।

কোটা হাসলো, বললে—কী দরকার বাপু তোদের পয়সাকড়িতে? সিক্কা টাকা দিয়ে ত মেয়েদের গয়না গড়িয়ে রাখিস। কাজে আর লাগে কতটুকু? এমনি মাখন নিয়ে আসবি, আমরা হাঁড়ি দেবো, কলসী দেবো, ভাঁড় দেবো, ব্যস্।

—আর, চাল?

—কেন, বাদাগারা চাল দেবে না?

—দেবে। খাজনা হিসাবে দেবে না। জিনিসের বদলে দেবে।

—তবে আর ভাবনা কী?

টোডা অবাক হয়ে বললে—ভাবনা নেই? কতো জিনিসই বা আমরা দিতে পারবো? আমরা গরীব হয়ে পড়ছি। এরই মধ্যে কত লোক চাল না খেয়ে কাটাচ্ছে, তা জানিস?

কোটা বললে—বাদাগাদের সঙ্গে তোদের লড়াইটা লাগলই বা কেন?

টোডা বসলো এবার, তারপরে যেন কত নিগূঢ় কথা বলছে এমনি ভঙ্গিমায় ফিসফিস করে বলতে শুরু করলো—বাদাগাদের এক সর্দার আছে, রাখাল তার নাম। একটা ছোট টোডা মেয়েকে সে নাকি দশ-সিক্কায় কিনেছিল। পরে, টাকা ফেরত দিয়ে মেয়েকে নিয়ে গিয়েছিল মেয়ের মা। কিন্তু আমাদের জাতের মধ্যে 'কথা দেওয়া' ব্যাপারটা কতো সাংঘাতিক তা জানিস ত? তাই ঠিক হয় যে, মেয়েটা বড়ো হলে রাখালের ঘরে ওরা পৌঁছে দিয়ে যাবে।

—মেয়েটা বুঝি বড়ো হয়েছে?

—অনেকদিন।

—তাহলে দেয়নি কেন?

টোডা বললো—নিজের জাতের মেয়েকে টোডারা অন্য জাতের কাছে প্রাণ গেলেও দিতে চাইবে না।

কোটা হেসে উঠলো, তাচ্ছিল্যের সুরে বললে—খুব বললি! তা-ও যদি নিজের চোখে না দেখতাম! কতো মেয়ে সাদা মানুষদের সঙ্গে ভাব করছে! তাদের একটা একটা বাচ্চাকাচ্চাকে দেখিস না? সাদা সাদা রঙ, নাক-চোখও তোদের মতো ঠিক নয়।

টোডা মানুষটি মাথা হেঁট করে বসে থাকে। যেখানে সমগ্র 'জাতি' নিয়ে ব্যাপার সেখানে এ-ধরনের দুটো-একটা ঘটনাও ওদের কাছে বেদনা আর লজ্জার কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

কোটা বললে—মেয়েটাকে দিলেই ব্যাপারটা মিটে যাবে? আবার ওরা খাজনা দেবে তোদের?

টোডা উত্তর দিলে—এখন আর তা হবে না। এখন সব বাদাগারাই একজোট হয়েছে, তারা সাদা মানুষদের খাজনা দেবে দরকার হলে, আমাদের দেবে না। আর, মেয়েটাকে দেবার কথা বলছো? তারও উপায় নেই। মেয়েটাকে ওরা ওদের পুরুতকে দিয়ে দিয়েছে।

কোটা বললে—কোন্ পুরুত? ঐ যে আঠারো বছর যে লোকটা—

—হ্যাঁ, সুঞ্জা।

কোটা বললে—সে ত এখন প্রায় বুড়ো। আমি তার সঙ্গে একদিন কথাবার্তা বলতে গিয়েছিলাম তাদের মন্দিরে। তখনো মেয়েটাকে বউ করে পেললগিরি সে ছাড়েনি। বললে একটা অদ্ভুত কথা। হ্যাঁ রে, তোরা নাকি রাবণের বংশধর? রামের তাড়া খেয়ে এই পাহাড়ে এসে আশ্রয় নিয়েছিল নাকি তোদের পূর্বপুরুষ?

টোডা বললে—তা হবে। তবে আমরা জানতাম মুকের্তি পাহাড়ে উঠে যতোদূর চোখ যায়, সেই সবটা এলাকা আমাদের। সেখানে আর কেউ থাকতে পারবে না। আমরা ঘর করে থাকবো আর মোষ চরাবো। বাদাগারা এলো চাষ করতে, আমরা দেখলাম, ওরা ধান বুনবে, তাতে আমাদেরই লাভ। মাঠের ধান থেকে কিছু চাল

আমাদের দেবে, এই শর্তে বাদাগাদের আমরা জমি দিয়েছিলাম। কিন্তু কোথায় গেল সেই নড়চড়-না-হওয়া কথা?

কোটা পুরুষটি চোখ পিটপিট করে বললে—লড়াই-টড়াই বাধবে নাকি?

—বলা যায় না। সুঞ্জাদের মাণ্ডে যে বিষ্ণু সর্দার আছে, সে ক্ষেপে গেলে আর রক্ষে নেই!

কোটা বললে—তোরা ক্ষেপবি? তাহলেই হয়েছে। নইলে এককথায় তোদের পার্থ-কাই রাজা সাদা মানুষদের মাণ্ড ছেড়ে দিয়ে চলে আসে? দেখ গিয়ে, কী কাণ্ড ওখানে করে তুলেছে সাদা মানুষেরা! সুন্দর সুন্দর বাড়ি আর রাস্তা। দোকানঘর, ফোয়ারা, ঘোড়ায় টানা গাড়ি—সে এক ভীষণ কাণ্ড!

সুঞ্জার নতুন ঘরে কিন্তু ওদিকে এক অদ্ভুত লীলা শুরু হয়েছে। পিলু সুঞ্জার সঙ্গে ঘর করছে ঠিকই, কিন্তু কিছুতেই ধরা দিচ্ছে না ওর কাছে। বাইরের কেউ টের পায় না, কিন্তু সুঞ্জা জানে কী নিষ্ঠুর প্রহরগুলো রাত্রে নেমে আসে তার সমস্ত মানসিক শান্তি রাক্ষসের মতো ছিনিয়ে নিতে! দিনের পর দিন কেটে যায়, মাসের পর মাস, সুঞ্জার মাথার সমস্ত চুল দেখতে দেখতে সাদা হয়ে গেল। [টোডাদের চুলে পাক ধরে অনেক আগে থেকে। পঞ্চাশ বছরের মানুষকে দেখায় সত্তর বছরের বৃদ্ধ। এর কারণ কি কোনো বিশেষ জাতীয় ভাইটামিনের অভাব? কে জানে!]

সুঞ্জা মিনতি করে, কাঁদে পর্যন্ত। পিলু তবু রাজী হয় না। বলে—আমাকে তুমি মেরে ফেলো, আমি তা পারবো না।

—মেয়েই যে হবে তার কি মানে আছে?

—মেয়েই হবে। আমার মা আসবে আমার পেটে।

সুঞ্জার পরিশ্রম বেড়েছে। মোষ নিয়ে বাইরে যাওয়া, তাকে চরানো। ফিরে এলে তার দুধ দোওয়া। তারপর সেই দুধ জ্বাল

দিয়ে মাখন তৈরি করা, এসব হচ্ছে পুরুষদের কাজ। সারা দিনমান এসব কাজ করে রাতে বউয়ের সঙ্গে বসে বসে গল্প করে। কথায়-কথায় রোজই উঠে পড়ে পিলুর মায়ের কথা। ও পিলুকে কাছে টেনে নেয়। অন্ধকার ঘর, সেই অন্ধকারে নিজেকে মিলিয়ে দেয় পিলু। সব আদর-আপ্যায়নই তার ভালো লাগে, কিন্তু একটা সময় কী যে হয় তার মধ্যে, তার সমস্ত দেহটা যেন শক্ত হয়ে ওঠে, আর তারপরে একটা ঘোর শঙ্কা তার মেরুদণ্ডের অন্তরালে হিমস্রোতের মতো আনাগোনা করতে থাকে। সজোরে সে ছিটকে দেয় সুঞ্জাকে, বলে—না না, আমি পারবো না।

সুঞ্জা রাগ করে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। বাইরে জ্যোৎস্না যেন রাশি রাশি সাদা ফুলের মতো ফুটে আছে। ঠাণ্ডা হাওয়া যেন মোটা চাদর ভেদ করেও তীরের মতো বিঁধে যায় দেহের মধ্যে। ইউক্যালিপটাস্ আর ঝাউয়ের দল স্বপ্ন দেখতে দেখতে হঠাৎ বুঝি কেঁপে ওঠে, ঝিরঝির ঝিরঝির মৃদু একটা ধ্বনির গুঞ্জন জেগে উঠতে থাকে পাতায় পাতায়।

একটা পাথরের ওপরে চুপচাপ বসে থাকে সুঞ্জা। দূরে, টিলার আড়ালে, একটা বড়ো সিলভার ওকের ছায়ায় বিন্দুর মতো দেখায় বিম্বুর ঘরখানা। এত যে পরিবর্তনের স্রোত বয়ে গেল তাদের উপত্যকায়, বিম্বু কিন্তু তার সেই সাবেক ঘর ছেড়ে গাঁয়ের কাছে চলে এলো না। আজকাল সে এত চুপচাপ, এত গম্ভীর হয়ে গেছে যে, কথা বলতে পর্যন্ত ভয় করে, নইলে এই মুহূর্তে ছুটে গিয়ে তাকে সে বলে উঠতো—এ তুমি কাকে দিয়েছো আমার হাতে? আমার আঠারো বছরের বন্দী-জীবনের পর আমার কি প্রাপ্য ছিল এই পুরস্কার? এ তো মালা নয়, শিকল হয়ে জড়িয়ে আছে আমার সর্বাঙ্গে!

কতো মুহূর্ত কেটে যায় কে জানে, মাথার ওপরে আকাশের বুকে কতো হালকা মেঘের ভেলা ভেসে যায় কে জানে, হঠাৎ চকিত হয়ে ওঠে সুঞ্জা। মনে হয় ইউক্যালিপ্‌টাসের ঝরা পাতার ওপর

সন্তর্পণে পা ফেলে কে যেন তার কাছাকাছি এসে দাঁড়িয়েছে! অন্ধকার তরুবীথিকার কুঞ্জে পাণ্ডুর জ্যোৎস্না অদ্ভুত একটা আলোছায়ার সৃষ্টি করেছে। সেই আলোছায়ার মায়াজাল ঠেলে তার কাছে এসে পড়লো যেন একটা ছায়াশরীর, গা-ছমছম-করা একটা আচমকা ভীতি তাকে যেন হাত ধরে উঠিয়ে দেয়, শুষ্ক চাপা গলায় সে বলে ওঠে—কে!

একেবারে কাছ ঘেঁষে দাঁড়ায় সেই মূর্তি, মোটা চাদরে সর্বাঙ্গ ঢাকা, ঘাড় পর্যন্ত নেমে আসা কৃষ্ণ কুঞ্চিত কেশরাশি অনেকগুলো বেণীতে ভাগ করা। মুখটা একটু তুলে, বাঁ গালের ওপর এসে পড়া একগোছা চুল ঝাঁকি দিয়ে সরিয়ে সে বলে উঠলো—কতক্ষণ বাইরে থাকবে? চলো।

পিলুবাণী। রাতের অন্ধকারে টোডা মেয়েরা বিপদ-আপদ না হলে কখনো বাইরে আসে না। আসলে নানান উপদেবতা ভর করতে পারেন বলে ওরা বিশ্বাস করে। সে সমস্ত সংস্কার জয় করে টুরার মেয়ে কী দুঃসাহসেই না বনবীথি পার হয়ে তার কাছে এসে দাঁড়ালো!

সুঞ্জা মনে মনে চমৎকৃত হলেও মুখে তা প্রকাশ করে না। সে ওর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। আরও একটু কাছ ঘেঁষে আসে পিলু, ওর হাত টেনে নেয় নিজের কোমল হাতের মধ্যে, বলে—রাগ করেছো?

সুঞ্জা উত্তর দেয় না।

পিলু মনে মনে কী যেন ভেবে নেয়, তারপরে কণ্ঠে জোর এনে বলে ওঠে—বেশ, তোমার যা ইচ্ছে তাই করো। মাত্র একটা কথা তোমাকে বলবো। যদি পেটে সন্তান আসে, আমি আমার মায়ের মতো সিরুভবানীর জলে ডুবে মরবো।

ওর দিকে ফিরে তাকায় সুঞ্জা। কী একটা কঠোর কথা বলতে গিয়েও বলতে পারে না, চারিদিকের মৃদু ইউক্যালিপ্‌টাস্ পাতার

গন্ধ, মৃদু জ্যোৎনার আলোছায়া, সব মিলিয়ে সত্যিই বিহ্বল হয়ে পড়ে সুঞ্জা। ওকে সে দু হাতে আকর্ষণ করে নিজের বুকের মধ্যে টেনে নেয়, তারপরে একটু পরেই ছেড়ে দিয়ে বলে ওঠে—চলো, ঘরেই চলো।

ঘরে সব-কিছুর জন্য প্রস্তুত হয়েও পিলু শেষ পর্যন্ত আত্মদান করতে পারে না। তার দেহটা অবিশ্বাস্যরূপে শক্ত হয়ে আসে, সে দু হাতে সুঞ্জাকে ঠেলে ফেলে দেয় দূরে। আর তারপরেই উঠে দাঁড়ায়। কাপড় আর চাদরটা তাড়াতাড়ি পরে নেয়, সুঞ্জা এসে চট্ করে ওর হাত ধরে, পশুর মতো চাপা গর্জন করে বলতে থাকে—খুন করে ফেলবো।

বাইরে তখন দুটো-একটা পাখী ডেকে উঠছে, রাত্রিশেষের দিকে। পিলু ওর হাত ছাড়িয়ে পালাতে গেল, কিন্তু কোথায় যাবে? মোষ চরাবার ছোট্ট পাঁচনবাড়িটা খুঁজে নিয়ে সুঞ্জা উন্মাদের মতো ছুটতে থাকে ওর পিছনে পিছনে। একসময় ওকে ধরেও ফেলে। পিলু ততক্ষণে টিলার নীচে নেমে এসেছে। ডানদিকে কিছুদূর গেলে ফোরির সেই তরুকুঞ্জ। সেদিকে পা দেবার আগেই ওর পায়ে পাঁচনের বাড়ি মারে সুঞ্জা। প্রচণ্ড ব্যথা পেয়ে ও ককিয়ে ওঠে, কিন্তু সুঞ্জার মাথায় তখন খুন চেপে গেছে। সে ওকে এলোপাথাড়ি প্রহার করতে থাকে। পিলু তারস্বরে চীৎকার করে ওঠে।

কাছেই ছিল সেই সাদা মানুষ পাদরীর বাড়ি। তিনি ঘুম থেকে চমকে উঠে বসেন। তারপরে দরজা খুলে বেরিয়ে আসেন রাস্তার ওপরে। কিন্তু, হায় জীসাস, একটা মেয়েকে মাটিতে ফেলে ওভাবে ছড়ি দিয়ে মারতে পারে কেউ? বিশেষ করে টোডারা, যারা কিনা মারামারি কাকে বলে সচরাচর জানে না?

—স্টপ্, ইট্!—বলে তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে লোকটার হাত থেকে ছড়ি কেড়ে নেন তিনি।

লোকটা তখন দিগ্বিদিকজ্ঞানশূন্য। তীব্রস্বরে বলে ওঠে—এ আমার

বউ, অন্য কারুর না। আমি ওকে মারি, ধরি, যা-ই করি, তোমার তাতে কী ?

পাদরী এগিয়ে এসে ওর বুকে হাত রেখে প্রচণ্ড একটা ধাক্কা দেন, বলেন—পালাও, নইলে তোমাকে পিটবো। ছি ছি, লজ্জা করে না মেয়েদের গায়ে হাত তুলতে! বউ! বউ বলে কি মেয়েছেলে নয়! ক্রুট্ কোথাকার।

সুঞ্জা উঠে দাঁড়ায় বটে, কিন্তু রাগে ফুলতে থাকে। বলে—দাঁড়াও, ওকে আগে শায়েস্তা করি, তারপরে তোমাকে দেখে নিচ্ছি। তুমি কত বড়ো পাদরী, আমি তা দেখে নেবো। তোমার মন্দিরে আমি আগুন লাগিয়ে দেবো। এই পিলু, উঠে আয়।

—না।—বলে উঠে দাঁড়ায় পিলু। কপালের কাছটা তার কেটে গিয়েছিল। হাত দিয়ে চোখের ওপরে-এসে-পড়া রক্তের ধারা মুছে ফেলতে ফেলতে পিলু বলে উঠলো—তোর ঘরে আমি কখনো যাবো না। আমি পাদরী-বাবার ঘরেই যাবো। আমি পাদরী-বাবার মন্দিরে পূজো করবো।

বলতে বলতে পাদরীর হাত শক্ত করে ধরে পিলু, বলে—চলে এসো।

তারপরে পাদরী ওকে নিয়ে সত্যিই চলতে শুরু করলেন দেখে সুঞ্জা আর থাকতে পারলো না, চীৎকার করে বলে উঠলো—পিলু! ফিরে আয়।

—না।

—ফিরে আয় বলছি।

—না।

—ভালো হবে না। আমি নিয়াম-এর সভা ডাকবো। বিচার হবে।

—যা খুশি তাই কর। আমি তোর কাছে কিছুতেই যাবো না।

সুজা চীৎকার করে বলতে থাকে—পাদরী, তুমি ওকে দিয়ে দাও। আমাদের কথায় তুমি থেকো না। ভালো হবে না বলছি।

পাদরী ওর কথা কানেও তোলেন না, পিলুকে নিয়ে গিয়ে তোলেন একেবারে নিজের ঘরে, তারপরে দরজাটা বন্ধ করে দেন। মেয়েটার কপাল কেটে রক্ত পড়ছে ঝরঝর করে। ছি ছি! লোকটা মানুষ, না কি? মাই গড, মেয়েটার এখুনি চিকিৎসা করার দরকার। মেয়েটা আর দাঁড়াতে পারছে না, তার ঘরের মেঝের ওপরে এলিয়ে পড়লো যে!

—এই, ওঠ ওঠ। কী হয়েছে?

কিন্তু কে শুনবে তাঁর কথা? সম্বিত হারিয়ে লুটিয়ে পড়েছে মেয়েটা তাঁর পায়ের কাছে, কপালের পাশ থেকে টপটপ করে রক্ত ঝরার তখনো বিরাম নেই।

ভোর হবার সঙ্গে সঙ্গেই অন্য দিন জেগে ওঠে বিষ্ণু। ঘর খুলে চোখে মুখে জল দিয়ে প্রথমেই চলে যায় গাঁয়ের দিকে, গোয়াল বা টু-এল্-এর দিকে। রাজা মরে গেল, নিয়াম তৈরী হলো, আর সঙ্গে সঙ্গে এই নিয়ম প্রতিষ্ঠিত হলো—নিজস্ব গোয়াল আর কারুর থাকবে না। গাঁয়ের মধ্যে সবাই একজোট হয়ে একটা বড়ো চালাঘর বানালো, সেইখানে থাকবে সবার সব মোষ। এই সার্বজনীন টু-এল্-এর ছুটো ভাগ, একটাতে মোষ থাকবে বাঁধা, অন্যটাতে বাছুরগুলো। ভোরে উঠে সবাই চলে আসবে টু-এল্-এ, যার যার মোষ নিয়ে দুধ দুইয়ে নেবে, তারপরে বাছুরগুলোকে ছেড়ে দেওয়া হবে। বাকী দুধ বাছুররা খাওয়ার পর মোষগুলোকে তাড়িয়ে নিয়ে যেতে হবে বিভিন্ন দিকে, চারণভূমিতে।

আজ কিন্তু সময়মতো ঘুম ভাঙে নি বিষ্ণুর। সে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে অদ্ভুত এক স্বপ্ন দেখছিলো তখন। দেখছিলো, দূর-পাহাড়-থেকে-নেমে-আসা সিরুভবানী নদীর জল সমস্ত শুকিয়ে গেছে আগাগোড়া, শুধু

তারা কেন, বাদাগা-ইরুলা-কুরুম্বাদের মধ্যে পর্যন্ত হাহাকার পড়ে গেছে, কোথাও এক ফোঁটা জল নেই! এমন কি মুকের্তি পাহাড়ের ঝরণার জল পর্যন্ত শুকিয়ে গেছে! মেয়েরা দলে দলে জল আনতে যাচ্ছে ঝরণা থেকে, কিন্তু শূন্য কলসী নিয়ে ফিরে আসছে কাঁদতে কাঁদতে। তাদের মধ্য থেকে একটি বুড়ী বেরিয়ে এলো, চুলগুলো তার সাদা। তাকে দেখে যেন চমকে উঠলো বিম্বু, বললে—এ কী! টুরা!

বুড়ী অবাক হয়ে বললে—আমি টুরা হবো কেন? চিনতে পারছো না? আমি টুরার মেয়ে—পিলুবাণী। কিন্তু তুমি কোথায় ছিলে এতকাল? তোমাকে গাঁয়ে দেখিনি যে!

স্বপ্নেই যেন চমকে উঠলো বিম্বু। গাঁয়ে না থেকে কোথায় সে ছিলো তাহলে? পিলুর চুল সাদা হলে তার নিজের বয়স কতো? নিজের দিকে তাকাতে গিয়ে নিজেকে আর যেন দেখতেই পাচ্ছে না বিম্বু। এ কী অস্বস্তি! আমি আছি, আমার চিন্তা আছে, আমার সব আছে—অথচ আমি নেই?

হঠাৎ যেন আকাশে কড়কড় করে ডেকে উঠলো বজ্র। মেঘ নেই অথচ বাজ পড়লো কাছেই কোথাও। সব যেন চোখের সামনে থেকে মিলিয়ে যাচ্ছে—শুষ্ক সিরুভবানী, ঝরণা আর পিলুবাণী। যেদিকে তাকাও, নিশ্ছিদ্র অন্ধকার। তার মধ্যে শুধু সেই বজ্রপতনের প্রবল হুংকার।

—বিম্বু—বিম্বু!

কে যেন তার নাম ধরে ডাকছে। কে যেন তাকে খুঁজে বার করবার চেষ্টা করছে। মনে হলো, এবার ঘোর অন্ধকারও যেন ক্রমশঃ স্বচ্ছ হয়ে আসছে।

—বিম্বু—বিম্বু!

এবার যেন একেবারে কানের কাছে। হঠাৎ ধড়মড় করে জেগে উঠলো বিম্বু। কোথায় সিরুভবানী, কোথায় বৃদ্ধা পিলুবাণী, আর

কোথায় কে! তার ঘরের দরজার বাইরে থেকে কে যেন ক্রমাগত তাকে ডেকে চলেছে—বিম্বু—বিম্বু!

বিম্বু এগিয়ে গেল দরজার দিকে, খুললো আগড়। তারপরে চমকে উঠে বললে—কে? সুঞ্জা? কী ব্যাপার? ভোরবেলায় এমন করে ডাকাডাকি করছিস কী জন্য?

সুঞ্জা বললে—তাড়াতাড়ি বেরিয়ে আয়। সাংঘাতিক ব্যাপার ঘটে গেছে।

—কী ব্যাপার?

সুঞ্জা বললে—পিলুবাণীকে পাদরীসাহেব ধরে নিয়ে গেছে।

—বলছিস কী!

মুহূর্তে বন্য মহিষের মতো ভয়ংকর হয়ে ওঠে বিম্বু, ছুটে গিয়ে ঘরে ঢোকে, লোহার ডাণ্ডাটা বার করে আনে, তারপরে দিগ্বিদিকজ্ঞানশূন্য হয়ে দৌড়তে শুরু করে পাদরী-নিবাসের দিকে।

সুঞ্জা ওদিকে কিছুক্ষণ স্থাণুর মতো দাঁড়িয়ে থাকে। তার নিজের হাত-পায়ের ওপর যেন তার নিজেরই কোনো প্রভুত্ব নেই, নইলে সেও কেন তখুনি ছুটলো না বিম্বুর পিছনে পিছনে! মনে হলো, তার কণ্ঠস্বর পর্যন্ত বুঝি তার নির্দেশ শুনতে প্রস্তুত নয়। নইলে তার মুখ থেকে হঠাৎ অমন কথাটা বার হবে কেন—'পিলুবাণীকে পাদরীসাহেব ধরে নিয়ে গেছে!'

কথাটা তার নিজের কানে গিয়ে নিজেকেই অস্থির করে তুলতে লাগলো। মন্দিরের পেলল থাকার সময়েই তার প্রচণ্ড রাগ ছিল পাদরীসাহেবটার ওপরে। তাদের জাতের সব লোক মন্দিরে এসে পড়বে, এটাই ত ছিল তার অন্তরের একান্ত অভিলাষ। কিন্তু দিনের পর দিন ধরে সে শুনেছে, অনেক লোক মন্দিরে না এসে পাদরী-সাহেবের আস্তানায় গিয়ে উপস্থিত হচ্ছে। তখন যতো সে এ সব কথা শুনতো তত তার রাগ হতো। আজ সে আর পেলল নেই, আজ তার জীবনের সমস্যা ভিন্ন দিকে এসে কেন্দ্রীভূত হয়েছে, তবু

অসতর্ক মুহূর্তে সেই পুরাতন ক্ষোভ আর ক্রোধই বুঝি এমন করে হঠাৎ রূপ পরিগ্রহ করে বসলো। তা না হলে হঠাৎ এ মিথ্যে কথাটা সে বলে ফেলবে কেন—'পিলুবাণীকে পাদরীসাহেব ধরে নিয়ে গেছে!'

ছুটলো না সুঞ্জা, চলার গতিটুকু একটু দ্রুত করলো মাত্র। তারপরে ঢেউতোলা পথ পার পয়ে, ইউক্যালিপ্টাসের সারি পেরিয়ে পৌঁছলো গিয়ে পাদরীসাহেবের বাড়ি। কিন্তু কোথায় বিম্বু? পাদরীর বাড়ি নিঃঝুম হয়ে আছে, দরজাটাও বন্ধ। সে ডেকে উঠলো—বিম্বু!

দু-তিন বার ডাকাডাকি করার পরই সাড়া মিললো। দরজাটা হঠাৎ খুলে গেল। বেরিয়ে এলো বিম্বু, হাতে সেই লোহার ডাণ্ডাটা। আর ঠিক তার পিছনে সেই পাদরীসাহেব।

বিম্বু তার দিকে বন্য একটা মহিষের মতোই তেড়ে এলো, বললে—তোর মাথাটা এবার গুঁড়িয়ে দি। মিথ্যেবাদী কোথাকার! করেছিস কী? পাদরীসাহেব ওর কপালের রক্ত বন্ধ করেছে বটে, কিন্তু ওর বাঁ হাতটা? কনুইয়ের কাছটা ফুলে উঠেছে, ব্যথায় নাড়তে পারছে না। এখন ওকে যদি বাঁচাতে হয়, তাহলে নিয়ে যেতে হবে সেই 'উটাকলমাণ্ডে', সাদা মানুষদের কাছে।

ওকে নিরুত্তর দেখে পাদরীসাহেব বলে উঠলেন—মেয়েটা যদি না বাঁচে, তাহলে সাহেবরা তোকে ফাঁসি দেবে। ফাঁসি কাকে বলে জানিস?

সুঞ্জা নির্বোধের মতো তখনো তাকিয়ে আছে লক্ষ্য করে বিম্বু বললে—একটা গাছে তোকে ঝুলিয়ে দেবে গলায় ফাঁস লাগিয়ে। দম বন্ধ হয়ে তুই মারা যাবি।

আতঙ্কে আর্তনাদ করে ওঠে সুঞ্জা, বিম্বু এগিয়ে যায় ওর কাছে, লোহার ডাণ্ডাটা আন্দোলিত করে বলে ওঠে—যা, ভাগ শীগগির! মিথ্যেবাদী! তোর মুখ দেখলে পাপ।

পালিয়ে বেশী দূর অবশ্য যায় না সুঞ্জা, ইউক্যালিপ্টাস্

গাছগুলোর আড়ালে গিয়ে চুপচাপ বসে থাকে। বেলা বাড়তে থাকে, পাহাড়ের ঢেউয়ে-ঢেউয়ে, রেখায়-রেখায়, চূড়ায়-চূড়ায় ছড়িয়ে পড়ে সূর্যের আলো, সর্বোচ্চ শৈলশিখর দোদাবেতা দেখা দেয় সুস্পষ্ট হয়ে। আর সবিস্ময়ে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে থাকে সুঞ্জা, ওদের জাতে কেউ মরলে যেমন করে ছুটো বাঁশে দোলা বেঁধে মৃতদেহকে ওরা শ্মশানে নিয়ে যায়, ঠিক তেমনিভাবে সামনে-পিছনে তুটি বাঁশের তুটি হাতলে হাত রেখে বিম্বু আর পাদরীসাহেব পিলুবাণীকে নিয়ে চলেছে উটাকলমাণ্ডে। গাঁয়ের পথ ওরা ধরলো না, ওরা নীচে নামতে লাগলো বাদাগাদের গাঁয়ের দিকে, সেদিক থেকে একটা পাকদণ্ডী পথ আছে, চড়াই ভেঙে অল্প সময়ে চলে যাওয়া যায় উটাকলমাণ্ডে।

পিলু কি মরে গেছে?—না। তাহলে ত ওরা ওকে সিরুভবানীর তীরে শ্মশানেই নিয়ে যেতো। গাছের আড়ালে আড়ালে ছায়ার মতো ওদের অনুসরণ করতে লাগলো সুঞ্জা। বাদাগাদের গ্রাম পার হয়ে পাকদণ্ডী পথটা পর্যন্ত এলো, কিন্তু আর উঠলো না। বুনো ঝোপ আর ঝাউয়ের আড়ালে ওরা মিলিয়ে যেতেই সুঞ্জা পিছনে সরতে লাগলো। বাদাগারা কেউ দেখতে পায়নি ত? না, তারা ওকে বোধ হয় দেখতে পায়নি, তারা অবাক হয়ে পাদরী-বিম্বু-পিলুবাণীকেই লক্ষ্য করছে।

ধড়াস-ধড়াস-করা বুক নিয়ে গাঁয়ে ফিরে এলো সুঞ্জা। যদি সত্যিই পিলুবাণী মরে যায়? তাহলে সাদা মানুষরা এসে কি তাকে ধরবে? সাদা মানুষরা সব পারে, যদি এসে তাকে নিয়ে গাছের ডালে ঝুলিয়ে দেয়, দম বন্ধ করে তাকে যদি মেরে ফেলে?

একটা অসাধারণ আতঙ্ক হিংস্র জন্তুর মতো তাকে তাড়া করে বেঁড়াতে লাগলো। ছুটতে ছুটতে সে গেল টিয়েকৃজ্রির মন্দিরে। অজিত তখনো পর্যন্ত ঠিক পেলল হয়নি, তবে সাধারণ পূজারী হয়েছে। সে বসে ছিল দরজার কাছে। ওর ভাবভঙ্গী দেখে বলে উঠলো—কী হয়েছে?

—না, কিছু না।

—চোখ-মুখের অমন ভাব কেন ?

ধমকে উঠলো সুঞ্জা, বললে—চুপ কর। আমার কিছু হয়নি।

মুখে বললো বটে কিন্তু স্থির হয়ে বসতে পারলো না। আবার উঠে দাঁড়ালো। আকাশে তখন সূর্য পাহাড়ের চূড়া ছাড়িয়ে অনেকটা উঠে পড়েছে। দূরে দূরে মোষগুলো চরছে তাদের। যে যার কাজ নিয়ে ব্যস্ত। সে ভিন্ন পথ ধরলো। চললো জঙ্গলের দিকে। বুনো কুরুম্বাদের কাছে পালিয়ে যাবে ? তারা জাদু জানে, যদি পিলুকে কোন রকমে বাঁচিয়ে দেয় !

যেই ভাবা সেই কাজ। ছুটতে ছুটতে অনেকক্ষণ পরে কুরুম্বারা জঙ্গল থেকে বেরিয়ে যে-পথে যাতায়াত করে সেইখানে এসে দাঁড়ালো। হাঁপাতে লাগলো প্রচণ্ড রকম। একটুক্ষণ জিরিয়ে নেবার পরই দূর থেকে দেখতে পেলো জঙ্গল থেকে একটি কুরুম্বা উঠে আসছে। বেঁটে কালো চেহারা, কোমরে সামান্য একটা কাপড়ের ফালি ছাড়া আর কিছু নেই, মাথায় কোঁকড়া-কোঁকড়া শক্ত-শক্ত চুল, হাতে ধারালো টাঙ্গি বা কুঠার জাতীয় কোনো অস্ত্র।

লোকটি ওকে দেখে থমকে দাঁড়িয়েছিল। সুঞ্জা হাত তুলে ডাকলো। ওদের ভাষা এরা জানে না, কাজ চালিয়ে নেবার মতো দুটো একটা কথা শিখে রাখে মাত্র। সেই স্বল্প-সঞ্চিত শব্দ-ভাণ্ডারের সাহায্যেই সুঞ্জা ওকে ব্যাপারটা বোঝাতে চেষ্টা করতে লাগলো। লোকটি বললে—না না, সাদা মানুষদের কাছে আমাদের মন্তরতন্তর খাটবে না।

—কিন্তু, আমাদের পিলু ত আর সাদা মানুষ নয় !

সে বললে—তা হোক, সাদা মানুষ তাকে ছুঁয়েছে ত ? আর কোনো মন্তর খাটবে না।

লোকটি কুরুম্বাদের একজন সর্দারগোছের লোক। তাকে আগেও দেখেছে সুঞ্জা। শুধু এ লোকটি কেন, এদের প্রায় সবারই প্রচণ্ড

জেদ আছে। যদি কোনো-কিছুতে 'না' বলে, ত 'হ্যাঁ' করায় কার সাধ্য!

লোকটি ওকে ছাড়িয়ে ততক্ষণে হনহন করে এগিয়ে গেছে। হঠাৎ থেমে, মুখ ফিরিয়ে বললে—হাতটা ফুলে গেছে বলছিলে না? হাতটা নাড়তে পারছে না?

—হ্যাঁ।

লোকটি ওর দিকে কয়েক পা এগিয়ে এলো, বললে—ভাবনা নেই, বাড়ি যাও, ও মেয়ে আর বাঁচবে না।

ধ্বক করে উঠলো বুকের ভিতরটা। বাঁচবে না!

বনের পথ ছাড়িয়ে আবার ওপরের দিকে উঠে আসতে লাগলো সুঞ্জা। তাদের গাঁ থেকে ছুটতে ছুটতে এই যে কুরুম্বাদের জঙ্গলে এসে পৌঁছেছিল সে, এতে সময়টা কম যায়নি। চোখ তুলে আকাশের দিকে তাকালে দেখা যায় সূর্য প্রায় মাথার ওপরে উঠে এসেছে। ছুটে চলবার তাগিদে সময় আর দূরত্ব কোনো দিকেই মন রাখতে পারেনি সে। এখন ফিরে যেতে যেতে মনে হচ্ছে, তাদের গাঁ বহুদূরে, সে গিয়ে পৌঁছতে পৌঁছতে হয়ত সূর্য পশ্চিম পাহাড়ের আড়ালে লুকিয়ে পড়বে, আর সে গিয়ে শুনবে সাদা মানুষরা তাকে হিংস্র পশুর মতো খুঁজে বেড়াচ্ছে, হয়ত গাছের ডালে তাকে ঝুলিয়ে দেবে। সন্ধ্যা নামবে, আর সঙ্গে সঙ্গে তার চোখের সামনে থেকে নিভে যাবে সব আলো, সব রঙ। দোদাবেতার চূড়ায় ঝলসে ওঠা সূর্যের প্রথম আলো আর সে কোনোদিন তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে পাবে না।

ভাবতে ভাবতে গলার কাছটা শুকিয়ে এলো সুঞ্জার। এতক্ষণে তার চেতনা হলো, সারাদিন সে কিছু খায়নি। সারা শরীর তার অবসন্নতায় আচ্ছন্ন হয়ে গেল।

কোনক্রমে নিজের দেহটাকে টানতে টানতে সে এসে উপস্থিত হলো বাদাগাদের গাঁয়ে। গাঁয়ের কাছাকাছি একটা ফালি জমিতে কাজ করছিল জনকয়েক বাদাগা স্ত্রী-পুরুষ, ওকে দেখে তারা ছুটে

এলো। ও মুখ তুলে তাকালো তাদের দিকে, বললে—আমাকে চেনো?

একটি আধাবয়সী মানুষ বললে—তুমি ত সকালবেলা ছুটে গেলে এখান দিয়ে। রাখাল কতো ডাকলো, শুনলে না। তা কী হলো, বুনো মোষ ধরতে পারলে না?

—মোষ ধরতে যাইনি।—সুঞ্জা বললে—রাখাল কোথায়?

একজন আঙুল দিয়ে দেখালো—ঐ পিছনের মাঠে কাজ করছে।

অপর একজন গালের কাছে হাত রেখে কী-এক অদ্ভুত সুরে ডেকে উঠলো—এ-হে-হে-হু-হু-হু!

সাড়া এলো পরক্ষণেই—হে-হু-হু-হু!

আধাবয়সী মানুষটি বললে—রাখাল শুনতে পেয়েছে। এখুনি আসবে।

দূর থেকে একটা কৃষ্ণ বিন্দু ছুটে আসছে দেখা গেল সত্যিই। বিন্দু ক্রমশঃ বড়ো হলো। তারপরে একটা রেখায় পরিণত হলো। সেই রেখা দাঁড়ালো একটি মানুষে। হাঁপাতে হাঁপাতে সে এসে বললে—কী ব্যাপার?

—আমি সুঞ্জা।

সুঞ্জাকে ভালো করে লক্ষ্য করলো রাখাল, তারপরে বললে—কী ব্যাপার?

—অনেক কথা আছে তোর সঙ্গে।

রাখাল আকাশের দিকে তাকালো, বললে—সূয্যি প্রায় মাথার ওপর। ঠিক আছে, আয়, আমার ঘরে আয়।—তারপরে অন্য একটি লোকের দিকে ফিরে বললে—মাঠে মোষ রইলো, দেখিস।

কখনো কুরুম্বা কখনো-বা টোডাদের কাছ থেকে মোষ কিনে নেয় ওরা। ওরা লাঙল চষে মোষ দিয়ে, গরু নয়। গরু এসেছিল অনেক পরে, তখন টোডাদের গাঁয়ে অনেক পরিবর্তন এসেছে, তখন সুঞ্জা বিম্মুও নেই, পিলুবাণীও নেই, টোডাদের ঐ গাঁও নেই, ওখানে ঐ

পাদরীসাহেবের বাড়িটা আরও ভালো হয়েছে, বড়ো হয়েছে, চারিদিকে সাদা মানুষদের বাড়ি, তারা তখন টোডা গাঁয়ের নতুন এক নামকরণ পর্যন্ত করেছে।

কিন্তু থাক সেসব কথা। রাখালের বাড়িতে ভাত খেয়ে সুস্থ বোধ করলো সুঞ্জা, গাছের ছায়ায় ঘাসের ওপর একটু গড়িয়েও নিলো। শুয়ে শুয়েই সে সব কথা বলতে লাগলো রাখালকে। রাখাল চিন্তিত মন নিয়েই ওর কথা শুনছিল আর হুঁ-হুঁ করে সায় দিয়ে চলেছিল।

সুঞ্জা থামতেই সে বললে—পিলু না বাঁচাই সম্ভব। মিথ্যে জিনিস কি সয়? বিষ্ণু আমাকে কথা দিয়েছিল, পিলুকে আমায় দেবে। দেয়নি। এখন তার ফল ভোগ করতে হবে না?

সুঞ্জা উঠে বসলো, বললে—কিন্তু ও না বাঁচলে আমার যে ফাঁসি হবে।

—হোক, আর কী করা যায়!

সুঞ্জা বললে—তোরা কিছু করবি না?

—কী করবো?—রাখাল বললে—সাদা মানুষদের দেখলেই ভয় করে, ওদের কাছে ঘেঁষবে কে?

সুঞ্জা বললে—আচ্ছা ধর, যদি ও বেঁচে ওঠে?

রাখাল বললে—বেঁচে যদি ওঠেই তাহলে ওকে কি আর ফিরে পাবি ভেবেছিস? সাদা মানুষরা নিজেদের কাছেই রেখে দেবে।

—কেন?

রাখাল বললে—উটাকলমাণ্ডে ঘুরতে গেছিস কখনো? সাদা মানুষগুলো ভালো লোক নয়। মানুষ দেখলেই ধরে নেয়। বেটা-ছেলেদের দিয়ে কাজ করায়, আর কাঁচাবয়সী মেয়ে পেলেই জোর করে ধরে নিয়ে গিয়ে বউ করে। ইরুলাদের কতো মেয়ে গেছে জানিস? আমাদেরও গেছে। তোদেরও গেছে।

—না না, আমাদের যায়নি।

—গেছে।—রাখাল বলে—তোদের গাঁ থেকে যায়নি, কিন্তু অন্য

গাঁ থেকে গেছে। খোঁজ রাখিস আর কতটুকু? আঠারো বছর ত মন্দিরের ভিতরেই কাটালি।

ভারাক্রান্ত মন নিয়েই বাদাগাদের গাঁ থেকে ফিরে আসে সুঞ্জা। নিজের ফাঁসির কথা আর তত ভাবছে না এখন, ভাবছে পিলুর কথা। ও ত দেখতে সুন্দর, কাঁচাবয়সের মেয়ে, যদি ওকে কোনো সাদা মানুষ জোর করে ধরে রেখে দেয় বউ করবার জন্য? বিম্বু একা আছে, একা আর সে কতটুকু রুখতে পারবে?

ভাবনার গতির সঙ্গে চলার গতিও দ্রুত হয় সুঞ্জার। সে ভাবে, গাঁয়ের সবাইকে ডেকে সে জড়ো করবে, তারপরে যার কাছে যা আছে তাই নিয়ে ছুটবে উটাকলমাণ্ডে। তার বউকে সে উদ্ধার করে আনবে। যে বাধা দিতে আসবে তার আর রক্ষা নেই। মোষ-মারা মুগুর দিয়ে শেষ করে দিতে হবে তাকে।

গাঁয়ে পেঁ ৗছে কিন্তু যে-দৃশ্য দেখলো সুঞ্জা তাতে তার বিস্ময় আর সীমারেখা মানলো না। সমস্ত মানুষ জড়ো হয়েছে একজায়গায়, ভিন গাঁ থেকে পর্যন্ত লোক এসেছে। পিলুবাণীকে নিয়ে গেছে উটাকলমাণ্ডে পাদরীসাহেব, বিম্বু তাকে সাহায্য করেছে। তাদের নিজেদের জাতের মধ্যে এর বউ তার কাছে বাঁধা থাক ক্ষতি নেই, কিন্তু অপর জাতের কাছে টোডা মেয়ে কেউ গেছে শুনলেই এরা ক্ষেপে ওঠে। সুঞ্জা তাকিয়ে দেখলো বিম্বু নেই, কিন্তু নিয়াম-এর আর সবাই আছে, বাদাগাদের সর্দার উপস্থিত ছিল না অবশ্য।

ওকে দেখে সবাই উঠে দাঁড়িয়েছিল, উত্তেজিত কণ্ঠে বলেছিল—গিয়েছিলি কোথায়? তোর বউকে যে ধরে নিয়ে গেছে! সঙ্গে বিম্বু।

ও একটু হেসে বললে—তবে আর ভয় কী?

এক বুড়ো অমনি চেঁচিয়ে উঠলো—না না, তাকে আর বিশ্বাস নেই। নইলে নিয়াম না ডেকে, আমাদের সঙ্গে পরামর্শ না করে সে মেয়েটাকে নিয়ে যেতে দেয় কেন পাদরীসাহেবকে?

সুঞ্জার চোখ দুটো হিংস্রতায় জ্বলজ্বল করে ওঠে, মনের মধ্যে

বিষাক্ত কোনো সরীসৃপ যেন মাথা তুলে দাঁড়ায়। সে বলে—তোমরা দেখেছো কেউ ?

বুড়োরা বলে—না, আমরা দেখিনি, কিন্তু মেয়েরা কেউ কেউ দেখেছে। মেয়েটা শুয়ে আছে, তাকে খাটিয়ার মতো একটা কিছুতে করে নিয়ে চলেছে বিম্বু আর পাদরীসাহেব।

—কেন ?

ওরা বললে—কী করে জানবো ?

সুঞ্জা বাঁকা হাসলো, বললে—বিম্বুকে আমরা জানি, সে যখন সঙ্গে আছে তখন অতো ভাবনা করছো কেন তোমরা ?

একজন গাঁও-বুড়ো বললে—বিম্বুকে বিশ্বাস নেই। বুনো মোষ ধরা মানুষ, ওর স্বভাবও বুনো মোষের মতো।

সুঞ্জা বললে—কিন্তু ও ছাড়া বুনো মোষ ধরতেই বা পারে কে ?

বুড়োরা তারস্বরে বললে—এখন আর সে-কথাটা খাটে না। ও-ই দুটি ছেলেকে শাগরেদ করে গেছে। কই রে, কোথা গেলি ? নোম্বর !

বলশালী দীর্ঘদেহ একটি তরুণ এসে দাঁড়ালো, হাতে তার মোষ-মারা মুগুর।

এক বুড়ো বললে—আমার ছেলে। বিম্বুর শাগরেদী করে বিলক্ষণ মোষ ধরা শিখে গেছে। ও ছাড়া আরও একজন আছে। কই, ইরুল !

এ ছেলেটিও তরুণ, দেখতে একটু রোগা-রোগা, কিন্তু চোখ দুটিতে চাতুর্য যেন অনুক্ষণ ঠিকরে পড়ছে।

বুড়ো বললে—এ-ও বিম্বুর শাগরেদ। কম ওস্তাদ নয়।

ওদের দুটিকে ভালো করে দেখে নিয়ে সুঞ্জা বললে—তার মানে, বিম্বু আজ মারা গেলে আমাদের কোনো ক্ষতি নেই, কেমন ?

বুড়োরা বললে—মারা যাবার কথা হচ্ছে না। তবে, বিম্বু না হলেও আমাদের চলে যাবে। সে যদি উটাকলমাণ্ডে সাদা মানুষদের চাকর হয়ে গিয়ে তো হোক, আমাদের কিছু আসে যায় না।

—সে নিয়াম-এর একজন না ?

বুড়োরা বিন্থুর ওপর চিরদিনই একটু বিদ্বেষভাবাপন্ন, এটা সে জানতো। কিন্তু নিয়াম করবার পরও তাকে যে ভিতরে ভিতরে এরা এতখানি ঈর্ষার চোখে দেখে এটা তার জানা ছিল না। আজ একটা উপলক্ষ্য পেয়ে সেই ঈর্ষার গোপন অগ্নিশিখা সব সখ্যতা আর হৃদ্যতাকে দাউ দাউ করে পুড়িয়ে ফেলেছে। তারা সব তারস্বরে চেঁচিয়ে উঠলো—না, সে কেউ না।

সুঞ্জাও চেঁচিয়ে উঠলো এইবার, বললে—তাহলে তোমরা সব যাবে ? তোমাদেরই গাঁয়ের মেয়েকে সাদা মানুষরা জোর করে ধরে নিয়ে গেছে, তাদের কাছ থেকে ছিনিয়ে আনবে মেয়েটাকে ?

সমবেত কণ্ঠে ধ্বনিত হলো—হ্যাঁ, ছিনিয়েই আনবো।

কিছুদিন ধরেই সাদা মানুষদের বিরুদ্ধে একটা প্রবল উত্তেজনা সারা টোডাপল্লীতে বহ্নিবিস্তার করছিল। দু'চারটি মেয়ে পালিয়ে গিয়েছিল উটাকলমাণ্ডে। এসব কারণে এদের বিভিন্ন পল্লীতে ক্রমশঃই জটলা আর উত্তেজনা বেড়েই চলেছিল, আজ অনুকূল বায়ুভরে তা দাবাগ্নিতে পর্যবসিত হলো বলা চলে।

এদের থামাতে পারতো সুঞ্জা যদি সত্যি কথাটা সে বলতে পারতো। যদি বলতো, আমিই পিলুকে মারতে মারতে ঘর থেকে বার করে দিয়েছি, সাহেব তা দেখতে পেয়ে নিজের ঘরে নিয়ে যায় ওকে। বিন্থুকে ডেকে আনে সুঞ্জাই নিজে। পিলুর হাত ফুলে ওঠায় ওরা দুজনে ওকে ধরাধরি করে উটাকলমাণ্ডে নিয়ে গেছে বাঁচিয়ে তোলবার আশায়।

কিন্তু সুঞ্জা তা বলতে পারলো না। ঈর্ষা আর প্রাণের ভয় তাকে ভিন্ন এক মানুষ করে তুলেছে। এ মানুষ শয়তান, এ মানুষের কোনো দয়া নেই, মায়া নেই, এ-মানুষ বনে-বিচরণ-করা ক্ষিপ্ত জানোয়ারের মতো।

শুধু বৃদ্ধ, প্রৌঢ়, যুবকই নয়, বর্ষীয়সী মেয়েরাও ছিল দলে।

বাঁশের লাঠি, পাঁচনবাড়ি, মুগুর, যে যা পেয়েছে সঙ্গে নিয়েছে। যে-গ্রামে তারা এককালে বাস করতো, যে-গ্রাম তাদের রাজা পার্থ-কাই একদিন সাদা মানুষদের হাতে তুলে দিয়েছিল, সেই গ্রামের পথে আবার তারা পা দিলো বহুদিন পরে। সাদা মানুষদের প্রতি প্রচণ্ড ভীতিও ছিল ওদের, কিন্তু আজ ওদের মুখের দিকে তাকালে দেখা যাবে ভয়ের কোনো চিহ্নই সেখানে নেই। ওরা ক্ষেপে গিয়ে সঙ্ঘবদ্ধভাবে কাউকে আক্রমণ করেছে, এ বড়ো দেখা যায় না। শান্তিপ্রিয়, নিরীহ জাতি ওরা। কিন্তু কতকগুলি ক্ষেত্র আছে, সেখানে ওরা উত্তেজিত হয়ে ওঠে সহজেই। পিলুবাণীকে নিয়ে মিথ্যা রটনাটা না ঘটলে ওদের এ-চেহারা কেউ কোনোদিন দেখতে পেতো কিনা সন্দেহ!

ছোট্ট একটা বাড় নিয়ে হাসপাতাল তৈরী হয়েছিল তখন উটকামণ্ডে। এখন যেটা 'চেয়ারিং ক্রশ' রাস্তা, তার আরম্ভের মুখেই ছিল টালির ছাদ-দেওয়া হাসপাতাল-বাড়িটা। সেখানে একটা ঘরে পিলুবাণীকে রাখা হয়েছে। বিস্থু সারা দিনমান ডাক্তারের ঘরের দাওয়ায় কাটিয়েছে, ডাক্তারসাহেব তাকে আসতে দেননি। পাদরী-সাহেবও সঙ্গে রয়েছেন সব সময়। বলেছেন, পিলুর জ্ঞান ফিরে আসুক। কপালের রক্ত বন্ধ হয়েছে, ওটা এমন কিছু নয়, কিন্তু হাতটা ভেঙে গেছে। ওটার হাড় জোড়া লাগাতে হবে, তবেই সে বাঁচতে পারে।

বিস্থু অবাক হয়ে সব-কিছু দেখছিল। তাদের সেই পুরানো মাণ্ড আজ একেবারে বদলে গেছে। কতো সুন্দর সুন্দর রাস্তা, কতো বাড়ি! আর, কতো বাগান! ছোট ছোট গাছ আর অজস্র রঙ-বেরঙের ফুল! দুপুর পার হবার পর দুজন সাহেব এলেন ডাক্তার-সাহেবের কাছে। ডাক্তার, পাদরী আর সেই দুজন সাহেব মিলে তাকে দেখে দেখে কী-সব কথা বলাবলি করতে লাগলেন। একজন

এসে তার মাথাটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখলেন। তারপরে একসময় সবাই উঠে চলে গেলেন হাসপাতালের ঘরে, পিলুকে দেখতে। সঙ্গে তাকেও ডেকে নিয়েছিলেন পাদরীসাহেব। পিলু উঁচু একটা খাটিয়ায় শুয়ে আছে, সাদা চাদরে ঢাকা, অঘোরে ঘুমুচ্ছে, বাঁ হাতখানা কাপড়ে মোড়া, সেটা বুকের ওপর পড়ে আছে, গলার সঙ্গে আরেকটা কাপড় দিয়ে বাঁধা।

পিলুর কপালে হাত দিয়ে, মাথাটা ছুঁয়ে সাদা মানুষরা কী সব বলাবলি করতে লাগলেন কে জানে! তার বুকের ভিতরটা কেমন যেন মোচড় দিয়ে উঠছে—পিলু বাঁচবে ত?

সাহেবরা কিন্তু আলোচনা করছিলেন অন্য বিষয়ে। নবাগত সাহেব দুজন নৃতত্ত্ববিৎ। তাঁদের একজন বলছিলেন বিম্বুকে দেখিয়ে—এরা হ্রস্বকপাল আর্মেনয়ড জাতি, পশ্চিম এশিয়া মাইনর থেকে এসেছে।

অপরজন প্রতিবাদ করে বলছিলেন—হ্রস্বকপাল তুমি কোথায় দেখলে? এরা দীর্ঘকপাল ভূমধ্যসাগরীয় জাতি।

এসব তর্কবিতর্কের মধ্যেই হঠাৎ ঝড় উঠলো। ওঁরা বাইরে এসে দেখলেন, একদিকে ইংরেজ সান্ত্রী বন্দুক উঁচু করে ওদের এগিয়ে আসতে বাধা দিচ্ছে, আর অন্যদিকে ওরা মারমুখী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

সাহেবরা গিয়ে পড়লেন, বিম্বু এগিয়ে গিয়ে ওদের কী সব বলতে লাগলো। কিন্তু কে কার কথা শোনে! বন্দুকের ফাঁকা আওয়াজ করা হলো, তাতে ওরা একটু থমকে দাঁড়ালেও পিছু হটলো না। আর বিম্বু? তার কথা ওরা কানেই তুলতে চায় না।

চীৎকার করছে ওরা—পিলুকে ফিরিয়ে দে।

বিম্বু বলতে লাগলো—পিলুর অসুখ। শুয়ে আছে। ভালো হলে আমি নিজে ওকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবো।

নিয়াম-এর এক বুড়ো চীৎকার করে বললে—তুই বেইমান, তোকে

বিশ্বাস করি না, তুই-ই মেয়েটাকে সাদা মানুষদের হাতে তুলে দিয়েছিস ! বেরিয়ে আয় তুই, তোকে শেষ করবো।

বিম্বু যদি সে সময় আরও কিছুক্ষণ মাথা স্থির রাখতে পারতো তাহলে কোনো দুর্ঘটনা ঘটতো না। কিন্তু 'বেইমান' কথাটা শুনে ওরও মাথায় রক্ত উঠে গেল। ওর বন্যস্বভাব ওকে যেন বিদ্যুতের মতো এনে ফেললো ওদের মধ্যে। যাকে হাতের কাছে পেলো তারই ওপর চালাতে লাগলো এলোমেলো কিল-চড়-ঘুঁষি। উত্তরে ওরাও নিশ্চেষ্ট রইলো না, লাঠি আর মুগুর নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লো বিম্বুর ওপরে।

মনে রাখতে হবে সালটা ১৮৪২, লর্ড এলেনবরোর আমল, খাইবার গিরিসংকটে ইংরেজদের শোচনীয় পরাজয় হবার পর সম্প্রতি জেনারেল পোলক যুদ্ধের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছেন। সেই সব সংবাদ নিয়ে ভারতের সব ইংরেজদের মধ্যেই তখন জটলা চলেছে। তাদেরও তখন মাথার ঠিক নেই বলা চলে। নইলে নৃতত্ত্ববিদ্ সাহেবরা সান্ত্রীদের দলপতিকে অনর্থক উত্তেজিত করতেন না, আর সঙ্গে সঙ্গে দলপতিও নির্দেশ দিতেন না—ফায়ার !

বিম্বু বা সুঞ্জা, দুজনের একজনেরও গুলি লাগেনি, কিন্তু মারা গিয়েছিল দুটি বর্ষীয়সী নারী আর তিনটি পুরুষ, ওদের মধ্যে তরুণ বীর নোম্বর একজন। বিম্বুর শাগরেদ।

ইংরেজ সান্ত্রীদের মধ্যেও জনকয়েক আহত হয়েছিল। এর ফলে আর যাই হোক, টোডাদের সঙ্গে ইংরেজদের সদ্ভাব বিনষ্ট হয়ে গিয়েছিল। এবং এ ঘটনার পর কিছুদিন পর্যন্ত টোডাদের সঙ্গে রীতিমত শত্রুতাই ছিল ইংরেজদের। অনেক কষ্টে পূর্ব সম্বন্ধ আবার ফিরে এসেছিল, কিন্তু সে অনেক পরে।

পাঁচটি টোডাকে চিতার আগুনে পুড়িয়ে আসবার পর বিম্বু যেন কেমন অন্য মানুষ হয়ে গেল। তার প্রতি প্রকাশ্যে শত্রুতা কেউ করছে না বটে, কিন্তু কেউ পূর্ণ আস্থা স্থাপনও করছে না। নিয়াম-এ

তার জায়গায় সুঞ্জাকে বসিয়ে দিয়ে একদিন সে গাঁ ছেড়ে চলে গেল।

চলে গেল আরও উত্তর-পশ্চিমে, বেশ কয়েক ক্রোশ পার হয়ে। চারিদিকে পাহাড় আর পাহাড়, মাঝখানে ছোট্ট শ্যামল উপত্যকা, অদূরে একটা পাহাড়ী ঝরনা রয়েছে। দূরে আকাশে 'পেট্' বা 'হেট্মার্জ' বা দোদাবেতার চূড়া চোখে পড়ে। জায়গাটা আগের গাঁ থেকে আরও একটু উঁচুতে, শীত-শীত ভাব একটু বেশী। বিম্মু ঠিক করলো, সবার থেকে দূরে এইখানে সে তার কুটির নির্মাণ করবে।

গোলাকার কুটির তৈরির কাজ শুরুও হলো একদিন। তার শাগরেদ ইরুল চলে এলো, এলো আরও কয়েকজন। তার ঘরের পর ওরা নিজেদের ঘর তৈরি করছে, আর তার মনটা বিষাদে আচ্ছন্ন হয়ে আসছে, মিছিমিছি পাঁচ-পাঁচটি টোডা তাদের জাত থেকে কমে গেল! সে বাধা দেবার আগেই ঘটনাটা ঘটে গেল! গুলি লাগলো নোম্বরের গায়ে প্রথম, সঙ্গে সঙ্গে তার কাছে ছুটে এলো তার মা। সে-ও গেল। তাকে বাঁচাতে গিয়ে তার বোন—আরেকটি নারী প্রাণ দিলো। এদের সঙ্গে আরও দুজন মধ্যবয়সীও চলে গেল।

উটাকলমাণ্ডে ছ'মাসের ওপর শুয়ে থাকতে হয়েছিল পিলুবাণীকে। সে তখন হাত নাড়তে পারে, কোনো কষ্ট নেই, কোনো ব্যথা নেই। কপালে শুধু একটা বড়ো কাটা দাগ চিরকালের জন্য রয়ে গেল সাক্ষী হিসেবে। সুঞ্জা যে তাকে অমানুষিক প্রহার করেছিল একদিন, এটা আর সবাই ভুললেও সে ভুলবে না কোনোদিন। মন্দিরের ব্যাপার নিয়ে যে শর্ত হয়েছিল, তাতে পিলুর ওপর সুঞ্জারই অধিকার। কিন্তু পিলু তা মানবে না। সুতরাং এ-বিয়ে কাটান না দিলে আর উপায় কী? বিম্মুর বদলে সুঞ্জাকে নিয়ামে-এ গ্রহণ করা হলো, যার ফলে সে ত্যাগ করতে রাজী হলো পিলুকে।

বিম্মু বললে—পিলু আমার কাছেই থাকবে।

পিলু অবাক হলো কথাটা শুনে, বললে—কেন? তোমার কাছে থাকবো কেন?

গম্ভীর কণ্ঠে বিম্বু বললে—হ্যাঁ, তাই থাকবি। তবে এ-গাঁয়ে নয়, আরেক গাঁয়ে। সেখানে প্রথম মেয়ে হলে পাহাড়ে দিয়ে আসতে হবে না।

বুড়োরা চীৎকার করে বললে—তা হবে না। নিয়াম যা বলবে তা সব মানতে হবে টোডাদের। তা তারা যেখানেই থাকুক না কেন।

বিম্বু বুড়োদের আর কিছু বলেনি, মাথা নীচু করে চলে এসেছিল। তার চোখের সামনে ভাসছিল নোম্বরের রক্তাপ্লুত দেহটা। আর সঙ্গে সঙ্গে অবাক হচ্ছিল সেদিনের কথাটা ভেবে। বাদাগারা যেখানে ভয় পায় সেখানে টোডাদের মতো নিরীহ মানুষগুলো পর্যন্ত এগিয়ে আসতে সাহস করে! অর্থাৎ, দরকার হলে টোডারাও ক্ষেপে যেতে জানে।

দিনের পর দিন যায়। বছরের পর বছর। একদিন তাদের কাছে হঠাৎ এসে উদয় হয় সুঞ্জা। দরজার কাছে বসে কী-সব টুকটাক কাজ করছিল পিলুবাণী, ওকে দেখে চমকে উঠলো। সুঞ্জাও কিছুক্ষণ কথা বলতে পারে না ওকে দেখে।

অবশেষে পিলুই বলে—বিম্বু বাড়ি নেই।

—জানি।

পিলু বললে—তুমি এলে যে?

—ইচ্ছে হলো।

—হঠাৎ?

—হঠাৎই ইচ্ছে হলো।

পিলু ওর দিকে ভালো করে তাকালো। যে গাঁয়ে তারা একদিন ছিল, সেখান থেকে তাদের এই নতুন গ্রাম অনেক দূরে। সকালবেলা রওনা হলে এখানে এসে পৌঁছতে বিকেল হয়ে যাবে। পিলু কখনো আর পুরানো গাঁয়ে যায়নি। যেমন ছোটবেলায় বিম্বুর ঘরে শুয়ে থাকতো তেমনি আজও শুয়ে থাকে। বিম্বু থাকে বেড়ার ওপাশে। ইরুল একটা ঘর করেছে ঠিক তাদের লাগোয়া। বুড়ো টোডারা

একবার নিয়াম ডেকে একটা নতুন ব্যবস্থা করেছিল। ছুটো গোত্র করেছিল সারা টোডাদের মধ্যে। 'টারথারল' আর 'টিভালিয়ল'। গোত্র ছুটো বহু আগে থেকেই ছিল, ওরা তা এই সময় পুনরুজ্জীবিত করেছিল নিজেদের প্রয়োজনে। যে সব মেয়েরা ভিন জাতের সংস্পর্শে এসেছে, তারা আর তাদের সন্ততিরা টিভালিয়ল গোত্রে পড়বে। টিভালিয়লরা হীন, টারথারলরা বনেদী। এটা অবশ্য একদিনেই গড়ে ওঠেনি, ধীরে ধীরে ধাপে ধাপে এই ভেদবুদ্ধি ওদের মধ্যে মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছিল।

যেদিন নিয়াম ডাকা হয় সেদিন পিলুকে কিন্তু টিভালিয়ল গোত্রে ফেলার খুব চেষ্টা হয়েছিল। কিন্তু, যেহেতু সে পণ করে বসেছিল বিম্বুকে ছেড়ে যাবে না, সেজন্য সে বিম্বুর গোত্রেই রয়ে গেল, বিম্বু ছিল টারথারল। সেদিনকার নিয়াম-এর সভায় সুঞ্জা ছিল না। সে ইচ্ছা করেই আসেনি।

এদিকে দিনের পর দিন বছরের পর বছর চলে গেছে, বিম্বুর শরীর ভেঙে গেছে, বিম্বু এখন বুড়োর দলে, বনে গিয়ে বুনো মোষ পর্যন্ত ধরতে পারে না। সে-সব ব্যাপারে ওর শাগরেদ ইরুল খুব নাম করেছে।

এক-একদিন আগে আগে বিম্বু পিলুকে এগিয়ে দিতো ইরুলের কাছে। বলতো—ওকে বিয়ে কর।

ইরুলের সুঠাম দেহের দিকে তাকিয়ে ভালোও লাগতো পিলুবাণীর, কিন্তু ধরা দিয়েও ধরা দিতে পারতো না সে, ছুটে পালিয়ে আসতো। বলতো—না না, আমার ভয় করে।

—ভয় কিসের?

—যদি মেয়ে হয়?

—মেয়ে হবে কেন?

পিলু বলে—মার আত্মা এখনো ঘুরে বেড়ায়, আমার কোলেই সে আসবে যে!

—বেশ। আসুক।

পিলু বলে—তোমরা যে ওকে মেরে ফেলবে!

বিষ্ণু চুপ করে। এইখানে সে হেরে গেছে। নতুন গাঁ পত্তন করার অভিলাষ নিয়ে সে আসেনি। এসেছিল নিছক একা থাকবার জন্য। জায়গাটা তার বহুকাল থেকেই ভালো লাগতো। ভেবেছিল, এখানে একটি ছোট্ট কুটির তৈরী করে বাকী জীবনটা কাটিয়ে দেবে। কিন্তু তাদের জাতের মানুষগুলোর মধ্যে এক অদ্ভুত যাযাবরী মন লুকিয়ে আছে। অনুকূল বায়ুভরে সেই মন হঠাৎ পাখীর মতো ডানা মেলে দিতে চায়। তাই, ও চলে আসবার সঙ্গে সঙ্গে আরও কয়েকটি পরিবার চলে এলো ওর পিছনে-পিছনে। ওর দেখাদেখি তারাও ঘর তৈরী করলো ক্ষুদ্র এই উপত্যকাটুকুতে, ছড়িয়ে-ছড়িয়ে, এধারে-ওধারে, নিজেদের ইচ্ছামতো। বিষ্ণু কোনো উপদেশ-নির্দেশ দেয়নি, সে চেয়েছিল নির্ঝঞ্ঝাট শান্তিময় জীবন। যে-যার মনের মতো কাজ করে চলেছে, সুখেদুঃখে কোনোরকমে জীবন কেটে যাচ্ছে সবার, আর কী চাই?

কিন্তু অচিরেই শান্তি ভঙ্গ হলো উপত্যকার। ওদের একটি গর্ভবতী বধূ কন্যা প্রসব করলো। এবং দিনকয়েক পার হতেই সে-কন্যা নিয়ে সবাই রওনা হলো মুকের্তি পাহাড়ে।

বিষ্ণুকে এসে ছুটতে ছুটতে খবর দিলো পিলুবাণী। বললে—টিভালিয়ল-পাড়ায় গিয়েছিলাম। কী কাণ্ড হচ্ছে, দেখে এসো। দূর দূর গাঁ থেকে গাঁও-বুড়োরা এসেছে। বাচ্চাটাকে নিয়ে যাচ্ছে মুকের্তি পাহাড়ে।

—কেন!

পিলুর চোখদুটো ছলছল করছে, কান্নাভরা কণ্ঠে বলতে লাগলো—বউটি বসে আছে যেন নিথর মূর্তি, প্রাণ নেই। তার নাড়ী-ছেঁড়া ধন, তার প্রাণের কণাটাকে ওরা সব জোর করে ছিনিয়ে নিলো। বাচ্চাটা ছোট ছোট চোখ মেলে তাকাচ্ছে, হাত মুঠো করছে, একটু বা কেঁদে উঠছে। 'মা ডেকে বললে—ওর খিদে পেয়েছে, ওকে দাও, দুধ

দিয়ে দি।'…কিন্তু কে শোনে কার কথা, আমি আর থাকতে পারলাম না, ছুটে চলে এলাম।

বিম্বু ঘরে ঢুকে তার সেই পুরানো লোহার ডাণ্ডাটা নিয়ে আসে। তারপরে বলে—কোথায়? চল্ দেখি?

—এতক্ষণে তারা রওনা হয়ে গেছে। তুমি পাকদণ্ডী পথ ধরে যাও।

—তুই যাবি না?

—না।—বলে ত্বহাতে মুখ ঢেকে ব্যাকুল হয়ে কাঁদতে থাকে পিলুবাণী। অনেকক্ষণ কাঁদবার পর যখন মনটা একটু স্থির হয়, তখন হঠাৎই এক সময় মুখ তুলে দেখে, ইরুল বিম্বুকে ধরে ধরে নিয়ে আসছে। বিম্বু আসছে খোঁড়াতে খোঁড়াতে অবসন্নভাবে, কপালে একটা ছেঁড়া কাপড় শক্ত করে বাঁধা। কাছে আসতেই ভালো করে দেখতে পায় পিলু সেই কাপড়ের ফেট্টির একটা পাশ রক্তে ভিজে ওঠা!

সভয়ে আর্তনাদ করে ওঠে পিলু, বলে—কী হয়েছে!

পরাজিত, বিপর্যস্ত সৈনিকের মতো ধপ্ করে বসে পড়ে বিম্বু, বলে—পারলাম না। আমার লোহার ডাণ্ডা ওরা কেড়ে নিলো। বুড়ো হয়েছি, গায়ে জোর নেই, মনেও বল নেই।

তারপরে ওকে একটু সুস্থ করে তুলে ইরুল যখন নীচু-করা মুখে ফিরে গেল চারণভূমির দিকে, তখন ধীরে ধীরে নিস্তেজ গলায় বিম্বু বলে উঠলো—আমি তোর কাছেও হেরে গেলাম পিলুবাণী।

পিলু কোনো কথা বলে না আর। কী একটা কাজের ছুতো করে সে উঠে যায়। বিম্বু চুপচাপ নিজের মনে বসে ভাবতে থাকে। একটা সময় ছিল, যখন সে সব চাইতো। পেতেও ইচ্ছা করতো সব, চাইতোও সব। যা কেউ করে না তাই করতে ইচ্ছা করতো। যেখানে কেউ যায় না, সেখানে যেতে ইচ্ছা করতো। কিন্তু ক্রমে ক্রমে সব অগ্নিশিখাই একে একে নিভে গেল। এক টুরাই তাকে

প্রচণ্ড ধাক্কা দিয়ে গেল তার জীবনের ভিত্তিমূল ধরে। দুর্দান্ত বুনো স্বভাবের লোকটা বুঝলো, জোর করেও সব জিনিস পাওয়া যায় না। হৃদয়ের দিক থেকে বিচার করতে গেলে একটা ডাকাতের থেকে একটা ভিখারী অনেক বেশী শান্তি পেতে পারে।

সেই টুরা গেল, এলো পিলুবাণী। পিলুবাণী যতো বড়ো হতে লাগলো, বিম্বু যেন ততই অন্য একটা মানুষে পরিণত হতে লাগলো। আজ জরা তার দেহকে শুধু আশ্রয় করেনি, মনটাকেও বুঝি জড়িয়ে ধরেছে নিবিড় ভাবে। সে ছিল অতিকায় বনস্পতির মতো, আজ সে টের পেলো, তার সব শিকড় গেছে আলগা হয়ে, প্রবল এক বাতাস এসে তাকে যে কোনো মুহূর্তেই বুঝি ধূলিসাৎ করে দিতে পারে!

বেশ কিছুক্ষণ পরে ওর কাছে ফিরে এলো পিলুবাণী, বললে—ভাবছো কী অতো, সেই থেকে বসে বসে?

ম্লান একটা হাসি ফুটে ওঠে বিম্বুর ঠোঁটের কোণে, বলে—ভাবছি এখান থেকেও পালাবো।

ঠোঁট উলটে তাচ্ছিল্যের হাসি হাসে পিলুবাণী, বলে—সারা জীবন ধরে আর কতো পালাবে শুনি?

চমকে ওঠে বিম্বু, কথাটা যেন চাবুকের মতো এসে পড়ে তার চেতনায়। সত্যিই ত তাই, সারা জীবন সে ত পালিয়েই বেড়ালো! সামনাসামনি সে দাঁড়ালো কোথায়? টুরা বরং দাঁড়িয়েছে। আজ পিলুর কোনো অস্তিত্বই থাকতো না, যদি না টুরা অমিতবিক্রমে রুখে দাঁড়াতো!

না, না—কিছুই সে পারেনি। আজও ফুলের মতো বাচ্চাটাকে সে মুকের্তি-পাহাড়ের গ্রাস থেকে বাঁচাতে পারলো না। এ গাঁ তার, এ গাঁ তাকে ঘিরেই গড়ে উঠেছে বলা চলে। অথচ, এখানে পর্যন্ত তার কথা কেউ শুনলো না। আজ ইরুল কাছে না থাকলে তাকে হয়তো ওরা প্রাণেই শেষ করে দিতো। তার হাত থেকে লোহার ডাণ্ডাটা কেড়ে নিয়ে তারই ওপর চালনা করতে দ্বিধা করেনি ওরা।

সংস্কার এমনি প্রবল। ক্রমবর্ধমান কঠোর দারিদ্র্যও তার জন্য দায়ী। সিকা টাকায় আগে যে জিনিস যতোটা পাওয়া যেতো, এখন পাওয়া যায় না। তারা দুধ, ঘোল, ঘি বিক্রি করে যতোটা চাল পেতো, আজকাল ততটা পায় না। এ-সব মিলিয়ে তাদের জীবনযাত্রা অনেক বেশী সমস্যাসংকুল হয়ে উঠেছে। ওরা বললে তার মুখের ওপর—সাত ভাই মরবে কেন না খেয়ে? এক বোনই মরুক না?

ব্যাপারটা এখানেই শেষ হয়নি। এই ঘটনার কিছুদিন পরে, পিলু একদিন বিষ্ণুকে বললে—ইরুলের মুখের দিকে তাকাও না ভালো করে? ওর বউ নিয়ে এসো।

সংক্ষিপ্ত উত্তর দিয়ে দিলো বিষ্ণু—হ্যাঁ, তাই আনতে হবে।

কিন্তু বউ আনা অতো সহজও নয়! তাদের জাতের মধ্যে মেয়ের সংখ্যা ততদিনে আরও কমে গিয়েছিল। তার ফল হয়েছিল এই যে, লোকসংখ্যা না বেড়ে নেমে চলেছিল আরও নীচের দিকে।

অনেক চেষ্টা চরিত্রের পর, বিষ্ণু করলো কী, একদিন এক টিভালিয়ল মেয়েকে নিয়ে এলো দূরের গাঁ থেকে, সঙ্গে ছিল ইরুল নিজে। এই টিভালিয়ল মেয়েটিই হলো ইরুলের বউ।

বউ নিয়ে দিন কাটে ইরুলের। ইউক্যালিপটাসের পাতা ঝরে আবার নতুন পত্রিকার দ্যোতনা দেখা দেয়, ডালে ডালে নতুন কুঁড়ি ধরে। হালকা মেঘের ভেলা ভাসিয়ে ঝিরঝিরে মিষ্টি বাতাস আসে দক্ষিণ দিক থেকে। ইরুলের বউ গর্ভবতী হলো। গমন হলো তার মন্থর, চলনে-বলনে একটা সলাজ লাবণ্য এসে তাকে আশ্রয় করলো। তাকে দিনের পর দিন ধরে দেখে পিলুবাণী, আর ভিতরে ভিতরে এক প্রচণ্ড অস্থিরতায় কাঁপতে থাকে। এক একদিন মনে হয় সেই সুঙ্গার কাছেই সে পালিয়ে যাবে নাকি? তার মা তাকে ছেড়ে যেমন একদিন তার বাবার কাছে ফিরে গিয়েছিল, সেও যদি একদিন তেমনি যায়?

বিষ্ণুর কাছ থেকে সুঙ্গার কথা সে শোনে মাঝে মাঝে। সুঙ্গা

বুড়ো হলেও দেহটা তার ভেঙে পড়েনি। গেন্নাকে সে বউ করেছে, ছেলেও হয়েছে তার। অজিত হয়েছে পেলল।

বিষ্ণু বলে—তুই কখনো ও গাঁয়ে যাসনি যেন!

চমকে ওঠে পিলু—কেন!

বিষ্ণু বলে—তোর ওপর ভীষণ ওর রাগ।

পিলু নীরব হয়ে যায়। তার শরীরের সেই অজ্ঞাত অস্থিরতা ধীরে ধীরে শান্ত হয়ে আসে। ইউক্যালিপ্‌টাসের কুঁড়ি একদিন ফুল হয়ে ফুটে ওঠে, বাতাসে-বাতাসে সুবাস ছড়িয়ে দেয়।

ইরুলের কুটিরপ্রান্তে একদিন শিশুর কণ্ঠ শোনা যায়। যথাসময়ে ইরুলের বউয়ের কোলে শিশু আসে। দেখতে গিয়ে সভয়ে পিছিয়ে আসে পিলুবাণী। ইরুলের বউয়ের কোলে ছেলে আসেনি, এসেছে মেয়ে।•

ভয় পেয়ে ফিরে আসে নিজের ঘরে। তারপরে একটি একটি করে দিন যেতে থাকে, আর দুঃস্বপ্নে ঘুমের ঘোরে কেঁদে ওঠে পিলুবাণী। কিন্তু কান্নাই ওর সার হলো। যথানিয়মে নির্ধারিত দিনে ভীড় করে এলো গাঁও-বুড়োরা, বিষ্ণু ঠিক প্রতিবাদ না করলেও ওকে তারা ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিলো কাছ থেকে। পিলুবাণী আকুল হয়ে কাঁদতে কাঁদতে পড়লো গিয়ে ওদের পায়ে। ইরুলকে বারণ করলো, ইরুলের বউকে বারণ করলো।

কে শুনবে ওর কথা? বিষ্ণু উঠে দাঁড়িয়ে দূর থেকে চীৎকার করে ডাকতে লাগলো ইরুলের নাম ধরে, ইরুল তা কানেও নিলো না। বাচ্চাটাকে হাতে করে দিয়ে এলো মুকোর্তি পাহাড়ে। ফিরে এলে আবার ইরুলের হাত ধরে মিনতি করতে লাগলো পিলুবাণী, বলতে লাগলো—ফিরিয়ে নিয়ে আয়, এখনো হয়তো জন্তু-জানোয়ারে খায়নি।

ইরুল নির্বিকার, ইরুলের বউয়েরও যেন সাড়া নেই। অনেক পরে, বউ যখন কথা বললে, তখন যে-কথা সে উচ্চারণ করলো, সেটা

হলো এই—মেয়ে আমার ঠিক ফিরে আসবে। ফিরে আসবে ছেলে হয়ে। তুই দেখিস?

এবং সত্যিই তাই হলো। বছর তিন কেটে গেল তারপরে। ইরুলের বউয়ের কোলে এলো পুত্রসন্তান। সেই ছেলে দেখতে দেখতে একদিন বড়ো হয়ে উঠলো, এখন বয়স তার তেরো-চৌদ্দ। মা-বাপের চোখের মণি। বিশেষ করে মায়ের। পিলুরও ইচ্ছা হতো মায়ের মতো ওকেও সে গিয়ে আদর করে। কিন্তু ইরুলের বউ তা ভালো চোখে দেখতো না। আর এখন? এখন ত তার সঙ্গে ছেলে কথা বললে পর্যন্ত মারমুখী হয়ে ওঠে ইরুলের বউ। বলে—দু কুড়ি বয়স পেরিয়ে গেল, এখনো নিজে মা হতে পারলি না, পরের ছেলের দিকে অতো নজর কেন, অ্যাঁ?

মর্মান্তিক আঘাত হয়েই প্রাণে এসে বাজতো পিলুবাণীর। রাত্রে একা শুয়ে শুয়ে তার চোখের জল আর বাধা মানতো না। সে মনে মনে বলতো—হে দেবী টিয়েকৃজ্রি, দু কুড়ি বয়স হলো আমার, ছেলেমেয়ে আর হবে না জানি, তবু বলছি তাকে ফিরিয়ে আনো, তাকে একদিন জোর করে ঠেলে ফেলে দিয়েছি জীবন থেকে, কিন্তু আজ বলছি তাকেই এনে দাও, তার গলায় দুটি হাত জড়িয়ে তার বুকে মুখ রেখেই আমি শেষ শান্তিটুকু পেতে চাই।

আজ, এতদিন পরে, সত্যিই সেই সুঞ্জা তার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। সতেরো-আঠারো বছর কেটে গেছে ওরা এসেছে এই নূতন গাঁয়ে। সেই যে ওর সঙ্গে বিয়ে কাটান গেল তার, তারপরে এই সতেরো-আঠারো বছরের মধ্যে পিলু সেই পুরানো গাঁয়ে কখনো আর যায়নি বটে, সুঞ্জা কিন্তু এসেছে। এসেছে, বাইরে কোথাও বসেছে, বিম্বু বলা সত্ত্বেও পিলু যায়নি তার কাছে—ছুটে এসে ঘরের মধ্যে লুকিয়েছে, ওর সামনে বেরোয়নি কোনোদিন। কেমন একটা

লজ্জা আর ভয় যেন তার মনটাকে এসে আঁকড়ে ধরেছে। আর সুঞ্জাও ফিরে গেছে কী মনে করে, কে জানে!

সুঞ্জা বললে—তুই একা?

—হ্যাঁ।

সুঞ্জা প্রশ্ন করলে—ইরুলের বউটাই বা কোথায় গেল?

বাস্তবিক ইরুলের বউও ছিল না তখন গাঁয়ে।

ছেলে মোষ নিয়ে গেছে বাপের সঙ্গে, মা আর থাকতে পারেনি, ঘরের কাজকর্ম সেরে চলে গেছে মাঠের দিকে। ছেলের জন্য খাবার নিয়ে গেছে, খাইয়ে-দাইয়ে ফিরে আসবে।

কিন্তু এত কথা সুঞ্জাকে বললো না পিলু। শুধু বললে—মাঠে গেছে। ছেলের কাছে।

—ছেলে?—সুঞ্জা একটু ভেবে বললে—ও হ্যাঁ, আমি জানি। শুনেছি। আমারও একটি ছেলে আছে, জানিস?

ধক্ করে উঠলো ওর বুকের ভিতরটা। কিন্তু সে ভাবটা মুহূর্তে সামলে নিয়ে পিলু বললে—জানি না, শুনিনি।

—আমি কিন্তু তোদের সব খবর রেখেছি—সুঞ্জা বললে—আমার ছেলে এই বারো পেরিয়ে তেরোয় পড়লো। গেন্না আমার বউ ছিল জানিস ত?

এসব কথা শুনেছিল সে বিন্দুর কাছ থেকে। কিন্তু ছেলের কথাটা সে যে শুনেছে, এমন ত মনে পড়ে না।

পিলু বললে—গেন্নাকে নিয়ে এলি না কেন সঙ্গে করে?

—গেন্না নেই।

—মানে!

—মাসখানেক হলো মারা গেছে।

—সে কী!

—হ্যাঁ। জ্বর হয়েছিল।

চুপ করে থাকে পিলু। সুঞ্জা বললে—আসবি আমার সঙ্গে?

—কোথায় ?

—ঐ ঝাউয়ের গাছগুলোর কাছে ?

—কেন ?

—এমনি। গল্প করবো।

পিলু বলে—এখানেই বোস না ?

সুঞ্জা বললে—না। গাছের ছায়ায় বসতেই ভালো লাগবে।

বেশ কয়েক বছর পরে সুঞ্জার সঙ্গে দেখা হলো পিলুর। অদ্ভুত একটা মায়াও জাগলো ওর ওপরে। সুঞ্জা বেশ বুড়ো হয়ে গেছে। সে নিজেও কী বুড়ী হয়ে যায়নি ? দু'কুড়ি বয়স হলো তার নিজেরও। এখন আর তার ভয়টা কি ?

[এও ওদের সংস্কার। দু'কুড়ি বয়স হয়ে গেলে মেয়েদের নাকি আর ছেলেপিলে হয় না।]

সুঞ্জার হাত ধরে চলতে লাগলো পিলুবাণী। আর সঙ্গে সঙ্গে বকবক করতে লাগলো—আচ্ছা, সেই মন্দির এখনো আছে ?

—হ্যাঁ, অজিত তার পেলল।

—তুমি না ?

—না। আমি কেন হবো ?

পিলু বললে—সেই ক্রশ-আঁকা পাদরী-বাবার ঘরখানা আছে এখনো ?

—আছে। তবে পাদরী নেই, মরে গেছে। ওখানে দুটি সাদা মানুষদের মেমসাহেব থাকে এখন।

থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে পিলু, বলে—তাই নাকি ?

সুঞ্জা বলে—হ্যাঁ। চল্ না একদিন গাঁয়ে ?

অভিমানে চোখে ওর জল এসে পড়ে, বলে—না।

ততক্ষণে ঝাউয়ের কুঞ্জে ওরা এসে গেছে। কয়েকটা ঝাউ মিলে একটা কুঞ্জই করে তুলেছে বটে। দিনটা ছিল তার ওপর মেঘলা-মেঘলা, বেলা বেশ বেড়ে গেছে, তবু চারিদিকে পাতলা একটা কুয়াশার আবরণ ঘেরাটোপের মতো ঘিরে আছে ক্ষুদ্র উপত্যকাটিকে।

ওরা বসলো একটা জায়গায়, পাশাপাশি। তখনো পিলু জানে না যে তার ভাগ্যে কী ঘটতে যাচ্ছে! সে ঘুণাক্ষরেও সন্দেহ করতে পারেনি যে একটা বিশেষ অভিসন্ধি নিয়েই তার কাছে আজ এসেছে সুঞ্জা। দিনক্ষণ বুঝেই এসেছে। খোঁজখবর নিয়েই এসেছে।

বাইরে পাহাড়ের ওপার থেকে হঠাৎ একটা শব্দ ভেসে এলো—গুম্। অমনি ভয়ে ওকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরলো পিলু। আর্তনাদ করে বলে উঠলো—কিসের শব্দ ?

শব্দটা তখনো হচ্ছে। কান পেতে শুনে নিয়ে সুঞ্জা বললে—ও কিছু নয়, পাহাড় ফাটাচ্ছে।

—পাহাড় কী করছে ?

—ফাটাচ্ছে।

—কেন ?

—ওসব তুই বুঝবি না,—সুঞ্জা বললে—সাদা মানুষদের কাণ্ড। উটাকলমাণ্ডকে প্রকাণ্ড শহর করে তুলেছে। নীচে থেকে রাস্তা করেছে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে, গাড়ি আসবার। তোদের পশ্চিম দিকে ঐ যে পাহাড়টা দেখছিস, ওর ওপারে সাদা মানুষরা একটা প্রকাণ্ড ঘর বানিয়ে তাতে কতকগুলো লোক রেখে দিয়েছে। তাদের সারাদিন কাজ করায়, আর সন্ধ্যা হলেই ঘরে ঢুকিয়ে দিয়ে বিরাট এক তালা লাগিয়ে দেয়।

—তালা কী ?

সুঞ্জা বললে—সে তুই বুঝবি না। ওদের সঙ্গে অনেক বাদাগারা খাটতে যায় কিনা। তাদের কাছ থেকে শুনেছি।

—কী শুনেছিস ?

সুঞ্জা বললে—সাদা মানুষরা ওখানে একরকম গাছের চাষ করছে। সেই সব গাছ থেকে নাকি ওষুধ হবে।

—কী গাছ ?

সুঞ্জা বললে—বাদাগারা বলে, সিন্‌কোনা। আর ঐ যে লোকগুলোকে এনে রেখেছে সাদা মানুষরা, ওরা নাকি চীনেম্যান।

সুঞ্জা ঠিকই শুনেছিল। ১৮৬০ সালে ইংরেজরা ওখানে কিছু চায়নীজ বন্দী রেখেছিল সেই সুদূর চীনদেশ থেকে এনে। তাদের দিয়ে নীলগিরির পাহাড়ে সিন্‌কোনার চাষ শুরু করে।

আমি বলছি তারও এক বছর পরের কথা। ১৮৬১ সালের কথা। সিন্‌কোনার চারাগুলো একবছরের বড়ো হয়েছে। সুঞ্জা বৃদ্ধ, পিলু চল্লিশের ওপরে। মাঝখানে বেশ কয়েকটা বছর যেন দুঃস্বপ্নের মতো কেটে গেছে। সুঞ্জা বললে—একটা জিনিস খাবি?

—কী?

পুট্‌কলীর প্রান্তে পুঁটলীর মতো বাঁধা ছিল কয়েকটা ছোট ছোট গাছের পাতা। তার কয়েকটা ও নিজের মুখে দিয়ে চিবুতে লাগলো, পিলুরও হাতে দিলো কয়েকটা। বললো—খা। বেশ ঝাঁজ ঝাঁজ মিষ্টি-মিষ্টি খেতে।

পিলু ঘুণাক্ষরেও কিছু সন্দেহ করেনি। সুঞ্জা বললে—উটাকলমাণ্ড থেকে এনেছি। সাদা মানুষরা খায়।

কী অদ্ভুত ধরনের উত্তেজক পাতা কে জানে, খেয়ে মাথা ঘুরতে লাগলো পিলুবাণীর। কান দুটো ঝাঁ-ঝাঁ করতে লাগলো। নাক-মুখ-চোখের কোণ থেকে যেন আগুন বেরুতে লাগলো। সারা গায়ে দেখা দিলো ঘাম।

দূরে কে যেন তাকে তার নাম ধরে ডাকছে, সে শুনতে পাচ্ছে, অথচ সাড়া দেবার সামর্থ্য যেন লোপ পেয়েছে।

চোখ চেয়ে সব সে দেখতে পাচ্ছে, অথচ কিছুই বলতে পারছে না সে। দুটি হাত দিয়ে সুঞ্জার গলা জড়িয়ে ধরলো সে নিবিড়ভাবে। তারপরে ওকে একেবারে কাছে টেনে এনে শুয়ে পড়লো ঘাসের ওপরে।

সুঞ্জা সরে এলো। আকাশ দেখা গেল না। সাদা পর্দা দিয়ে কে যেন আজ ঢেকে দিয়েছে নীল আকাশটাকে। তার গায়ের চাদরটা গা থেকে খুলে গেল, শিথিল হলো তার নীবিবন্ধন। কিন্তু

আশ্চর্য, পিলু কোনো বাধা দিলো না। অথচ, মনে মনে সে বুঝতে পারলো, কী ঘটতে যাচ্ছে তার জীবনে। কী অনাস্বাদিতপূর্ব অঘটন! মনে মনে তবু সে একবার ভেবে নিলো,—যাক্, চল্লিশ পেরিয়ে গেছে, মা ত হতে পারবো না আমি!

দুর্জ্ঞেয় মানুষের মন। সুঞ্জা সেদিন কী প্রতিহিংসাবৃত্তি চরিতার্থ করেছিল কে জানে—সে চলে গেল, এলো না দীর্ঘদিন।

সেদিনকার সেই সকালের কথা পিলু ছাড়া কেউ জানলোও না। কেউ জানলোও না যে, সুঞ্জা বলে একটা মানুষ সেদিন এসেছিল তাদের শান্তির পাহাড়-ঘেরা ছোট্ট উপত্যকায়।

অথচ, পিলুবাণী কি ভুলতে পারে সেই ঘটনাকে?

ক্রমে ক্রমে তার মনে একদিন আতঙ্ক দেখা দিলো। ইরুলের বউ সন্তানের মা, সে ওর থেকে বয়সে অনেক ছোট হলেও জানে-শোনে যথেষ্ট বেশী। তার কাছে সব খুলে বলতেই সে চাপা উল্লাসের হাসিতে ফেটে পড়লো। বললে—কয়েকটা মাস দেরী করো, নিজেই জানতে পারবে কী হয়েছে।

সারা শরীরে একটা হিমস্রোত বয়ে গেল। এ কী করে সম্ভব? তবে যে বলে, চল্লিশের পর—

ভাবতে ভাবতে ঝরঝর করে কেঁদে ফেলে পিলুবাণী। যদি মেয়েই হয়? তাকে যে ওরা—

চীৎকার করে ওঠে সে। নিজের দুর্বুদ্ধিকে নিজেই অভিশাপ দিতে থাকে। তার বোঝা উচিত ছিল। বোঝা উচিত ছিল, তার মার আত্মা তার চারিদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে সব সময়। সুযোগ পেলে সে ত আসবেই তার কোলে।

কিন্তু, তারপর?

বিন্দু সব শুনে আকাশ থেকে পড়ে, বলে—সুঞ্জা এসেছিল?

—হ্যাঁ।

চুপ করে রইলো বিন্দু।

দিন যায়। মাস যায়। সূর্য ওঠে, সূর্য ডোবে। দিন শেষ হয়, রাত্রি আসে।

এমনি করে করে বেশ কয়েকটা মাস পার হয়ে গেছে, দশ মাসেরও বেশী। যাবে কি যাবে না করেও একদিন বিম্বুকে যেতে হলো। সুঞ্জার সঙ্গে দেখা করতে হলো। শুধু দেখাই নয়, একরকম জোর করে তাকে ধরে নিয়ে আসা।

সুঞ্জার হাত ধরে ঝাঁকি দিয়ে বিম্বু সজলচক্ষে কাঁপা গলায় বলে উঠলো—দেখ কী করেছিস!

আলাদা একটা চৌকো ঘরে তার সেই পুট্‌কলীটা জড়িয়ে চোখ বুজে শুয়ে আছে পিলুবাণী। কে বলবে যে তার সর্বাঙ্গ হিম হয়ে গেছে! কে বলবে যে সে আর উঠে দাঁড়াতে পারবে না! কে বলবে যে সে আর কথা বলবে না, সে আর হাসবে না, সে আর চোখ তুলে তাকাবে না!

আর, ঠিক তার পাশে, আর একটা ছোট্ট পুট্‌কলীতে মোড়া ছোট্ট একটা শরীর হাত দুটি বার করে শুয়ে আছে, বুকের কাছে হৃদ্‌পিণ্ডের স্পন্দনটা যেন দূর থেকেই অনুভব করা যায়।

বিম্বু ধরা গলায় বললে—মেয়ে।

চমকে উঠলো সুঞ্জা—মেয়ে!

—হ্যাঁ।—বিম্বু বললে—পিলুর বিশ্বাস তার মা-ই ফিরে এসেছে। কে জানিস? টুরা।

সুঞ্জা তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে শিশুটিকে কোলে তুলে নিলো। বললে—একে বাঁচাতেই হবে।

বিম্বু বললে—বাঁচবে। তোদের নিয়াম আপত্তি করবে না। একজন গেল বলেই আরেকজন থাকবে। মা বাঁচলে তবেই না যেতে হতো মেয়েকে নিয়ে মুকেতি পাহাড়ে!

সুঞ্জা অবাক হয়ে তখন ঘুমন্ত শিশুর মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। মুখখানা কার মতো হবে? নিশ্চয়ই মা'র মতো।

বাইরে সেদিনকার মতো আবার কুয়াশা জমেছে। একবার মনে হলো, ও বুঝি এখুনি ঘুম থেকে জেগে উঠবে, বলবে—চলো, বাইরে যাই।

আবার তারা হাত ধরাধরি করে গাছতলায় গিয়ে বসবে। পিলু পাহাড়ের ওপারের শব্দ শুনে চমকে উঠে তাকে জড়িয়ে ধরবে, ভয়-ভয়-করা গলায় বলবে—ও কিসের শব্দ?

—ও কিছু নয়।

কিন্তু, কে শুনবে উত্তর? সে আর শয়ন থেকে উঠবে না, সে আর তার সঙ্গে কথা বলবে না। একটা বিরাট অধ্যায় যেন শেষ হলো। আরেকটি অধ্যায়ের শুরু।

উপত্যকার নাম দিয়েছিল ওরা ‘শান্তির পাহাড়’। পূবে-পশ্চিমে-উত্তরে-দক্ষিণে সত্যিই যেন উত্তাল উত্তুঙ্গ ঢেউ উঠে স্তব্ধ হয়ে গেছে। সেই ঢেউ পেরিয়ে কোথায় কী আছে ওরা জানতে চায়নি। ওপারের বাতাস এসে ছুঁয়ে যায় ওদের শরীর, ওপারের ঝড় এসে নাড়া দিয়ে যায় ওদের বর্তুলাকার কুটিরগুলোকে। কিন্তু, মাত্র এইটুকুই। বহুকাল আগে ওদের জাতটাকে দুটি গোষ্ঠীতে ভাগ করা হয়েছিল—‘টারথারল’ আর ‘টিভালিয়ল’। যদিও তখন গোষ্ঠী দুটির মধ্যে উচ্চতা-নীচতার ভেদাভেদ ছিল না ; এমন কি, এই দুই নামের যে দুটি গোষ্ঠী আছে, তা আচার-ব্যবহারের দিক দিয়ে বোঝাও যেতো না।

তখন ছিল ‘রাজা’। রাজাই আইন, রাজাই সব ; রাজার হুকুমেই সবকিছু চলতো। কালক্রমে, উচ্ছেদ হলো এই রাজতন্ত্রের, তৈরী হলো ‘নিয়াম’ বা ‘পঞ্চায়েত’ বা জন-নির্বাচিত পরিচালক-মণ্ডলী। তথাকথিত সভ্যতা থেকে দূরে থাকা এই নগণ্য পার্বত্য জাতির মধ্য থেকে রাজতন্ত্র যখন মুছে যায়, ভারতবর্ষের সভ্য পরিবেশে গণতন্ত্রের কথা তখন কেউ ভাবতেও পারেনি। ওদের মধ্যে যখন এই বিবর্তন ঘটে, তখন থেকে একদিন-দুদিন নয়, একবছর-দুবছর পরে নয়, সুদীর্ঘ ষোলো বছর পরে, অর্থাৎ ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে এ দেশের ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অবসান ঘটলো, সমগ্র দেশ পরিণত হলো ইংলণ্ডেশ্বরী মহারাণী ভিক্টোরিয়ার বিশাল সাম্রাজ্যের অংশবিশেষে।

এরও চার বছর পরে, ১৮৬১ সালে তাকে পৃথিবীতে আনতে গিয়ে মারা যায় তার মা।

তার দিদিমার নাম ছিল টুরা। মার নাম—পিলুবাণী। মার ধারণা তার মায়ের বিদেহী আত্মাই ফিরে এসেছিল বুঝি তার মেয়ের শরীর নিয়ে। সেইজন্য, তার নামও ওরা সবাই রেখেছিল—টুরা।

টুরা হলো টারথারল—ওর মা পিলুবাণী টারথারল ছিল বলে।

গোষ্ঠীতে গোষ্ঠীতে যেমন একদিন ভেদাভেদ ছিল না, আজ তেমনি উচ্চতা-নীচতা প্রবলভাবে মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। আজকের বিচারে টারথারলরা বনেদী, টিভালিয়লরা হীন। যারা আশে-পাশে গড়ে-ওঠা ছোট ছোট শহরে সাদা মানুষদের সংস্পর্শে থেকে আবার ফিরে এসেছে, তারা বা তাদের সন্ততিরা গেছে টিভালিয়ল গোষ্ঠীতে। সেইজন্য টিভালিয়লের মধ্যেও দুটি ভাগ হয়েছে, একটি খাঁটি টিভালিয়ল, অপরটি মিশ্র টিভালিয়ল।

টুরা দুটি চোখ মেলে কতো-কীই না দেখলো সারা জীবন ধরে। এই যে 'শান্তির পাহাড়ে' আজ সে আছে, এখানে সে ছিল না শৈশবে। সুঞ্জা ছিল তার বাপের নাম। বাপ নিয়াম বা পঞ্চায়েতের একজন, থাকতো বড়ো গাঁয়ে 'পাদরী বাবার বাড়ি' বলে লোকে যেটাকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়, তার কাছাকাছি, একটু নীচে। বাপের আরেক বউ ছিল, সে নাকি মারা গিয়েছিল তার নিজের মায়ের আগেই। ছোটবেলা থেকে সে দেখে এসেছে তার দাদাকে, তার থেকে বারো-তেরো বছরের বড়ো, তার এই সৎ-মায়ের ছেলে। প্রকৃতপক্ষে এই দাদার কাছেই মানুষ হয়েছে সে ছোটবেলায়। তার বাপের নাকি শেষ বয়সে মাথার গোলমাল হয়ে গিয়েছিল। টুরা শুনেছে, মাঝে মাঝে নাকি তাকে কোলে করে এই শান্তির পাহাড়ে চলে আসতো, ডাকতো— বিম্বু, বিম্বু ?

টুরা যে অশীতিপর বৃদ্ধকে 'দাদু' বলে ডাকতো, যার ঘরে আজ সে বাস করছে, তার নাম ছিল বিম্বু, তার বাপের বন্ধু।

বলতো—ওকে নিয়ে এসেছিস কেন ?

বাপ বলতো—তোর কাছে নিয়ে এলাম। এখানে রাখ্।

—কেন ?

বাপ বলতো—মেয়ে বড়ো হচ্ছে। যদি জানতে পারে আমি ওর মাকে মেরে ফেলেছি, তাহলে ও কি আমাকে ভালো চোখে দেখবে ?

—তুই ওর মাকে মেরে ফেলেছিস !

বাপ মেয়েকে বৃদ্ধের পায়ের কাছে নামিয়ে রেখে ঝর ঝর করে কেঁদে ফেলতো। দাদুর মুখে টুরা শুনেছে, তার বাপের বিশ্বাস ছিল, তার মায়ের মৃত্যুর জন্য সে-ই দায়ী। এই কথা দিনরাত ভাবতে ভাবতে তার মাথা গরম হয়ে উঠতো, এক-একদিন উঁচু পাহাড় থেকে নীচে ঝাঁপিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করতে চাইতো। ছেলে সেইজন্য সব সময় চোখে চোখে রাখতো বাপকে।

কিন্তু দাদু তাকে একদিন বলেছিল—তোর মা এই শান্তির পাহাড়েই তোকে জন্ম দিয়েছে, ঐ ইরুলদের একটা ঘর আমি চেয়ে নিয়েছিলাম তোর মা পিলুবাণীর জন্য। ব্যথা উঠেছে, ভয়ানক কষ্ট পাচ্ছে, ইরুল 'বড়ো গাঁ'য়ে চলে গেছে বুড়ী-ধাইকে ডেকে আনতে। আমি ছুটেছিলাম উটাকলমাণ্ডের দিকে, সাদা মানুষ ডাক্তারের খোঁজে। যখন তাকে নিয়ে এলাম, তখন পাঁচ-ছয় ঘণ্টা কেটে গেছে। তুই-ও মাটি ছুঁয়েছিস, তোর মাও শেষ নিঃশ্বাস ফেলেছে। ডাক্তার দেখে শুনে আফশোস করতে লাগলো। তার পরে যখন শুনলো, তোর মায়ের দুই কুড়ি বয়স হয়ে গেছে, অথচ আগে কখনো ছেলেপিলে পেটেই আসেনি, তখন মাথা নেড়ে-নেড়ে নিজের মনেই কী সব বলতে লাগলো। তারপরে আমাকে দিলো প্রচণ্ড ধমক। বললে—মাণ্ডে দিয়ে যাওনি কেন সঙ্গে সঙ্গে? সেখানে আমাদের হাসপাতাল কি ছিল না? অন্ততঃ মেয়েকে মেরে মাকে জ্যান্ত রাখতে পারতুম। তারপরে আরও কী বললে জানিস? বললে, এর স্বামী কোথায়? বললাম, ভিন গাঁয়ে। সাহেব চীৎকার করে বললে, ডেকে নিয়ে এসো তাকে। উজবুক কোথাকার। এই বয়সে প্রথম সন্তান! তোর বাপকে যখন ডেকে নিয়ে এলাম, তার আগেই সাহেব অবশ্য চলে গিয়েছিল। সদ্য-শোক-পাওয়া মানুষটাকে বকাঝকা করে আর কী হবে? সত্যি, তোর বাপ খুব কষ্ট পেয়েছিল সেদিন। তোর মাকে খুব ভালোবাসতো কিনা!

দাছুকে জিজ্ঞাসা করেছিল টুরা—বাবার মনে ওরকম ধারণা হয়েছিল কেন, দাছু ?

দাছুর মুখে ম্লান একটা হাসি ফুটে উঠেছিল—তোর বাবা একটু অদ্ভুত প্রকৃতির মানুষ ছিল। তোর মায়ের থেকে অনেক বেশী বয়স ছিল তার। তোর মাকে ভালোবাসতো, আবার রেগে গেলে অত্যাচারও করতো ভীষণ। একবার এমন মার মেরেছিল যে তাকে নিয়ে গিয়ে রাখতে হয়েছিল উটাকলমাণ্ডে, সাদা মানুষদের হাসপাতালে। তা প্রায় ছমাস পড়েছিল তোর মা ওখানে। তোর মা মারা যাবার পর তোর বাপের মনটা ভিতরে ভিতরে হায়-হায় করতো তোর মায়ের জন্য। আর আমার ধারণা, এই সব কারণেই মাথায় গোলমাল হয়ে গিয়েছিল তোর বাপের। যেদিন তার মৃত্যু হয়, সেদিন ভোর হতে-না-হতেই তোকে নিয়ে এসে হাজির। তোর তখন বয়স ছ-সাত বছর হবে। আমার কাছে বসিয়ে দিয়ে বললে—তোর টুরা এবার থেকে তোর কাছেই থাকবে। ছেলে-ছেলের বউ ওর তেমন যত্ন-আত্তি করে না। ততদিনে তোর দাদার বিয়ে হয়ে গিয়েছিল। তোর বাপ বললে, ছেলের বউ কার কাছ থেকে একটা পুটকলী নিয়েছে টুরার জন্য, ওর সঙ্গে বিয়ে দেবে বলে। আমি তা সইব কেন ? ওকে রেখে দে তোর কাছে। পুটকলী নিলেই ত বিয়ে ঠিক হয়ে যায়, সেইজন্য এই নিয়ে গাঁয়ে একটা গোলমাল হবে। আমিও নিয়াম-এর একজন, দেখে নেবো, কে কতো মোষের ছুধ খেয়েছে।

বলতে বলতে দাছুর গলা ধরে আসতো, একটুক্ষণ থেমে থেকে বলতো—সন্ধ্যেবেলা ভয়ানক ঝগড়া বেঁধে গিয়েছিল নিয়াম-এর সভায়। আমি নিয়াম-এর কেউ না, আমি যাইনি, গিয়েছিল ইরুল। এ গাঁয়ের ও-ই হচ্ছে নিয়াম-এর লোক। ওর কাছে সবটা শুনেছিলাম পরে। যারা পুটকলী দিয়েছিল, তারাই বা ছাড়বে কেন ? এই নিয়ে তর্কাতর্কি করতে করতে মাথায় রক্ত উঠে যায় সুঞ্জার, চীৎকার করে

উঠে দাঁড়িয়ে কী বলতে গিয়ে যেন ধপাস করে পড়ে যায়। ধরাধরি করে সবাই নিয়ে যায় মন্দিরে। পেলল মুখে জল দেয়, মন্তর বলে বিড়বিড় করে, কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় না। তোর বাপের আর জ্ঞান ফিরে এলো না। পরদিন ভোরে ইরুল যখন আমাকে ডেকে নিয়ে গেল, পৌঁছে দেখি—সব শেষ। আর কথা বলবে না আমার সঙ্গে। আর ভালো-মন্দের খোঁজ নিতে আসবে না।

দাদু আবার থেমে যেতো, তারপরে নিজেকে সামলে নিয়ে বলতো—সেই থেকে তুই আমার কাছেই থাকতিস। তোর দাদা এসে একদিন বলে গেল, থাক্ ও তোমার কাছে। ওর দরুণ পুটকলীটা আমরা ফেরত দিয়েছি, তারাও দেখে শুনে চুপচাপ হয়ে গেছে, বিয়ের কথা আর ওঠাচ্ছে না।

তার বিয়ের পুটকলী কিন্তু দাদুই দিয়ে যায় তার শ্বশুরের হাতে। দাদু যাকে 'ইরুল' বলে ডাকতো, সে-ই ত হয়েছিল তার শ্বশুর। শ্বশুরের একটিই সন্তান। নামটা তার বড়ো, ছোটো করে সবাই ডাকতো 'পিনি' বলে। তার থেকে বয়সে বারো-তেরো বছরের বড়ো। দাদু কিছু নীচে আলাদা একটা ঘর করে দিয়ে ছিল নিজের হাতে, সেই ঘরে তারা দুজনে সংসার করতে গেল একদিন। ভাবতে গেলে মনে হয় ঠিক যেন সেদিনের কথা। সবাই জড়ো হয়েছে, ঘটা করে ভোজ দেওয়া হলো সেইজন্য। দূরের গ্রাম থেকে ভিন্‌জাত বাদাগারা এলো গান-বাজনা করতে, কোটারা এলো। হৈ-হল্লা-খাওয়া-দাওয়ার পর তারা গেল ঐ যে অদূরে প্রকাণ্ড সিল্‌ভার-ওক গাছটা দেখা যাচ্ছে? তার পিছনে। পুরো চাঁদ দেখা দিয়েছে মাথার ওপরে। সেই আলোয় 'শান্তির পাহাড়' যেন স্বপ্নের রাজ্যে পরিণত হয়েছে। হাত-ধরাধরি করে তারা হেঁটে গেল দুজনে, বসলো গিয়ে গাছের পিছনে, ঝোপের আড়ালে। তার কোলে ঝপ করে মাথাটা রেখে শুয়ে পড়লো পিনি, বললে, বড্ড ঠাণ্ডা পড়েছে না?

—হ্যাঁ।

সে বললে, লজ্জা পাচ্ছিস নাকি ? আমি তোর অজানা কেউ ?

হেসে ফেলল সে ফিক্ করে। পিনি বললে, অজানা কেউ যদি হতাম ? কী হতো ?

তবু তার আড়ষ্ট ভাব যায় না। কিছুক্ষণ পরে পিনি আবার উঠে বসলো। তাকে দুহাতে জড়িয়ে ধরলো, বললে, এখানে থাকবো না। পালিয়ে যাবো সাদা মানুষদের ওখানে। জানিস ?

—কেন ?

ও বললে, কী বিশ্রী নিয়ম। বিয়ের রাত কাটাতে হবে বাইরে। ফিরে গেলে যে যার ঘরে যেতে হবে, একসঙ্গে থাকতে পারবো না। আমি সাদা মানুষদের কথা শুনেছি। তাদের এরকম নিয়ম নেই।

টুরা বলে উঠেছিল, মেয়ে হলে তাকে মেরে ফেলাও তাদের নিয়ম নেই।

পিনি হঠাৎ যেন ভয় পেয়েছিল কথাটায়। বলেছিল, তোর যদি মেয়ে হয় ?

শিউরে উঠেছিল সর্বাঙ্গ। মাথার ওপরে সিল্‌ভার-ওক্ গাছটা যেন তার ডালপালা নিয়ে তাদের কথা শুনছিল একমনে। সে-ও যেন হঠাৎ হায়-হায় করে উঠলো এই সময়।

পিনি বলেছিল, আমার এক দিদি হয়েছিল জানিস ? বাবা তাকে মুকেত্তি পাহাড়ে ফেলে এসেছিল।

—সত্যি !

—সত্যি। তুই শুনিসনি ?—পিনি বলে, মার বিশ্বাস, সেই দিদির আত্মাই আবার নাকি বেটাছেলে হয়ে ফিরে এসেছে আমার রূপ ধরে।

—হতে পারে।

পিনি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, আমার কিন্তু তা বিশ্বাস হয় না।

চুপ করে বসেছিল টুরা। আড়ষ্ট হয়ে। মেয়ে হওয়ার চিন্তাটা তার মনের মধ্যে প্রবল এক আতঙ্কের সৃষ্টি করছিল। পরে একদিন দাদুকে সে জিজ্ঞাসা করেছিল, হ্যাঁ দাদু, এটা হয় কেন ?

দাদু অল্প একটু হাসলো, বললে, তোর শ্বশুরকে জিজ্ঞাসা কর। নিয়াম-এর লোক। আমার চার কুড়ি পেরিয়ে গেছে বয়স, আমাদের জাতের মধ্যে এতো বছর বয়স পর্যন্ত কেউ বাঁচে না। আমি বেঁচে আছি মানুষের দুঃখ-কষ্ট পোড়া চোখ দুটো দিয়ে কেবল দেখে যাবো বলে।

একা একা এক একদিন দূরের ঝাউ-জঙ্গলে চলে যেতো টুরা। একা একা চুপচাপ বসে থাকতে থাকতে তার মনে হতো, সে আর রক্তমাংসের মানুষ নয়, ঐ কথা-বলতে-না-পারা ঝাউদেরই একজন। ওরা হাওয়ায় ডালপালা নাড়িয়ে, কিংবা টুপ্ করে পাতা ঝরিয়ে দিয়ে যে কথা বলতে চায়, টুরা যেন সব তা বুঝতে পারে। ওরা বলে, দমে যাস্ না, দরকার হলে তোর দিদিমার মতো শক্ত হয়ে দাঁড়াবি। হোক্ না তোর মেয়ে। ভয় কী?

পিনি মোষ নিয়ে বেরিয়ে গেছে অনেক দূরে। ঐ পশ্চিম পাহাড়টার কাছে। তাকে ঠিক দেখা যায় না এখান থেকে। দেখা যায়, কালো কতোগুলি বিন্দু এদিকে-ওদিকে স্থির হয়ে রয়েছে, মাঝে মাঝে এক একটা বিন্দু হয়ত বা সরেও যাচ্ছে।

তাদের ঘরে আর কেউ আসে না। গাঁয়ের টু-এলে থাকে মোষগুলো। সবার মোষই রাখা হয় সেখানে। সকাল হলে যে যার বেরিয়ে যায় মোষের তত্ত্বাবধানে। পিনিও যায়। শ্বশুরের ঘর থেকে বেরিয়ে শ্বশুর যায়। সে তার ঘরের কাজ করে, শাশুড়ী করে শাশুড়ীর ঘরের কাজ।

নিজের ঘরে সুখেই আছে। পিনিকে ভয়ানক ভালোবাসে টুরা। ওকে যেন চোখের আড়াল করতে মন চায় না। নানান গল্প বলে পিনি। এক একদিন বলে, সাদা মানুষ এসেছিল দুজন। ঐ পুব পাহাড়ের নীচে। আমাদের ভাষা বুঝতে পারে, বলতে পারে। বললে, উটাকলমাণ্ডে যাবে? আমি বললাম, না। অন্য সাহেব বললে, ফার্ণহিলে যাবি? অবাক হয়ে বললাম, সে আবার কোথায়?

সাহেব বললে, পুব পাহাড় পেরিয়ে যেতে হয়, এঁকেবেঁকে আর একটু নীচে নামতে হয়।

টুরা জিজ্ঞাসা করে, তুই কী বললি?

পিনি বললে, আমি যাবো না বলেছি।

—তাহলে?

পিনি বললে, এখন ভাবছি, না বলতে গেলাম কেন ভয় পেয়ে? হ্যাঁ বললেই হতো। দেখতাম, কী করে আমাকে নিয়ে!

টুরা আজকাল বলে—আমার সে সময় আরেক আতঙ্ক ছিল পিনিকে নিয়ে। ওর মধ্যে এরকম বাইরে যাবার বাতিক কেন? দাদু বলতো, অল্প বয়স। এ রকম হয়। চোখে চোখে রাখিস।

চোখে চোখেই রাখতে চেষ্টা করতাম,—টুরা বলে—ও একটা বাঁশের বাঁশী চেয়ে এনেছিল বাদাগাদের কাছ থেকে। সেটা মাঠে বসে বাজাতো, আমি এক একদিন গিয়ে পড়তাম আর চুপচাপ শুনতাম গাছের আড়াল থেকে অবাক হয়ে। আমাদের জাতের বুড়োরা বারণ করতো, বলতো, ভালো নয়। বাঁশী-টাশী বাজালে মনটা উদাস হয়ে যায়। জোয়ান ছেলে, তার থেকে পাথর গড়ানোর খেলা খেলুক না। বুড়োদের কথা আমার মনে ধরতো, ওকে বলতাম, বাজাস না বাঁশী, আমার ভয় করে।

পিনি বলতো, ভয় কেন?

বলতাম, তুই যদি সত্যিই চলে যাস কোথাও?

টুরা এসব কথা ইনিয়ে বিনিয়ে ছোটদের কাছে বলতো। বলতো, পিনির মধ্যে একটা যাই যাই স্বভাব ছিল। শ্বশুর ছিল বুনো মোষ ধরায় ওস্তাদ মানুষ, ও তার সঙ্গে বনের মধ্যে চলে যেতো। আর ঠিক সেই সময় আমার এমন ভয় করতো যে, কী বলবো! টিয়েকজ্রি দেবীর দয়ায় অবশ্য পিনির কিছু হয়নি কোনোদিন।

টুরা আরও বলতো—এ সব ঘটনার অনেকদিন পরে জানা গেল আমি প্রথম মা হতে চলেছি। আমার মার মনে যা হয়েছিল, আমারও

তাই হলো। যদি মেয়ে হয়? ভয়ে বুক শুকিয়ে যেতো, সারারাত ছটফট করে কাটিয়েছি এক একদিন, ঘুম আসতো না। খুব ভোরে উঠে ঝুপড়ীর বাইরে আসতাম। পুব পাহাড়ের দেবতা যখন চূড়া ছাড়িয়ে আকাশে প্রথম দেখা দিতেন, আমি চোখের জলে বুক ভাসিয়ে বলতাম, মেয়ে দিয়ো না। কিন্তু হঠাৎ একদিন আমার মনের ভাব বদলে গেল। দাত্বর কাছে একদিন খুলে বলে ছিলাম—কী হবে দাত্ব, যদি মেয়ে হয়? দাত্ব অদ্ভুত চোখে আমার দিকে তাকালো, যেন জ্বলে উঠলো দুটি চোখ। বললে, চার কুড়ি বয়স হয়ে গেছে, আমি যুঝতে পারবো না, আমাকে ওরা মুগুরের এক ঘায়েই শেষ করে দেবে। কিন্তু তুই পারবি না? পালিয়ে যাবি উটাকলমাণ্ডে। ওখানে সাদা মানুষরা তোকে দেখবে। বলেছিলাম, সত্যি? দাত্ব উত্তরে বলেছিল দিদিমার কথা। আমার নিজের দিদিমা, আমার মায়ের মা, যার নামে নাম হয়েছে আমার। সে কী করে আমার মাকে বাঁচিয়ে ছিল? সাদা মানুষরা চায় না, কেউ তার মেয়ে সন্তানকে পাহাড়ের চূড়ায় ফেলে দিয়ে আসে। কিন্তু আমাদের নিয়াম তা মানলে ত?

দাত্ব বলতো, নিয়াম তৈরী করলাম আমি। অথচ আমি আজ নিয়াম-এর কেউ নই। যতো সব পুরানো ধরণের লোকগুলো নিয়াম-এর মানুষ হয়েছে। তারা পুরানো রীতিনীতি কিছুই ফেলে দিতে রাজী নয়।

একটুক্ষণ থেমে থেকে টুরা আবার বলতে শুরু করলো—আরও কয়েক মাস কেটে গেছে। পেটের মধ্যে আমার বাচ্চা নড়ে চড়ে টের পাই। এর মধ্যে একদিন শুনলাম, বড়ো-গাঁ থেকে একটি বউ গিয়ে তার মেয়েকে মুকের্তি পাহাড়ে ফেলে দিয়ে এসেছে।

কেঁদে গিয়ে পড়লাম দাত্বর কাছে। বললাম, দাত্ব, তুমি ওকে বাঁচাতে পারলে না?

দাত্ব চুপচাপ একমনে কী যেন ভাবছিল। শুধু বললে, প্রায় চার কুড়ি বয়স। আমি আর কতদূর কী করবো? টুরা বলতো,

অথচ এই দাত্থ একদিন সত্যিই রুখে দাঁড়ালো আমার বেলায়। আমারও মেয়ে হলো, বড়ো-গাঁ থেকে অনেক লোকজন এলো। আমার শ্বশুর নিজে ত আছেই। পাছে আমি মেয়েকে নিয়ে পালাই, তাই আমার ঘরের চার দিকে পাহারা বসলো।

দাত্থ চীৎকার করে ছুটে এলো, বললে, অনেক সয়েছি, আর সইবো না। টুরার মেয়েকে যদি—

দু'চার জন দেখতে দেখতে ছুটে এসে দাত্থকে শক্ত করে ধরলো, একজন হাতচাপা দিলো মুখে। বুনো মোষ ধরে এনে যখন বলি দেয় বড়ো গাঁয়ে, তখন এমনি করেই ওরা চেপে ধরে মোষটাকে। তারপরে একজন এগিয়ে গিয়ে মোষটাকে দেয় মুগুরের ঘা, মোষটা অমনি মাটির উপরে লুটিয়ে পড়ে।

সে এক অদ্ভুত দৃশ্যই বটে। স্থবির বিম্বুর দেহে যেন বিদ্যুৎ-তরঙ্গ খেলে যায়, সবাইকে ঠেলে দিয়ে সে ছিটকে সরে আসে, বলে—আমার হাতেই দে তুই মেয়েকে। দেখি, কে কী করে ?

সাধ্য ছিল না সেদিন বিম্বুর একা কিছু করার। একদিকে বিম্বু আর টুরা, অন্যদিকে ক্ষেপে যাওয়া কয়েকটি সংস্কারান্ধ মানুষ। টুরা সেদিনকার কথা স্মরণ করতে করতে আজও উন্মনা হয়ে পড়ে। বলে, আমরা কেউই জানতে পারিনি, পিনি সেই রাত থাকতে কখন উঠে বাড়ি থেকে পালিয়ে ছিল। সেদিন আমাদের দুই দলে একটা খুনোখুনিই বেঁধে যেতো—যদি না হঠাৎ আমরা শুনতে পেতাম, কতগুলো হৈ-হৈ হল্লার শব্দ। পুব-দক্ষিণ দিক থেকে ঘোড়া ছুটিয়ে একদল সাদা মানুষ এসে হাজির। লাল জামা গায়ে, মাথায় টুপির মতো কী পরেছে, তাতে সূর্যের আলো লেগে চিক্ চিক্ করছে। ওদের কোমরে ঝুলছে তরোয়াল, কাঁধে বন্দুক। তারা এসে পড়লো আমাদের মধ্যে দেখতে দেখতে। ঘোড়া থেকে জনকয়েক নেমে পড়লো। একজন আমাদের ভাষায় বললো, আমরা জানতে পেরেছি, বাচ্চা একটা মেয়েকে তোমরা পাহাড়ে দিয়ে আসবে।

আমরা তা হতে দেবো না। হতে দিতাম, যদি তোমরা একমত হতে। একজন মানুষও যদি আপত্তি করে, তাহলে ও-কাজ করা আর তোমাদের চলবে না।

সাদা মানুষটার কথা শুনে আমার হাত ধরে দাদু তাদের কাছে নিয়ে গেল। বললে, তাকিয়ে দেখ। এ হচ্ছে মা, এও চায় না ব্যাপারটা, আমিও চাই না।

সাদা মানুষটি বললে, পিনি বলে একটি লোক ছুটে গিয়ে আমাদের খবর দিয়েছে।

দাদু বললে, সে-ই বাচ্চাটার বাবা।

সাদা মানুষটি চোখ বড়ো বড়ো করে বললে, বটে!

টুরা বলে—এ-গাঁ সে-গাঁ থেকে ছুটে আসা লোকগুলো তখন ভয়ে জড়ো-সড়ো হয়ে একদিকে জোট বেঁধে দাঁড়িয়ে পড়েছে। সাহেব বললে, শোনো তোমরা, এই পাহাড়-পর্বত-মাঠ-বন যা দেখছ, সব আমরা নিয়ে নিয়েছি, এ সবই এখন আমাদের। আমরা যা আইন করবো, তাই চলবে।

টুরা আজও সেকথা স্মরণ করতে করতে উদাস হয়ে যায়। বলে—আমাদের জাতের সমস্ত লোকগুলোর মধ্যেই যেন একটা চাপা উত্তেজনার ঢেউ বয়ে যায়। কে একজন যেন সাহস করে দু-পা এগিয়েও আসে, বলে, আমাদের নিজেদের নিয়ম-কানুন আর চলবে না?

সাহেব সবার দিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিলো, তারপরে বললে, তোমাদের কোনো নিয়ম-কানুন আর রীতিনীতিতে হাত দেওয়া আমাদের উদ্দেশ্য নয়। তোমরা যেমন আছো, তেমনি থাকবে। তোমাদের নিয়াম-এর অধিকারও আমরা মেনে নিচ্ছি। কিন্তু যে ব্যাপারগুলো তোমাদের নিয়ামও নিষ্পত্তি করতে পারবে না, সেগুলো করবো আমরা, অর্থাৎ আমাদের লোক। উটাকলমাণ্ডে আমাদের তহশীলদার থাকবেন, তিনিই হবেন তোমাদের সর্বোচ্চ কর্তা। আমি

তাঁরই নির্দেশে তোমাদের জানাচ্ছি, বাচ্চা মেয়েদের মেরে ফেলা আর চলবে না। চলতো, অর্থাৎ এতেও আমরা ভ্রূক্ষেপ করতাম না, যদি না তোমাদের লোক গিয়ে আমাদের কাছে আপত্তি জানাতো। আর কে আপত্তি জানিয়েছে? না, বাচ্চা মেয়েটার বাপ নিজে।

টুরা আজও গল্প করে—সেদিন সাহেবরা চলে যাবার পর আমাদের লোকগুলো যেন ক্ষেপে গেল। সাহেবদের সঙ্গে ঝগড়া করবে, এমন সাহস কারুর নেই। তাই আমার মেয়ে বেঁচে গেল অবশ্য। কিন্তু মুশকিল হলো পিনিকে নিয়ে। সে যখন ফিরে এলো, তখন তাকে ওরা ছিঁড়ে খায় আর কী! বলে, সাহেবদের খবর দিয়ে আনিয়েছিস তুই! তোকে টুঁটি টিপে মেরে ফেলবো।

সেখানেও ঝাঁপিয়ে পড়ে গিয়ে আমার দাদু। বলে, ওর গায়ে খবরদার হাত দেবে না। ওর সাধ্য কী যে ও যায়? ওকে ভোরবেলা ঘুম থেকে আমিই তুলে দিয়েছি, আমিই ওকে পাঠিয়েছি সাহেবদের কাছে। লোকগুলো পিনিকে ছেড়ে ওর দিকে রুখে দাঁড়ালো, বললে, তুই!

পিনি তখন বাধা দিয়ে কী যেন বলতে যাচ্ছে, তার কথাটাকে চীৎকারে ডুবিয়ে দিয়ে দাদু বললে, হ্যাঁ, আমি। আমি বরাবর বাধা দিয়ে আসছি, তোমরা ত জানই। এই টুরার ঠাকুমার বেলায়ও বাধা দিয়েছি, গাঁয়ের বুড়োদের জিজ্ঞাসা করে দেখতে পারো। আমি আজও চাই না। সাহেবেরা ঠিকই বলেছে—মেয়ে মেরে ফেলা আর চলবে না।

টুরা কথাগুলো বলতে বলতে যেন শিউরে ওঠে, বলে, লোক-গুলো এমন ক্ষেপে গেল, যেন তখ্‌খুনি দাদুকে মেরে ফেলবে। একজন বললে, আমাদের জাতটাকে তুই সাহেবদের কাছে বিক্রী করে দিলি। বুঝতে পারছিস সেটা? কেউ বললে, টিয়েকৃজ্রি দেবী চটে যাবেন। অন্যরা বললে, ডাইনীর চোখ পড়বে, গাঁয়ে অকাল পড়বে, মোষের গোয়ালে মড়ক লাগবে।

হয়ত দাহুকে সেই মুহূর্তেই মুগুরের ঘায়ে মেরে ফেলতো, কিন্তু সাহেবরা যদি টের পেয়ে রেগে যায়, এই ভয়ে কিছু আর করলো না।

টুরা বলে—সবাই একে একে সেদিন যার যার নিজের ঘরে ফিরে গেল বটে, কিন্তু কেউই খুসী নয়, চাপা রাগে জন্তুর মতো যেন ফুঁসছে। সব থেকে অবাক কাণ্ড হলো, আমাদের সঙ্গে শাশুড়ী পর্যন্ত কথা বন্ধ করে দিলো। মেয়েটাকে বুকে করে নিজের ঘরে দিন কাটাই, কেউ আসে না দেখতে। বাপ-মায়ের কাছ থেকে যেন ছিটকে সরে এসেছে আমার স্বামীও। সে-ও যায় না ওদের কাছে। জিজ্ঞাসা করি, ভয় করে না তোর? উত্তর দেয়, ভয় কিসের? বলি, মেয়েকে যে পাহাড়ে দিলাম না, এতে যদি সত্যি গাঁয়ে অকাল পড়ে, গোয়ালে মড়ক লাগে? স্বামীর মুখ গম্ভীর হয়ে যায়, বলে, লাগুক।

—খাবি কী?

স্বামী বলে, বাদাগাদের মতো চাষবাস করবো।

—চুপ চুপ! বলে ওকে আমি থামিয়ে দিতাম, টোডারা সব সইতে পারে, এই জিনিসটাই সইতে পারে না। তারা সারা জীবন মোষ চরাবে, মোষের হুধ খাবে, মোষের হুধ বিক্রী করে ভাত-কাপড় আনবে, কিন্তু নিজেরা চাষবাস করবে না কখনোই।

টুরা বলে—আর যা-ই হোক, সেদিন থেকে মেয়ে মেরে ফেলা এক রকম বন্ধ হয়ে গেল বলা যায়। সাহেবদের ভয়ে কেউ আর তা করতো না। দাহু বলতো, সাহেবদের ভয়ের কথাটাই ভাবছিস? নিজেদের কথাটা ভাবছিস না? তোর দিদিমাই প্রথম সবার চোখ খুলে দিয়েছিল, জানিস? মন্দির করে তার পুজো করা উচিত।

– দাহু বলে ডাকি ত?—টুরা বলে, তাই ঠাট্টার সুরে হেসে বললাম, তাহলে ত আমারই পুজো করা উচিত, সবাই বলে দিদিমা মরে আমার রূপ নিয়ে জন্মেছে। আমার নামও ত তাই—টুরা।

দাহু অদ্ভুত চোখে আমার দিকে সেদিন তাকিয়ে রইলো কিছুক্ষণ ধরে। আমার হাসি বন্ধ হয়ে গেল, সেই চাউনী দেখে আমিও

অবাক হয়ে গেলাম। পরে বুঝেছিলাম, আমাকে দেখছে না, আমার মধ্যে দেখছে আমার দিদিমাকে। দিদিমা তার মেয়েকে বাঁচিয়েছিল কেমন করে সে গল্পও আমি শুনেছিলাম দাত্বর কাছ থেকে। সেদিক থেকে আমার কাজটা আর কতটুকু এগিয়েছে? আমার মেয়েকে আমি বাঁচালুম, অতি সহজে বলা যায়। (তখন ১৮৮০-৮১ সাল, ওদের মধ্যে সন্তান বিসর্জন বন্ধ হয়ে যায়। অথচ আমাদের বাংলাদেশে গঙ্গাসাগরে সন্তান-বিসর্জন তখনো চলেছে, তার পরেও চলেছে বলে জানা যায়।)

টুরা আরও বলে—দিন যায়। মেয়েটা আমার তখন বছর দেড়েকের, টলোমল করে হেঁটে হেঁটে বেড়ায়, মুখে আধো আধো স্বরে কথাও ফুটেছে ত্বটো-একটা। এমন সময়, হঠাৎ একদিন দেখি, দূরের মাঠ থেকে ছুটতে ছুটতে আমার শ্বশুর আসছে। এসে দাঁড়ালো একেবারে আমার ঘরের সামনে, হাঁপাতে হাঁপাতে বললে, পিনি কোথায়?

অবাক হলাম। শ্বশুর কখনো আসে না। কী করেছে? শ্বশুর আবার বললে, পিনি কোথায়?

—মাঠে।

—বিম্বু?

বললাম, দাত্ব? দাত্ব তার ঘরে। কী হয়েছে?

উত্তর না দিয়ে শ্বশুর গেল দাত্বর কাছে। আমিও মেয়েটাকে কোলে করে পিছনে পিছনে গেলাম।

—বিম্বু, বিম্বু?

দাত্ব বাইরে এলো। শ্বশুর বললে, বনে গিয়েছিলাম।

—কেন?

—বুনো মোষ ধরতে।

আমার শ্বশুর ছিলো বুনো মোষ ধরায় ওস্তাদ। তার আগে ছিল দাত্ব নিজে। শ্বশুর দাত্বরই শাকরেদ। বুড়ো হয়ে পড়ায়

দাদু আর যায় না, শ্বশুরই যায় তার চেলাদের নিয়ে। সেইজন্য টোডারা শ্বশুরকে খুব খাতির করে চলে।

দাদু জিজ্ঞাসা করলো, কী হয়েছে?

শ্বশুর বললে, বুনো মোষের দল এসেছে। কিন্তু ধরবো কী, মড়ক লেগেছে। একের পর এক শুয়ে পড়ছে, ধড়ফড় করছে, হাত-পা ছুঁড়ছে, আর ব্যস, তারপরেই চুপচাপ। চোখদুটো স্থির, নাক দিয়ে নিঃশ্বাসও পড়ছে না, সারা গা হিম। দাদুর মুখখানা কালো হয়ে উঠলো। শ্বশুর বললে, কী হবে?

—চল্।

—তুমি যাবে?

দাদু বললে, হ্যাঁ।

—মোষ ধরতে?

—হ্যাঁ। যারা জ্যান্ত আছে, তাদের ধরবো।

শ্বশুর বললে, পারবে না। ক্ষেপে আছে। দূর থেকেই টের পেয়ে যাচ্ছে যে, মানুষ আসছে। না, পালাচ্ছে না, উলটে শিং বাগিয়ে ছুটে আসছে।

দাদু বললে, কিন্তু তবুও চেষ্টা করতে হবে। মোষ না হলে টোডারাও যে মরবে!

দাদুরা চলে গেল। টুরা বলে—দাদুরা টিলা পেরিয়ে ওক্ গাছের ছায়া ছাড়িয়ে ইউক্যালিপটাসের জটলার কাছে বাঁক ঘুরে ওরা নীচে নেমে গেল বনের দিকে।

ততক্ষণে সমস্ত উপত্যকায় সাড়া পড়ে গেছে। একে একে এদিক থেকে ওদিক থেকে তাদের শান্তির পাহাড়ে আসতে লাগলো মানুষ। যতো বেলা বাড়ছে, ততই আসছে তারা। পুব পাহাড়ের দিক থেকে দক্ষিণ পাহাড় থেকে, উত্তর থেকে। মাথায় শনের মতো বড়ো বড়ো সাদা চুল, বুক পর্যন্ত নেমে আসা সাদা দাড়ী, গায়ে কম্বলের মতো মোটা চাদর জড়ানো, পরনে খাটো সাদা কাপড়, হাতে লাঠি, খালি

পা—বুড়োর দল একে একে এসে জড়ো হতে লাগলো ইউক্যালিপটাসের জটলার কাছে। এলো আধাবয়সীর দল, বড়ো বড়ো কালো চুল আর কালো দাড়ী।

টুরা বলে—আমি কাছে যেতেই সবাই হাঁ-হাঁ করে উঠলো, বললে, মেয়েরা এখানে কেন? ঘরে যাও। পিনিও ঘরে নেই। সে তাদের গাঁয়ের তরুণদের জুটিয়ে বনের দিকে চলে গেছে। কী যে হচ্ছে বনের মধ্যে কে জানে!

বুড়োরা সব মাথায় হাত দিয়ে বসেছিল। মোষ পালন তাদের একমাত্র জীবিকা। তাই বুনো মোষের দলে যদি মড়ক লাগে ত সত্যিই চিন্তার কথা। তাদের যা মোষ আছে, তাদের মধ্যে কেউ কেউ এক সময় না এক সময় দুধ দেওয়া বন্ধ করবেই, তখন নতুন মোষ না ধরলে গৃহস্থের চলে কী করে? ইরুল তখন তার শাকরেদদের নিয়ে বনে চলে যায় নতুন মোষের সন্ধানে, অনেক কৌশল আর অনেক কাণ্ডের পর ধরে আনে এক এক বারে এক একটি মোষ।

টুরা বলে—বেলা গড়িয়ে যাচ্ছে, আমি ঘর-বার করছি মেয়েকে নিয়ে, বুড়ো আর আধাবয়সীর দল চুপচাপ পাথরের মূর্তির মতো বসে আছে ইউক্যালিপটাসের তলায়—বনের মধ্যে তখন কী হচ্ছে কে জানে! ওক গাছের পাতাগুলো সব স্থির হয়ে আছে, ওরা যেন নিঃশ্বাস বন্ধ করে কী এক সংবাদ শোনবার চেষ্টা করছে। পশ্চিম পাহাড়ের চূড়োর কাছে ধূসর বর্ণের একটা মেঘ ভেসে এলো। পূব পাহাড়ের দিকে কে যেন তাকে ডাকছে, দূর থেকে একটানা একটা ধ্বনি ভেসে আসছে—উ-উ-উ!

ওক গাছগুলো যেন হঠাৎ চমকে উঠলো। পাতা কাঁপিয়ে নীরব ভাষায় যেন বলে উঠলো, কে রে চীৎকার করছিস?

দূরের ইউক্যালিপটাসগুলো ঝাঁকড়া মাথা নাড়িয়ে ওক গাছদের কী যেন ইঙ্গিত করলো, আর তার সঙ্গে সঙ্গে যেন আগের মতোই আবার স্থির হয়ে গেল 'ওক্'-এর দল।

ধুসর মেঘটা ক্রমে ক্রমে কালো হয়ে গেল। কালো হয়ে গিয়ে পশ্চিম পাহাড়ের মাথা ছাড়িয়ে তাদের উপত্যকার দিকে এগিয়ে আসতে লাগলো পাহাড়ের বুকে ছায়া ফেলে ফেলে।

হঠাৎ কে যেন দূরে কী দেখে উঠে দাঁড়ালো। তারপরে চীৎকার করে উঠলো, আসছে।

বুড়ো আর আধাবুড়োর দল সবাই একযোগে উঠে দাঁড়ালো। ওক্ গাছেরা পর্যন্ত মাথা ঝুঁকিয়ে দেখতে লাগলো ওদের সঙ্গে।

সার দিয়ে ওরা আসছে। কারুর মুখে কোনো কথা নেই। মাথা নীচু করে সম্পূর্ণ নীরবে ওরা পায়ে-চলা পথ ধরে উৎরাই ভেঙে পাহাড়ের ওপরে চলে আসছে। একবার একটা বড়ো টিলার আড়ালে ওরা অদৃশ্য হয়ে গেল। তারপরে আবার ওদের দেখা গেল কিছুক্ষণ পরে। প্রথম চারটি লোকের পরেই আসছে ইরুল, তার কাঁধের ওপর সাদা মতন কিসের একটা পুঁটলী, তার ভারে ও যেন নুয়ে পড়েছে।

বুড়োরা নিজেদের মধ্যেও কোনো কথা বলাবলি করলো না। যেন নিঃশ্বাস রুদ্ধ করে ওরা একটা চলমান ছবি দেখছে। হয়ত খানিকটা বুঝতে পারছে, হয়ত বা পারছেও না।

ইরুল এক সময় উঠে এলো ঘোরা পথ পেরিয়ে ওদের কাছে। বিরাট পুঁটলী বলে যেটাকে মনে হয়েছিল, সেটা পুটুকলীতে জড়ানো রক্তাপ্লুত একটা মৃতদেহ।

পিনি ওদের পিছনে ছিল। সে ওদের কাছে না দাঁড়িয়ে ছুটে চলে এলো টুরার কাছে। টুরা বলে—ওর মুখের দিকে তাকিয়েই আমি যেন সব বুঝতে পারলাম। কিন্তু আশ্চর্য, আমার কান্না পেলো না। শুধু মনে হলো, আমার বুকের ভিতরটা যেন হঠাৎ শুকিয়ে গেছে! বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে থাকবার পর কোনক্রমে বললাম, ওখানে যাবো?

পিনি বললে, না।

—না কেন ?

বুড়োরা রাগ করবে। নিয়ম নেই। আরও পরে যাবি।

টুরা বলে—তখনো মনে হচ্ছে, বুক ফেটে একটু কান্না বেরিয়ে আসবে বুঝি! কিন্তু এলো না। ঐ বুড়ো ওক্ গাছটার মতো চুপচাপ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দীর্ঘ নিশ্বাস ফেললাম শুধু।

ওদের কেউ কেউ নীচে গেল আবার। দা দিয়ে বাঁশ কেটে আনলো। একটা মানুষকে বয়ে নিয়ে যেতে পারা যায়, এমনি করে বাঁশের একটা ছোট্ট মাচান মতন তৈরী করলো। তারপরে আরও কতো কী করলো।. টু-এল থেকে একটা মোষও নিয়ে আসা হলো। তাকে কাছেই বেঁধে রাখলো কিছুক্ষণ। তারপরে রওনা দিলো, ইউক্যালিপটাস ছাড়িয়ে ডান দিকের পথ ধরে ওরা সবাই চলতে লাগলো। ধীরে ধীরে চোখের আড়াল হয়ে গেল।

টুরা বলে—আবার এক সময় ছুটে এলো পিনি। বললে, চল্।

চললাম। গাঁয়ের অন্য মেয়েরাও চললো। গাঁ মানে তিন-চারটে পাশাপাশি কুঁড়ে ঘর। আবার বেশ খানিকটা দূরে—পাহাড়ের খাঁজ খুঁজে নিয়ে সেখানে বানিয়ে নিয়েছে ওরা দুটি কি তিনটি ঘর। এই ভাবে ছাড়া ছাড়া হয়েই ত ওরা থাকে। আজ, কী এক অদৃশ্য টানে সেই সব ছাড়া ছাড়া ঝুপড়ী থেকে মেয়েরা বেরিয়ে এলো, চললো পিনির সঙ্গে।

টুরা বলে—ঠিক জায়গাটিতে গিয়ে পড়লাম আমরা এক সময়। ততক্ষণে মোষটাকে মেরে ফেলা হয়েছে। বড়ো গাঁ থেকে মন্দিরের পেলল বা পুরোহিতমশাই এসেছেন। বেশ বুড়ো হয়ে গেছেন। চেহারাটা ঠিক তাদের মতন নয়, আবার কিছুটা মিলও পাওয়া যায় বটে। নামটা অদ্ভুত। যে ধরনের নাম ওদের জাতের মধ্যে কখনো শোনা যায় না—অজিত। এক হিন্দু পণ্ডিত (দাদুর কাছ থেকে শোনা) লুকিয়ে ঐ বড়ো গাঁয়ে বাস করে গেছে কিছুদিন, এক টোডা মায়ের গর্ভে জন্ম নিলেও আসলে সে সেই হিন্দু পণ্ডিতেরই সন্তান।

মন্দির বলতে তাদের কিছু ছিল না, ঐ পণ্ডিতই ত প্রথম তৈরী করে দিয়ে যায় মন্দির। টুরা শুনেছে, সেই থেকে মরা মানুষের সঙ্গে জ্যান্ত মোষ মেরে ফেলার রীতি হয়েছে ওদের মধ্যে। কোনো সময় লোক বুঝে, তিনটে কি চারটে পর্যন্ত মোষ মারা হতো। আর, আজ যে গেল তার কাছে টোডারা সব দিক দিয়ে ঋণী থাকলেও একটার বেশী মোষ দেওয়া গেল না। নির্দিষ্ট মোষের সংখ্যা তাদের, নতুন বুনো মোষ না ধরে আনলে কাজ চলবে কী করে? বুনো মোষেদের মধ্যে মড়ক চলছে বলেই এই কাণ্ড হলো, টু-এল-এর মোষ বলি দেওয়া হলো।

টুরা আরও বলে—দাহুর আত্মা সুখে থাকবে বলেই এই ব্যবস্থা। সেই অজানা জগতে দাহুর একা একা চলবে কী করে? তাই এই মোষ বলির ব্যবস্থা। মোষের আত্মাটাও দাহুর সঙ্গে রইলো, দাহুর কোনো কষ্ট হবে না।

টুরা বলে—পেলল মশাই নিজের হাতে কাঠ সাজালেন। চিতা তৈরী হলো। দাহু পুড়তে লাগলো। তার আগে প্রথামতো, আমরা মেয়েরা, গোল হয়ে বসে, চীৎকার করে কাঁদলুম কিছুক্ষণ। আমার দাহু গেছে, আমার কান্না এমনিতেই পেলো, কিন্তু আর যারা? কান্না না পেলেও কাঁদতে হবে, এমনি নিয়ম। টুরা সেদিনের কথা পরিষ্কার স্মরণ করতে পারে। বলে—মনে হয়, এই ত সেদিনের কথা। পিনি আমাকে রাত্রে সব কথাই বললে। দাহু একটা মোষকে প্রায় ধরে ফেলেছিল, এমন সময় হঠাৎ সেটা ঘুরে দাঁড়ালো, মড়ক লেগেছে ওদের মধ্যে, ওরা তাই সব সময়ই ভয়ে-ভয়ে থাকে। তাই কানে শোনবার, কিংবা নাক দিয়ে গন্ধ শোঁকবার ক্ষমতাটাও হয়ে যায় অনেক বেশী। তা না হলে এমন করে ওটা সব টের পেয়ে যেতো না, ঘুরেও দাঁড়াতো না। আর দাঁড়াতে না দাঁড়াতেই চোখের পলকে শিং বাগিয়ে দাহুর দেহটাকে চেপে ধরবার চেষ্টা করলো। আমরা দেখলাম, শিং ছুটো ধরে দাহু শূন্যে উঠে গেল, পরক্ষণেই আছড়ে পড়লো মাটিতে। আমরা গিয়ে পড়বার আগেই সব শেষ।

পিনি বললে, বাবা মোষটাকে মাথায় ঘা মারলো খুব জোরে। মোষটা মাথা ঘুরে পড়ে গেল খানিকটা দূরে গিয়ে। কিন্তু সে-সব কি আমাদের দেখবার মন ছিল? দাদুকে নিয়েই তখন আমরা ব্যস্ত। টুরা বলে, আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম। দাদু কিছু বলে যায়নি শেষ সময়? পিনি উত্তর দিয়েছিল, বলবে কী? বলবার আগেই শেষ হয়ে গেছে।

টুরা বলে—দাদু চলে যাবার পর মনে হতে লাগলো, মাথার ওপর থেকে পাহাড় বুঝি সরে গেছে। আমাদের টু-এল-এর মোষ-গুলোর অনেকেই দুধ বন্ধ করেছে, নতুন মোষ না হলে চলবে কী করে? খাবো কী? গাঁয়ের মরদরা কতো চেষ্টা করলো, একটা মোষও পেলো না। উলটে নিজেদের মোষগুলোকে যাতে মড়ক এসে না ধরে তার জন্য ভয়ে ভয়ে দিন কাটাতে লাগলো।

টুরা বলে—আধপেটা খাওয়া শুরু হলো শান্তির পাহাড়ে। কেউ কেউ পাহাড় পেরিয়ে নিজেদের ভাগের মোষ সঙ্গে নিয়ে দূরে কোথাও চলে গেল। কার কথা বলবো? আমার শ্বশুর আর শাশুড়ীও একদিন চলে গেল দক্ষিণ পাহাড়ের দিকে। পিনি শুধু বললে, আমরা কিন্তু যাবো না।

টুরা বলে—যেমন শ্বশুর-শাশুড়ী চলে গেল, তেমনি ভিন গাঁ থেকে লোক এলো আমাদের গাঁয়ে বাস করতে। সত্যি কথা বলতে কী, আমাদের লোকগুলো এমনি স্বভাবেরই। মন করলো ত ডেরা তুলতে তর সয় না, তখ্‌খুনি পালাবে।

বলতে বলতে টুরার মুখখানা ম্লান হয়ে আসে, বলে—সে সব কী দুঃখের দিনই না গেছে! কচি মেয়েটাকে নিয়ে উপোস করে দিন যায়। পিনি বললে, বাদাগাদের গাঁয়ে গিয়ে চাষবাস করি।

সত্যিই গেল। যাকে বলে, জন খাটা। সারাদিন ওদের মাঠে খাটলে কিছু চাল আর দুধ পাওয়া যাবে। ও গেল তাই খাটতে। গাঁয়ের সবাই ছি-ছি করতে লাগলো, তবু ও গেল, কারুর

বারণ শুনলো না। কিন্তু কদিন? দিন চার পাঁচ খাটবার পরই শরীর কাহিল হয়ে পড়লো। সারা গায়ে কাঁপুনী ধরে জ্বর এলো। বললে, চাষবাস আমাদের পোষায় না, সত্যি! বললাম, যেতে হবে না আর।

জ্বরের ধমকে চোখ দুটো লাল। বললে, না গেলে তোদের খাওয়াবো কী? বললাম, খাবো না, না খেয়ে মরবো। তা বলে বেঘোরে প্রাণটা দিবি তুই?

ওকে শান্ত করে শুইয়ে রেখে মেয়েকে কোলে নিয়ে হাঁটতে লাগলাম। হাঁটতে হাঁটতে পূব পাহাড়ের দিকে চললাম। পূব পাহাড়ের মধ্য দিয়ে পথ ঘুরে গেছে বড়ো গাঁয়ের দিকে। 'বড়ো গাঁয়ে' পৌঁছতে পৌঁছতে অনেক দেরী হয়ে গেছে। পথে আসতে আসতে দক্ষিণ দিকে চোখ পড়ায় অবাক হয়ে থমকে দাঁড়িয়ে রইলাম খানিকক্ষণ। কে আমি, কী জন্যে চলেছি, সব যেন গোলমাল হয়ে গেল।

বলতে বলতে টুরার চোখ দুটো যেন বুজে আসে, বলে—উটাকলমাণ্ডে গেছিস কখনো তোরা? আমি একবার গিয়েছিলাম পিনির সঙ্গে। সাহেবদের বাড়ীর সামনে ওঠা-নামা করবার জন্য সিঁড়ি ছিল। আমার সেদিন মনে হয়েছিল, পাহাড় কেটে কেটে অজস্র সিঁড়ি তৈরী করেছে, আর তাতে ছোট ছোট লতানে গাছ উঠেছে, দূরের থেকে দেখায় ঠিক ঝোপের মতো। সেখানে মানুষ-জনও দেখতে পেলাম, কাজ করছে তারা। তাদের মধ্যে সাদা মানুষও আছে একজন, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাজের তদারক করছে।

আমার চোখে তখন সব একেবারে নতুন লাগছে। সেই জন্য কোথায় যাচ্ছি, কী করতে যাচ্ছি সব যেন ভুল হয়ে গেল। আমাদের মেয়েরা বেশীর ভাগ ঘরের কাজ নিয়েই থাকে, পথে ঘাটে বেরোয় কখন? তাই, দূর থেকে আমাকে মেয়ে বলে চিনতে ওদের একটু দেরী হলো। কিন্তু যখন চিনলো তখন কী আশ্চর্য, হাতের কাজ

বন্ধ হয়ে গেছে। কে একটি লোক চীৎকার করে কী যেন বললোও বটে।

আমি তখন যেন একেবারে হক্‌চকিয়ে গেছি। নইলে একটা লোক যে খাঁজ-কাটা-সিঁড়ি দিয়ে দৌড়ে দৌড়ে ছুটে আসছে, সেটা দেখেও চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলাম কেন?

টুরা এই সময় একটু যেন দম নেবার জন্যই থেমে যায়। ছোটরা ওর চারপাশে ঘিরে বসে গল্প শুনছে। তারা একসঙ্গে কলরব শুরু করে দিলো—তারপর? তারপর?

টুরা বলতে শুরু করলো—তখন আমার কাঁচা বয়স, এককুড়ির কিছু বেশী মাত্র, মেয়েটা কোলে। অজানা অচেনা লোক দেখলে ভয় পাবারই কথা। অথচ ভয় নেই ডর নেই—যেন পুতুলের মতো হয়ে গেছি! আসলে ঐরকম পাহাড়-কেটে সিঁড়ি বানানো ত আগে কখনো দেখিনি! দেখে আমার মাথাই ঘুরে গিয়েছিল!

লোকটা ও-পাহাড় থেকে নেমে এ-পাহাড়ে উঠে এলো, এতে বেশ সময় লাগবার কথা। আমি তার মধ্যে পালিয়ে যেতে পারতাম। মেয়েটাও এর মধ্যে একবার ককিয়ে উঠতে পারতো। ওটা ত দুধ টানতে টানতে একসময় ঘুমিয়ে পড়েছে।

লোকটার গায়ে জামা, মাথায় পাগড়ী—বেশ জোয়ান চেহারা, কালো রঙ, মাথায় ঝাঁক্‌ড়া ঝাঁক্‌ড়া চুল। অমন জামা কাপড় পরা না থাকলে ঠিক বুনো 'কুরুম্বা' বলে ভেবে নিতাম। সেই কুরুম্বা, যারা নীচে, বনের মধ্যে থাকে—যাদের নামে পর্যন্ত ভয় পায় আমাদের লোকেরা।

যাই হোক, লোকটা এসে আমার সামনাসামনি দাঁড়ালো। অতোটা ছুটে এসে হাঁপাচ্ছে। একটু দম নিয়ে কী যে গড়-গড় করে বলে গেল, তার এক বর্ণও বুঝলাম না।

আমি লোকটাকে পাশে ফেলে সামনের দিকে এগিয়ে গেলাম। লোকটা সেই সিঁড়িওয়ালা পাহাড়টার দিকে মুখ ফিরিয়ে চেঁচিয়ে

চেঁচিয়ে কী যেন বলতে লাগলো—সেখান থেকে সেই সাদা মানুষটা সাড়া দিয়ে কী যেন বললে। তারপরে, কথাবার্তার আওয়াজ সব থেমে গেল। সামান্য একটু ঘাড় ফিরিয়ে লক্ষ্য করলাম, সেই কুরুম্বাদের মতন লোকটা পিছিয়ে পড়েছিল, এবার হন্‌হন্‌ করে এগিয়ে আসছে।

আমি ততক্ষণে আরও জোরে পা চালিয়ে দিয়েছি। জওয়ান লোকটা ইচ্ছা করলেই আমার কাছাকাছি এসে পড়তে পারতো, কিন্তু তা করলো না। লক্ষ্য করলাম, বেশ খানিকটা দূরত্ব বজায় রেখেই সে আমার পিছনে পিছনে আসছে।

এমনি করতে করতে আরও কয়েকটা বাঁক ঘুরলাম। কখনো একটু উঁচুতে উঠছি, কখনো নীচুতে। উঁচু-নীচু ঢেউ খেলানো পথ। লোকটা কিন্তু সমানে আমার পিছনে পিছনে হেঁটে আসছে। কী ওর উদ্দেশ্য কে জানে! ততক্ষণে ভয়টা আমার কেটে গেছে বললেই হয়। এটুকু বুঝেছি লোকটা আমার ঠিক ক্ষতি করতে চায় না। তাহলে যে আঁকাবাঁকা নির্জন রাস্তা পার হয়ে এলাম আমরা, যেখান থেকে চীৎকার করলেও কারুর কানে সে চীৎকার পৌঁছতো না, সেখানেই একটা কিছু করে বসতো লোকটা।

দেখতে দেখতে আমরা এসে গেলাম একটা রাস্তার মোড়ে। রাস্তার মোড় মানে, যেখানে দুটি সরু পায়ে-চলা পথ এসে মিশে গেছে। আমাদের ডানদিক থেকে যে পথটা এসে মিশলো, সেটা সটান নীচে নেমে গেছে। ওটা দিয়ে বাদাগাদের গাঁয়ে যাওয়া যায়। কোটাদের ঝুপড়ীতেও যাওয়া যায়।

আমরা আরও বাঁয়ে ঘুরে আমাদের বড়ো গাঁয়ের দিকে চলেছি। বড়ো গাঁ ঠিক একটা বড়ো ঢেউয়ের মতো। পাথরের ঢেউ হঠাৎ উঁচু হয়ে আবার নীচে নেমে গেছে। উঁচুতে ওঠা মাত্রই ছবির মতো সব চোখে পড়ে। দূরে, অনেক নীচে সিরুভবানী নদী চোখে পড়ে। গাছপালা লতা-গুল্মের আড়ালে নীল নীল জলরেখা।

আর, এদিকে সাদা মানুষদের মেমরা কজন থাকে যেখানে, সেই সাদা মানুষদের মন্দিরটা চোখে পড়ে প্রথমেই। মন্দিরের ছাদের রঙটা লাল, চূড়োর কাছে সাদা ক্রশটা দাঁড়িয়ে আছে।

টুরার সব মনে পড়ে যায় দেখতে দেখতে। বালিকা বয়সে সে ত এই গাঁয়েই কাটিয়েছে কিছুকাল। পাদরী-বাবা বলে কে একজন নাকি আগে থাকতো ওখানে, তার কবর আছে মন্দিরের সংলগ্ন বাগানে, সারি সারি ইউক্যালিপ্‌টাস গাছ দিয়ে ঢাকা। ওরা ঐ যে মন্দির-চূড়ায় রেখেছে, সেই চিহ্নই আবার দিয়েছে কবরের মাথায়, যাকে ওরা বলে ক্রশ। দাদু বলতো, তাদের ছোটবেলায় 'ক্রশ' দেখেছিল পাগল ফোরির কাছে। সাদা মানুষদের মন্দিরের পাশে যে উঁচু ঢিবিটা দেখা যাচ্ছে, তারই গায়ে ঝাউ গাছের জঙ্গল আজও বাতাসে বাতাসে মাথা লুটিয়ে দোল খায়। সেই ঝাউদের শরীরে ছিল অসংখ্য কাটা-কাটা দাগ। পাগল ফোরি যতদিন বেঁচে ছিল, দাগ কেটে রাখতো ঝাউয়ের গাছে, কটা টোডা মরলো, আর কটা টোডা জন্মালো—তার হিসেব।

ডান দিকে তাকালে আরও একটি টিলা চোখে পড়ে, তার একদিকে বড়ো গাঁয়ের মন্দির, যেখানে পেলল থাকে। আর অন্যদিকে, গাঁও বুড়োর ঘর, আগে যেখানে থাকতো পার্থ-কাই—তাদের শেষ রাজা। তাকে সে নিজের চোখে দেখেনি, কারণ, সে তখন পৃথিবীর আলোই দেখেনি। কিন্তু দাদুর কাছ থেকে সব শুনেছে। দাদুর বল্লম ছিল, ছোরা ছিল—সব সে একদিন ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল পাহাড়ের খাদের মধ্যে। নীচে, পাথরে লেগে ঠন-ঠন করে শব্দ হয়েছিল। কাছেই দাঁড়িয়েছিল বালিকা টুরা, তাড়াতাড়ি হাত চেপে ধরে ছিল দাদুর, বলে, ফেলে দিলে ?

দাদু বলে, হ্যাঁ। এই মরচে-ধরাদের আর দরকার নেই।

অপেক্ষাকৃত ছোট মেয়ে, অর্থাৎ টুরার তুলনায় তারা ছোট।

নইলে অনেকেই সন্তানের মা, একটি শুধু নিঃসন্তান ছিল। ওরা টুরাকে ঘিরে গল্প শুনছিল একমনে। টুরাকে এক মুহূর্তের জন্যও বুঝি থামতে দেবে না। উৎসুক কণ্ঠে বলে উঠলো—তারপর?

টুরা নিজেকে সামলে নিলো। বলতে বলতে কেন যে হঠাৎ চোখে জল এসে পড়ে কে জানে! চাদরের কোণায় চোখ মুছে নিয়ে টুরা আবার বলতে থাকে—মন্দিরে মেয়েদের ঢোকা বারণ, এমন কি কাছাকাছি যাওয়াও মানা। আমি মন্দিরের পথ ছেড়ে দিয়ে গাঁও বুড়োর বাড়ীর দিকে চললাম। সেই অচেনা লোকটা তখনো আমার পিছনে পিছনে আসছে।

টুরা একটু থেমে একটু ঢোঁক গিলে আবার বলে—গাঁও বুড়োর বাড়ী পর্যন্ত আর যেতে হলো না, মাঝপথে এমন একটি লোকের সঙ্গে আমার দেখা হয়ে গেল, যে আমার খুবই চেনা। পিনির বন্ধু, আমাদের শান্তির পাহাড়ে বার কয়েক এসেছে। বড়ো বড়ো মাথার চুল, মুখে অল্প অল্প দাড়ি-গোঁফ দেখা গিয়েছে মাত্র, চওড়া বুক, লম্বা লম্বা হাত-পা—বেশ মজবুত চেহারা। গোলাকার বড়ো বড়ো ভারী পাথর গড়িয়ে যে খেলা খেলে আমাদের জাতের জোয়ান পুরুষরা, সেই খেলায় শুনেছি লোকটা ওস্তাদ। লোকটার নাম খুব বড়ো, পুরোটা উচ্চারণ করাই যায় না। পিনি ওকে বরাবর 'বন্ধু' বলে ডাকতো, আমিও সেই নামে ডাকবো।

—কী ব্যাপার!—বন্ধু আমাকে দেখে থমকে দাঁড়ালো।

বললাম, পিনির জ্বর হয়েছে। পেললের কাছ থেকে তার জন্য কিছু 'জল-পড়া' এনে দে।

ও বললে, তা দিচ্ছি, কিন্তু—

বলে আমার পিছন দিকে তাকিয়ে কথাটা তুলেও কথাটা শেষ করলো না। বুঝলাম, ও কী জানতে চায়। ফিস্‌ফিস্ করে বললাম, লোকটাকে চিনি না। মাঝপথ থেকে আমার পিছু নিয়েছে। জিজ্ঞাসা কর ত, কী চায়?

বন্ধু কয়েক পা এগিয়ে গেল, লোকটিও ধীরে ধীরে কাছে এসে দাঁড়ালো। লক্ষ্য করে দেখলাম এতক্ষণে। চাদরের একটা অংশ কোঁচড়ের মতো ধরে আছে। সেই কোঁচড়ে কী আছে কে জানে। বন্ধু আমাদের ভাষাতেই জিজ্ঞাসা করলে, কে তুমি?

লোকটা উত্তরে যে কী সব বলে গেল, এক বর্ণও আমি বুঝলাম না। কিন্তু আশ্চর্যের কথা, 'বন্ধু' বোধ হয় বুঝতে পারলো, আর শুধু বুঝতে পারাই নয়, দিব্যি গড়গড় করে ঐ ভাষার কথা বলতে লাগলো বন্ধু।

লোকটার মুখে খুশীর আভা ফুটে উঠেছে। এগিয়ে এসে সে কোঁচড়ের জিনিসগুলো দেখালো। ছোট ছোট গোল গোল দেখতে বুনো ফলের মতো মেটে-মেটে রঙ। লোকটা তারপরে করলো কী, চাদর ঝেড়ে সব ফলগুলো মাটির ওপরে আমার পায়ের কাছে রেখে দিলো। তারপরে বন্ধুর সঙ্গে আরও কী সব কথাবার্তা বলে, আমার দিকে মাথা নুইয়ে, একটু হেসে, পিছন ফিরে হন্‌হন্‌ করে হাঁটা শুরু করে দিলো।

পথের বাঁকে তার দেহটা মিলিয়ে যেতেই বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করলাম, ব্যাপার কী? কে ও?

বন্ধু অল্প একটু হাসলো, বললে, পাহাড়ের নীচের দেশের লোক, সাহেবদের বাগানে মজুরী করতে এসেছে।

অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, তুমি ওর ভাষা জানলে কী করে?

বন্ধু বললে, আমরা অনেকেই ওদের ভাষা শিখে গেছি। গাঁয়ে এখন হরদম আসছে যাচ্ছে ওরা, আমরাও যাচ্ছি। দুধের বদলে ওদের কাছ থেকেও চাল কিনি আমরা, তা জানিস?

বললাম, তা আমার পিছু নিলো কেন লোকটা?

কথাগুলো বলতে বলতে আবার দু চোখ বুজে আসে টুরার। বলে, বন্ধু হেঁট হয়ে মাটি থেকে সেই ফল দুটো তিনটে তুলে হাতে নিলো। বললে, একে বলে আলু, সাহেবরা আলুর চাষ করছে

পাহাড়ে। লোকটা সাহেবের কথায় তোকে এই আলু দিয়েছে খেতে।

—খায় নাকি ?

বন্ধু বললে, সেদ্ধ করে খেতে হয়। বেশ লাগে। আমি একদিন খেয়ে দেখেছি। শুধু বড়ো ঘুম পায় খাওয়ার পরে।

ওর কথা শুনে হাসি পেলো আমার। বাচ্চাটা তখন ককিয়ে উঠেছে। ওকে শান্ত করতে করতে বললাম, আমার ঘুমিয়ে কাজ নেই। তুমি নেবে ত নাও, খেয়ে যতো পারো ঘুমোও।

বন্ধু সবটা নিলো না, গোটা কয়েক আলু আমার চাদরের খুঁটে বেঁধে দিলো। বললে, পিনিকে খাওয়াস। আরাম পাবে সে।

বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করলাম, লোকটা আমাকে আলু খেতে দেবার জন্য এই এতদূর ছুটে ছুটে এসেছিল ?

বন্ধু হেসে ফেললো আমার কথায়। মুখখানা একটু লাল হয়ে উঠলো, বললে, না, তা কেন ? অন্য ব্যাপার।

—সেই অন্য ব্যাপারটা কী শুনি ?

বন্ধু একটু থেমে একটু সলজ্জ ভঙ্গিতে বললে, আসল কথা, সাহেবের তোকে ভালো লেগেছে।

—মানে !

বন্ধু বললে, সাহেব দূর থেকে তোকে দেখছিল অনেকক্ষণ ধরে। ভালো লেগেছে বলেই না লোকটাকে পাঠিয়েছে তোর পিছনে-পিছনে, খোঁজ নিতে ?

—কী নিলো ?

বন্ধু আবার হাসলো, বললে, আমি এক কথায় 'না' করে দিয়েছি। বলেছি, ও একজনের বউ, তা জানো ?

—লোকটা কী বললে ?

বন্ধু বললে, লোকটা বললে, সাহেব তা বুঝতে পেরেছে। কোলে ছেলে, সাহেব বুঝবে না ?

—তবে ?

বন্ধুর মুখখানা গম্ভীর গম্ভীর দেখায়, বলে, সাহেব অনেক টাকা দেবে, মোষ দেবে গোটা দুই, তুই যদি পিনিকে ছেড়ে ওর কাছে গিয়ে থাকিস।

—ওর কাছে গিয়ে থাকলে টাকা আর মোষ নিয়ে আমি করবো কী ?

বন্ধু বললে, টাকা আর মোষ তুই পাবি নাকি ? পিনি পাবে।

—তাহলে আমার লাভ ?

—লাভ—সুখে থাকা, শান্তিতে থাকা।

—সুখে কি এখন নেই, শান্তিতে কি এখন নেই ?

—তুই-ই জানিস।

—তুই লোকটাকে কী জবাব দিলি ?

বন্ধু একটু হাসলো, বললে, দিয়েছি একটা জবাব।

—কী শুনি ?

বন্ধু বললে, টোড়া মেয়েরা বাইরের লোকের কাছে থাকে না। যে দু-একজন গেছে, তাদের আর আমরা ফিরিয়ে নিইনি। আর তাছাড়া, এ-মেয়েটার কথাই ওঠে না, সাহেবকে ওর পিছু ছাড়তে বল্।

—লোকটা শুনে কী বললে ?

—কী আবার বলবে ? চলে গেল।

সে-সব দিনকার কথা স্মরণ করে আজও মনে-মনে হাসে। ছোটদের বলে—সে এক কাণ্ডই গেছে। আজকে তোদের পাহাড়ের বাইরে যাওয়া বারণ, ঘর আর ঘরের আঙিনা ছেড়ে তোরা কোথাও যেতে পারিস না দলবল ছাড়া। এ-সব নিয়ম কেন হয়েছে ? ঐ সব বাইরের লোকের নজর থেকে নিজেদের বাঁচবার জন্যই ত। আমাদের সময়ে এতো নিয়ম-কানুন হয়নি। আমি সেদিন বন্ধুকে বললাম, রাস্তায় সাহেবটার সঙ্গে আবার দেখা হয়ে যাবে। আমার ভয় করছে। তুই আমার সঙ্গে চল্ না ?

বন্ধু বললে—আমার যে অনেক কাজ। আমি তামিলদের পাড়ায় নেমে যাবো মাখন বিক্রী করতে।

বলেই, একটু হেসে, ফিস্‌ফিসিয়ে বললে—আমি টাকা জমাচ্ছি, অনেক টাকা।

আমি কিন্তু সেদিন ছিলাম নাছোড়বান্দা। বললাম—তা হোক, তুই চল।

ও বললে—আমি অন্যলোক দিচ্ছি।

রাগ করে বলেছিলাম—অন্য লোক চাই না, তুই যাবি কিনা বল্।

অনেক পীড়াপীড়ির পর শেষ পর্যন্ত রাজী হলো। পেললের কাছ থেকে মাটির ভাঁড়ে 'জলপড়া' সঙ্গে নিয়ে রওনা হলো সে আমার সঙ্গে। বাঁকের পর বাঁক ঘুরে আমরা চলেছি। ঠিক সেই জায়গায় সামনের পাহাড়টার ওপরে সাহেবটা দাঁড়িয়ে ছিল, তার লোকগুলোও ছিল। সাহেব তার লোকদের একজনকে ডেকে কী যেন বললে। লোকটি দাঁড়িয়ে উঠে আমাদের দিকে মুখ ফিরিয়ে চীৎকার করতে লাগলো। বন্ধুও চেঁচিয়ে তার উত্তর দিলো। ব্যস, তারপরে আর কিছু নয়, সব চুপচাপ।

আরও একটা বাঁক ঘুরবার পর আমি জিজ্ঞাসা করলাম—কী বললে রে?

বন্ধু বললে—ঠাট্টা করলে।

—কী ঠাট্টা?

—বললে, আমাদের হাতে না দিয়ে নিজেই হাত করলি বুঝি?

আমি জিজ্ঞাসা করলাম—তুই কী উত্তর দিলি?

ও বললে—আমি বললাম, তবু ত নিজেদের জাতের মেয়ে নিজেদের মধ্যেই রইলো!

আমি আর কিছু বললাম না। বাচ্চাটাকে ভালো করে ঢেকে-ঢুকে নিয়ে এগিয়ে যেতে লাগলাম ওর পিছনে-পিছনে।

আজ ভাবি, ভাগ্যি সেদিন বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে এসেছিলাম! পিনি

জ্বরের ঘোরে বেহুঁশ হয়ে পড়ে আছে। গায়ে হাত দিলে হাতটাই বুঝি পুড়ে যাবে এমনি তাপ। দেখে আমার হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে যাবার যোগাড়। কোনক্রমে বলে উঠলাম—কী হবে?

বন্ধু ওকে ঠেলাঠুলি দিয়ে জাগিয়ে তুলবার চেষ্টা করলো। হুঁশ ঠিক ফিরে এলো না, একটা শুধু অস্পষ্ট কাতরানির শব্দ শোনা যেতে লাগলো। বন্ধু করলো কী, ভাঁড়ের জলপড়াটা জোর করে ওর গলায় ঢেলে দিলো। কশ বেয়ে সামান্য একটু গড়িয়ে পড়লো বটে, কিন্তু বাকীটা পিনি সেই অবস্থাতেই ঢক্ ঢক্ করে খেয়ে ফেললো। দেখে মনে হলো, তেষ্টায় গলাটা ওর বুঝি শুকিয়ে গিয়েছিল।

মেয়েটাকে দুধ খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে চাটাইয়ে শুইয়ে দিয়ে ওর কাছে এসে বসলাম। চাদরটা মুড়ি দিয়ে পড়ে আছে, সাড় নেই যেন! মাথার এলোমেলো চুল জায়গায়-জায়গায় জট পাকিয়ে আছে।

বন্ধু ওরই দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে ছিল। এক সময় মুখ ফেরালো আমার দিকে। বললে—ও বুঝি বাদাগাদের সঙ্গে চাষবাস করতে গিয়েছিল?

—জানলে কী করে?

—বারে, জানবো না এত বড়ো একটা ব্যাপার! সারা টোডা-জাতটার মধ্যেই কানাকানি পড়ে গেছে!

বলেছিলাম, রোদ্দুর লেগে জ্বর হয়েছে আর কী!

বন্ধু বললে—রোদ্দুর কি মোষ চড়াতে গিয়ে লাগে না আমাদের গায়ে? তার জন্য জ্বর হয়নি। আমাদের শরীরে ও ধরনের মেহনত পোষায় না। আর, বুড়োরা যা বলে, সে ত সাংঘাতিক কথা! বুড়োরা বলে, আমাদের পক্ষে চাষবাস করা পাপ। সেই পাপে জ্বর হবে না ত কী?

—কী হবে?

বন্ধু বললে—আমি তোর শ্বশুরকে ডেকে আনছি। সে কী বলে দেখা যাক।

—সে ত ভিন গাঁয়ে।

—ভিন গাঁয়েই যাবো।

বন্ধু আমার জন্য সেদিন অনেক কিছু করেছিল। ওর নিজের কাজ ফেলে রেখে সারা দিন ধরে কোথায়-না-কোথায় হেঁটে গেছে। এই ফাঁকে বলে রাখি, আমার বাপ সুঞ্জা বেঁচে থাকতে, আমার দাদা-বউদি আমার বাচ্চা বয়স কালে যার সঙ্গে আমার বিয়ের সম্বন্ধ করেছিল, সে হচ্ছে এই বন্ধু।

আমার শ্বশুর আর শাশুড়ী ভিন গাঁ থেকে এসে মহা হৈ-চৈ জুড়ে দিলে। বড়ো গাঁ থেকে গাঁও-বুড়োকে ডেকে আনা হলো, সে এসে সন্ধ্যের সময় উঠোনে ধুনি জ্বালিয়ে কতো কী ঝাড়ফুঁক করলো, যে অপদেবতা ওর ওপর ভর করায় ওর জ্বর হয়েছিল, তাকে খুশী করার চেষ্টা করলো। ও চাষবাস করতে গিয়ে পাপ করেছিল, সেই পাপের ফলেই ঐ অপদেবতার আবির্ভাব।

বন্ধু ওকে উটাকামণ্ডে নিয়ে যেতে চেয়েছিল। শুনে, বুড়োর দল রেগে গিয়ে ওকে মারে আর কী! তারা বললে, বিস্থু ছিল এইরকম। খালি পাহাড় পেরিয়ে যাও, আর সাদা মানুষদের পায়ে পায়ে ঘোরো। ওসব যা হবার হয়ে গেছে, আর চলবে না। জাতে যদি থাকতে চাও, জাতের সব নিয়ম-কানুন মেনে চলতে হবে। সাদা মানুষগুলো গুলি করে আমাদের জাতের ক'জনকে মেরে ফেলেছিল, তা জানিস? এই টুবার মা পিলুবাণীকে নিয়েই হয়েছিল গোলমালটা।

সে খবর পুরানো দিনের হলেও যেখানে যতো টোডা আছে, সবাই জেনেছে সেটা, সবাই মনে করে রেখেছে। কথাটা উঠতেই বন্ধু চুপ করে গেল।

অথচ, তিন দিন সমানে বেহুঁশ হয়ে পড়ে রইলো পিনি, জ্বর ছাড়লো না। বন্ধু এ সব দেখে একদিন করলো কী, লুকিয়ে দক্ষিণ পাহাড়ের দিকে চলে গেল। এলো দিন প্রায় শেষ করে। চোখ-

মুখ দেখেই বোঝা যায়, লোকটা খুব ঘুরে এসেছে। আশেপাশে কেউ ছিল না, বন্ধু এসে বসলো আমার কাছে। ফিস্‌ফিসিয়ে বললে, এই গাছের ছালগুলো দেখ 'দেখি ?

অবাক হয়ে বললাম, কী হবে ওতে !

তেমনি ফিস্‌ফিসিয়ে বললে, উনুনে জল গরম কর। সেই গরম জলে ছালগুলো সেদ্ধ হোক। তারপরে, সেই ছাল সেদ্ধ-হওয়া জলটা ওকে খাইয়ে দে, দেখবি সেরে যাবে।

বললাম, কে বললে তোকে এসব ?

চুপি চুপি বললে, কাউকে বলিস না যেন। বুড়োরা টের পেলে ঘাড় মটকে দেবে। আমাকে বলেছে কে জানিস ? সেই যে একদিন তুই বড়ো গাঁ-এ যাচ্ছিলি, আর তোকে দেখে একটা সাহেবের ভালো লেগেছিল, মনে আছে তোর ? সেই সাহেবের কথা শুনে একটা লোক ছুটতে ছুটতে তোর কাছে এলো ? তুই তার ভাষা বুঝলি না ? সেই তামিল লোকটা আমাকে লুকিয়ে লুকিয়ে একটা গাছ থেকে এই ছাল ছাড়িয়ে দিলে। বললে, সাহেবরা জানতে পারলে চাবুক মারবে আমাদের। লুকিয়ে ফেল তোর চাদরের খুঁটে। কেউ যেন ধরতে না পারে।

আমি আরও অবাক হলাম, বললাম—এতো লুকোছাপাই বা কেন ?

বন্ধু বললে, সাহেবরা এইসব গাছ লাগিয়েছে, এর থেকে নাকি জ্বরের ওষুধ তৈরী হয়।

—তাই নাকি ?

বন্ধু বললে, গাছগুলোর নাম কী জানিস ? 'সিংকোনা'। ওর থেকে ছাল ছাড়িয়ে অনেক কাণ্ড করে ওষুধ তৈরী করে নানান দিকে পাঠিয়ে দেয়। ঐ তামিল লোকটা সাহেবদের কাজ করে, সে সব কথাই আমাকে বলেছে। ওরা গাছ তৈরী করেছে নিজের হাতে, গাছের দেখাশোনাও করে ওরা। অথচ, ওদের জ্বর হলে সেই ওষুধ ওরা সহজে পায় না। তাই নিজেরা বুদ্ধি করে এই পথ বার করেছে।

গাছের ছাল চুরি করে সেদ্ধ করে নেয়, আর চুমুক দিয়ে খায়। ব্যস, আস্তে আস্তে জ্বর কমে আসে।

টুরা এখানে আবার একটু থেমে যায়। ঝাউ আর ইউক্যালিপটাসের মাথাগুলো হাওয়ার বেগে লুটোপুটি খাচ্ছে। হাওয়াটা বইছে যেন ঝড়ের মতো। বেশ শীত-শীত করছে না? গায়ের মোটা চাদরটা ভালো করে জড়িয়ে নেয় টুরা-বুড়ী, তারপর আবার শুরু করে—সেদিন মনের মধ্যে নানান ভয়। বুড়োরা টের পেলে মুশকিল। সেদিন একটা ঝুপড়ির মানুষকে নাকি 'ডাইন' সন্দেহ করে পাথর ছুঁড়ে ছুঁড়ে মেরে ফেলেছে। বিষ্ণু দাদু মারা যাবার পর নিয়াম-এর বুড়োরা দিব্যি মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। রাজা নেই আমাদের, কিন্তু গাঁও-বুড়োরা ত আছে? তাদের কথা যারা শুনবে না, তাদেরই ওপর ওরা খড়্গহস্ত হয়ে উঠবে। এইসব কথা কানে আসতো, আর ভয়ে বুকটা কেঁপে উঠতো। শুধু এই ভয়ই বা কেন? নানান অপদেবতার ভয় নেই? তবু বন্ধুর কথা ফেলতে পারলাম না। ও নিজেই উনুনের সামনে বসে ছাল সেদ্ধ করলো। ও নিজেই এসে পিনির মুখে অল্প করে ঢেলে দিতে লাগলো সেই জল। কিছু ঠোঁটের কশ বেয়ে গড়িয়ে পড়লো, কিছু পেটে গেল। জলটা খেতে খেতে পিনির ঠোঁট দুটো বেঁকে যাচ্ছিল, তেতো খেলে মানুষের মুখের অবস্থা যেমন হয়, তেমনি আর কী!

বন্ধু বললে, ভয় নেই। কেউ টের পায় নি।

—অপদেবতা?

বন্ধু বললে, সে বুঝবো আমি। মন্দিরে গিয়ে না হয় পুজো দেবো। আর ভয় কী?

টুরা বলতে থাকে—তারপরে, সত্যিই আশ্চর্য ব্যাপার ঘটলো। পিনির জ্বর কমে গেল, ও চোখ চাইলো। আমার নাম ধরে ডাকলো। বন্ধু আমাকে চুপি চুপি বললে, আমি পালাই। আমাকে দেখতে পেয়ে যদি কিছু মনে করে? আর শোন? ওকে যেন ওষুধের কথা বলিস না।

বন্ধু চলে গেল। পিনি ওর ব্যাপারটা টেরই পেলো না। তারপরে ধীরে ধীরে একদিন সেরে উঠলো। গাঁও-বুড়োর খাতির বেড়ে গেল। তার ঝাড়ফুঁকের ফলেই পিনি সেরে উঠেছে, এটাই রটে গেল চারদিকের গাঁয়ে। দলে দলে লোক এলো গাঁও-বুড়োর সঙ্গে দেখা করতে। বাদাগার দলও এলো। কোটারা এলো। গানবাজনা—খাওয়াদাওয়া হয়ে গেল গাঁও-বুড়োকে নিয়ে।

এমনি করে করে দিন যেতে লাগলো। পিনি প্রাণপণ চেষ্টা করে, কিন্তু তবু আমাদের অবস্থা ফেরে না। বছর ঘুরে বছর আসে, বছর যায়, আবার আসে। ইউক্যালিপটাসের কতো পাতা ঝরে গিয়ে কতো নতুন পাতা দেখা দিলো, আবার তারা পুরানো হলো, আবার ঝরে গেল, উঠলো নতুন পাতা। মেয়েটা আমার তখন পাঁচ-ছ বছরের। পিনি বললে, তোকে আজ একজন নতুন কাপড় দিতে আসবে।

—কেন ?

—মেয়ের বিয়ে দেবো।

ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইলাম ওর দিকে। তারপরে বললাম, কার সঙ্গে ?

পিনি বললে, তু-তুটো মোম আছে ওদের। ছেলেটার বয়স এক কুড়ি পেরিয়েছে সবে। দেখতে-শুনতে খারাপ নয়, তবে ওরা টিভালিয়ল। তা হোক, মেয়েটা ত খেয়েদেয়ে বাঁচবে।

—নিয়াম আপত্তি করবে না ?

পিনি বললে, নিয়াম-এর মত নিয়েছি। ওরা রাজী হয়ে গেছে। মেয়েকে ত মুকের্তি পাহাড়ে দেবার কথা ছিল, নিয়াম কি তা ভুলে গেছে ভাবিস ? সে জন্যেই রাজী হয়েছে।

বললাম—মুকের্তি পাহাড়ে মেয়ে ফেলে দিয়ে আসবার নিয়ম আবার হয়েছে নাকি ?

—না তা হয় নি,—পিনি বললে—সে সাহস পাবে না। সাহেবরা চটে যাবে না ? তারা যে আইন করে দিয়েছে।

যাই হোক, আমি আর বাধা দিইনি। মেয়ের বিয়ের সম্বন্ধ হয়ে গেল। এবং আরও পাঁচ বছর পরে পাকাপাকি বিয়ে। মেয়ে চলে গেল শ্বশুর-ঘর করতে।

আমরা একটা মোষ পেয়েছিলাম মেয়ের বিয়েতে। তাতে খাওয়া-পরার দিক থেকে খানিকটা সুরাহা হলো বটে, কিন্তু পিনি হঠাৎ একটা কাণ্ড করে বসলো। সে বললে, আমি 'পুরুসুৎপুমি' করবো।

নীচে নেমে গিয়ে কোটাদের কাছ থেকে তীর ধনুক নিয়ে এলো। নিয়াম ডেকে গাঁও-বুড়োর অনুমতি নিয়ে সে ধনুক দিয়ে একটা গণ্ডী টানলো। 'কুড়' বা 'প্রধান' যারা তারা গণ্ডীর কাছে এসে গণ্ডির মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকা পিনিকে ছুঁয়ে বিড়বিড় করে কী সব মন্ত্রের মতো পড়ে গেল। তারপর 'ভোজ'-এর পালা। এবং যে 'কুড়' বা 'প্রধান' এই ব্যাপারটাতে মোড়লী করেছিল, তাকে সেই আমাদের দুধেল মোষটাকে দিয়ে দিলো পিনি।

বাধা দেওয়া চলবে না, এটাই নিয়ম। আর, সেই যে ঘটা করে সব কিছু করা হলো, তার ফল হলো এই যে, পিনি আমার সব সন্তানদের 'পিতা' হয়ে গেল। আমার কোলে মেয়ের পর আর কোনো ছেলেপিলে আসেনি। এর পর যদি আসে, তাহলে যার ঔরসেই আসুক, 'পিতা' বলে তাদের মানতে হবে পিনিকেই। 'পুরুসুৎপুমি'র মানেই হলো তাই।

সব কিছু মিটে যাবার পর ওকে যখন একা পেলাম, তখন একটু রাগ করেই বলে উঠলাম, এসবের মানে কী?

পিনি বললে, মানে একটা আছে বই কি!

বললাম, যেসব ভাইরা মিলে এক বউকে বিয়ে করে, সেখানে ছেলেপিলের বাপ কে, এই নিয়ে গোলমাল হতে পারে বলেই ঐ নিয়মটি আছে। কিন্তু তোর ত কোনো ভাই নেই—তোর এটা করার কী দরকার ছিল?

পিনি কিছু সেদিন বললো না, কথাটাকে এড়িয়ে গেল। এমনি

করে করে গড়িয়ে গেল প্রায় একটি বছর। আমাদের তখন এমনি অবস্থা হয়েছে যে, রোজ রোজ খাওয়া পর্যন্ত জোটে না। নতুন মোষ ধরবার চেষ্টা করা হয়েছে, কিন্তু সেই যে মড়ক লাগবার পর এই যে এত বছর কেটে গেল, মোষের দল আর আমাদের কাছের জঙ্গলের দিকেই আসছে না।

আমার বেশ মনে আছে সেদিনের কথা। সারাদিন কোথায়-না-কোথায় ঘুরে ঘুরে ও এলো। ধপ্ করে এসে বসলো আমাদের ঝুপড়ীটার সামনে। কাছে গেলাম। বললাম, খেয়েছিস কিছু ?

ও মুখ ফেরালো আমার দিকে, বললে, তুই ?

বললাম, আমার কথা থাক্। আমি কিছু চাল পেয়েছিলাম, আর কিছু দুধ। খেয়ে নে।

—কোথা থেকে পেলি ?

—শাশুড়ীর কাছে গিয়েছিলাম।

পিনি বললে, সে-ই বা দেবে কোত্থেকে ? গাঁয়ের সবার অবস্থাই একরকম।

বললাম, শাশুড়ীও যোগাড় করেছিল চেয়ে-চিন্তে।

পিনি আর কিছু বললো না, চুপচাপ মাথায় হাত দিয়ে বসে রইলো খানিকক্ষণ।

খেতে ডাকলাম, ও প্রথমে সাড়া দিলো না। পরে, বার কয়েক তাগাদা দিতে উঠে পড়লো। চোখের জল আমাদের পুরুষরা সহজে ফেলে না, কিন্তু সেদিন ওর মুখের দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। চোখ দুটো ওর জলে ভরে গেছে। দেখে, আমার বুকের ভিতরটাও মোচড় দিয়ে উঠলো। এগিয়ে গিয়ে ওর হাত ধরলাম, বললাম, কী হয়েছে ?

ও মুখ ফেরালো অন্য দিকে, নিজেকে যেন সামলালো অনেক কষ্টে। তারপরে কোনক্রমে বললে, কিছু না। চল, খেতে বসি।

খেতে বসেও নিজে সবটা খেলো না। আমাকে কাছে ডেকে

জোর করে আমাকেও খাইয়ে দিলো অর্ধেকটা। তারপরে খাওয়া-দাওয়ার পর ও বললে, ঐ ঝাঁকড়া-মাথা গাছটার কাছে গিয়ে বসবি ?

—চল।

বসলাম। বসলাম, মানে, চুপচাপ বসে রইলাম। ও-ও কিছু বলছে না, আমিও কিছু বলছি না, ধীরে ধীরে আঁধার নামতে লাগলো। ভয়-ভয় করা অদ্ভুত এক অন্ধকার। বুকটা অজানা ভয়ে কাঁপছে। রাত তো রোজই নামে এমনি করে। কিন্তু সেদিনকার রাত যেন প্রচণ্ড এক ভয়ের মতো আমার মনটাকে চেপে চেপে ধরছে। পিনি হঠাৎ আমার হাতটা ধরলো শক্ত করে, ডাকলো—টুরা ?

—উঁ ?

ও বললো, দুটো মোষ পেলে আমরা বেঁচে যাই, তাই না ? দুটো দুধেল মোষ ?

—হ্যাঁ।

ও বললে—পেতে পারি। যদি তুই রাজি হোস।

—কীসে ?

ও বললো, তোকে বাঁধা দেবো অন্য এক মানুষের কাছে। বেশী নয়, ছ' মাসের জন্য।

—কী বললি !

ও বললো—অনেক ভেবে দেখেছি, এ ছাড়া উপায় নেই।

—কে আমাকে নেবে ?

—নেবার লোক আছে।

—কে ? সাহেবদের কাছে আমি যাবো না।

ও বললো, না না, তা হবে না।

—তবে ?

ও বললো, আমাদেরই জাতের লোক।

বললাম, আমাদের লোক কে আছে, যে তোকে দু-দুটো মোষ দিতে পারে এক কথায় ?

—আছে। তুই রাজী কি না বল?

চোখ ফেটে যেন জল এলো আমার। তুহাতে ওর গলা জড়িয়ে ধরে বুকে মুখ লুকোলাম। কাঁদতে লাগলাম ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে।

ও বললে, কাঁদছিস কেন!

বললাম, আমি যাবো না তোকে ছেড়ে।

ওর দেহটা শক্ত হয়ে গেল। ধীরে ধীরে নিজেকে ছাড়িয়ে নিলো, তারপরে গলায় জোর দিয়ে বললে, ছাড়তে হবে। নইলে আমরা কেউ-ই বাঁচবো না। তুই-ও না, আমিও না। আমাদের জাতের সবারই এক রকম অবস্থা ছিল। কিন্তু আজ আর তা নেই। আমাদের মধ্যে কেউ হয়েছে বড়লোক, কেউ গরীব। আমরা সেই গরীবদের দলে। আমাদের আর বাঁচবার কী উপায় আছে বল?

—কোনো পথ নেই!

—না।

ওর মুখের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলাম। ইচ্ছে হচ্ছিল ওর পাষাণ দেহটাকে আঁচড়ে-কামড়ে শেষ করে দিই। ও মরে যাক, ও শেষ হয়ে যাক।

বিন্নুর দাওয়ায় বসে অপেক্ষাকৃত অল্পবয়সী বউদের কাছে বসে গল্প করছিল টুরা-বুড়ী। যেদিন ওর স্বামী পিনি সকালে উঠে কাউকে কিছু না বলে চলে গেল দূরের গাঁয়ে—আর, বেশ কিছুক্ষণ পরে সত্যিসত্যি ফিরে এলো তুটি মোষ নিয়ে, সঙ্গে আর একটি লোক, সেদিনকার কথা বলতে বলতে আবেগে ওর কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে গেল, সামলাতে গিয়েও পারলো না, ঝরঝর্ করে কেঁদে ফেললো সবার সামনে।

একটি বউ কোমল কণ্ঠে বললে—আজ তবে থাক। আর একদিন শুনবো।

চোখ মুছে, মনটাকে শক্ত করে আবার তার কাহিনী শুরু করতে

যায় টুরা-বুড়ী, কিন্তু পারে না, আবার তার চোখের পাতা ভিজে ওঠে, আবার তার গলা ধরে যায় তুরন্ত আবেগে।

অন্য একটি বউ উঠে দাঁড়ায়, বলে—আজ থাক। বলতে তোর কষ্ট হবে। কাল শুনবো।

টুরা হাত বাড়িয়ে ওর চাদরের প্রান্ত ধরে ফেলে, কিন্তু এবারেও কিছু বলতে গিয়ে হঠাৎ হাউ-হাউ করে কেঁদে ওঠে উচ্চগ্রামে।

বউটি বসে পড়ে, কিন্তু শান্ত করতে পারে না বুড়ীকে। বুড়ী দ্বিগুণ ব্যাকুলতায় ভেঙে পড়ে যেন। .

[টুরা-বুড়ী যে সালে মারা যায়, সেটা হচ্ছে ১৯২১ সালে। আমাদের দেশে তখন অসহযোগ আন্দোলনের প্রবল স্রোত বয়ে চলেছে। ওরা 'শান্তির পাহাড়ে' বসে সে খবর কিছুই রাখেনি, প্রবল দারিদ্র্যের সঙ্গে যুদ্ধ করে চলেছে শুধু। আশেপাশে ইংরেজদের সৌখীন শৈত্য-নিবাসগুলি তখন ক্রম-বিস্তারশীল। উটাকামণ্ড ত আছেই। তারপরে আছে—আরাভানকাডু, ফার্ণ-হিল ইত্যাদি। সিনকোনার চাষ চলেছে নীলগিরির পাহাড়ে, চলেছে চা ও কফির চাষ, আলুর চাষ। কিন্তু ওরা পেটের দায়ে কখনো-সখনো বা শ্রম-জীবনকে গ্রহণ করতে গেছে, কিন্তু টিঁকতে পারেনি, ছিটকে আবার বেরিয়ে এসেছে। ওরা চলে গেছে আরও দূরে দূরে, আরও নিভৃতির মধ্যে। এইভাবে ওদের কতো পুরানো গাঁ ভেঙে গেছে, নতুন গাঁ গড়ে উঠেছে। সঙ্গে সঙ্গে ওদের জীবনে গড়ে উঠেছে কতো বিচিত্র সব বাধানিষেধ। 'পেলল' বা পুরোহিতদের প্রতাপ বেড়ে গেছে, 'কুড়' বা প্রধানদের ক্ষমতা ক্রম-বর্ধমান। এই রকম এক প্রধানের ছেলে হচ্ছে, আমাদের সেই পূর্ব পরিচিত মানুষটি, যার নাম —বন্ধু। এই বন্ধুর কাছেই স্ত্রীকে ছ মাসের জন্য বাঁধা রেখেছিল পিনি তুটি তুধেল মোষের বিনিময়ে। কিন্তু, সে হচ্ছে ১৮৯৫ সালের কথা। ১৯২১ আসতে তখন অনেক দেরি। ১৮৯৫ সালে টুরার মেয়ের বয়সই হলো তেরো বছর—দূরের কোন্ ঝুপড়ীতে গিয়ে

শ্বশুর ঘর করছে। আর টুরাকে তখনো জরা স্পর্শ করেনি, টুরার বয়স তখন তেত্রিশ। যে-বয়সের কথা ছোটদের কাছে বলতে গিয়ে ঝর্‌ঝর্‌ করে কেঁদে ফেলেছিল বুড়ী, আর বলতে পারেনি। ১৮৯৫ সালের কথা।]

অনিচ্ছুক একটা মোষকে যেমন চারণভূমি থেকে তার মালিক টানতে টানতে নিয়ে চলে গাঁয়ের দিকে, ঠিক তেমনি করে টুরার হাত ধরে টানতে টানতে নিয়ে চলেছে 'বন্ধু' তাদের 'বড়ো গাঁ'-এর দিকে। দূরের পাহাড়ে কাজ করতে করতে থমকে গেছে তামিল-মজুররা, হাতের কাজ থামিয়ে ওদের দিকে তাকিয়ে আছে অবাক হয়ে। আর তাকিয়ে আছে সেই সাহেবটা, শূন্য পাইপে তামাক ভরতে ভরতে হঠাৎ থেমে গিয়ে। তার মনে হচ্ছে, আদিম যুগে আদিম গুহামানব আদিম নারীর হাত ধরে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে চলেছে গুহা থেকে গুহান্তরে।

মাথার ওপরে একটা জলভরা মেঘ ভেসে এলো, ছায়া ফেললো ওদের ওপর, কিন্তু ধারাবর্ষণ করলো না, ধীরে ধীরে উত্তর-পূর্ব দিকে ভেসে যেতে লাগলো পাহাড়ের গায়ে গায়ে ছায়া ফেলতে ফেলতে।

ওরা ততক্ষণে পৌঁছেছে 'বড়ো গাঁ'-এ। প্রথম বাঁকেই দেখা হলো বন্ধুর বাপের সঙ্গে। ছেলেকে ও-ভাবে আসতে দেখে ভ্রূ দুটো কুঞ্চিত হলো, গম্ভীর কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলো—এ কে ?

—দ্বিজান্‌।

—কোত্থেকে পেলি ?

—পিনির কাছ থেকে।

—তার মানে ?

—বাঁধা দিয়েছে।

—কদিনের জন্য ?

—ছ মাস।

—কী দিয়েছিস ওকে ?

—দুটো দুধেল মোষ।

বুড়োর মুখখানা আরও গম্ভীর দেখালো, বললে—আকালের দিন। দুটো মোষ দিলি? একটাতেই হতো।

—ও-কথা বলো না, পিনি আমার বন্ধু লোক।

—তা' বেশ। নিয়ে যাচ্ছিস কোথায়?

'বন্ধু' বললে—নতুন ঝুপ্ড়ী বাঁধছি।

সাধারণতঃ বিয়ে করে নতুন বউ নিয়ে এসে ওরা নতুন ঝুপড়ী বাঁধে, এমন কি গাঁ ছেড়ে দূরেও চলে যায়, এতে অবাক হবার কিছু নেই। বুড়োও অবাক হলো না এ কথায়, সে শুধু প্রশ্ন করলো—কোথায় করছিস ঝুপড়ীটা?

'বন্ধু' বললে—পাদরী বাবার বাড়ীর দিকে যেতে গিয়ে ডান দিকে ফিরবো, টিলায় উঠবো, তারপরে আবার নামবো। ওখানে কয়েকটা গাছ আছে জটলা করে, তার ছায়ায় ঝুপড়ী বাঁধবো।

—বুঝলাম। লোকজনদের খবর দিয়েছিস?

বন্ধু বললে—সে সব বন্দোবস্ত না করেই কি ভিন্ গাঁয়ে বউ আনতে গিয়েছিলাম? বাদাগার লোকেরা খড় দিয়ে গেছে।

—কতো পড়লো খড়ের দাম?

—তা মন্দ নয়। খড় বেশ আক্রা হয়ে গেছে। যেটুকু মাখন দিলে দশ আঁটি খড় পাওয়া যেতো, এখন তার থেকে বেশীই লাগে।

—বাঁশ পেয়েছিস?

—হ্যাঁ। আমার সঙ্গীরা জঙ্গলের ধার থেকে কেটে এনেছে।

বুড়ো বললে—গাঁও-বুড়োকে বলেছিস?

—না, এইবার বলবো। তোমাকে ত বলা হলো?

—তোর মা?

—তাকে তুমি বোলো।

বুড়ো বললে—বউটাকে আগে তোর ঝুপড়ীতে না নিয়ে গিয়ে তোর মার কাছে নিয়ে যা না?

বন্ধু বললে—না, এখন নয়, 'পির্জ' (সূর্য) ডুবলে পরে নিয়ে যাবো। এখন ও চলুক, আমার সঙ্গে ঘর তৈরীর কাজে হাত লাগাবে। বুঝলে না? নিজের হাতে ঘর তৈরী করলে তাতে মন বসবে সহজে।

বুড়ো বললে—বুঝলাম।

টুরার চোখের কোণে জল শুকিয়ে আছে, বুড়ো সেই দিকে তাকিয়ে নিজের মনেই বললে—আহা! পুরোনো ঘরের মায়া কি সহজেই কাটে?

হাতখানা এতক্ষণ ছেড়ে দিয়েছিল 'বন্ধু', এবার আবার আঁকড়ে ধরলো, তারপরে আচমকা একটু টান দিয়ে বললে—আয়। বেলা বেড়ে গেল।

বুড়ো তার পথে চলে গেল, ওরা দুজনে চলতে থাকলো নিজেদের পথে।

কিছু দূর উঁচু-নীচু পথ ভেঙে হেঁটে চলবার পর ওরা এসে পড়লো সেই 'পাদরী বাবার বাড়ী'র কাছে।

পাদরী বাবা মারা গেছে অনেকদিন। তার পরে দুটি মেম থাকতো ওখানে, কিন্তু তারাও চলে গেছে, এসেছে অন্য মেম, এরা সংখ্যায় তিনজন। এদের মধ্যে বয়সে যে বড়ো, তাকে গাঁয়ের লোকেরা আড়ালে 'ডাইনী' বলে, কিন্তু সামনাসামনি পড়ে গেলে খাতির দেখায়। কী জানি, ওরা হচ্ছে সাদা চামড়ার মানুষ, ওদের কিছু করলে যদি উটকামণ্ড থেকে ঘোড়া ছুটিয়ে সৈন্যের দল চলে আসে!

'বন্ধু' পাদরী বাবার বাড়ীর সামনে একটু দাঁড়িয়ে পড়লো: কারণ, বাগানে ফুল গাছগুলোর মাঝে দাঁড়িয়ে আছে সেই 'মেম ডাইনী'টা, তাকিয়ে আছে ওদের দিকেই। বুকটা ভয়ে কেঁপে উঠলো 'বন্ধু'র। নতুন বউ নিয়ে যাচ্ছে ঘরে, এমন সময়ে কি না ডাইনীর দৃষ্টিপাত! অদৃষ্টে কী আছে কে জানে!

মেম অবশ্য বললো না কিছুই। 'বন্ধু'ও নিজেকে একটু সামলে নিয়ে আবার বউয়ের হাত ধরে পথ চলা শুরু করলো। ডানদিকে বাঁক নিতে হলো। খানিকটা পরেই চড়াই হলো শুরু। সেই চড়াই ভেঙে কিছুটা উঠতেই খানিকটা ফাঁকা জায়গা চোখে পড়লো। ওখানটা ঘর বাঁধবার পক্ষে মনোরম জায়গা, ছোট ছোট পাহাড়ী ফুলে হেসে উঠেছে জায়গাটা। বেগুনী, হলদে, গোলাপী, সাদা, নানা রঙের ছোট-ছোট ফুলে সমস্ত ফাঁকা জায়গাটা ভরে গেছে। আর, এপাশে-ওপাশে দাঁড়িয়ে আছে দীর্ঘকায় বুড়ো ঝাউগাছ কতগুলো।

ঘর করবার সুন্দর জায়গা এটা সত্যিই, কিন্তু তবু কেউ করে না। এখানে আগে একটা পাগল লোক এসে নাকি বসে থাকতো, সে নাকি ঐ ঝাউগাছের গুঁড়িতে লম্বালম্বি কিংবা আড়াআড়ি দাগ কেটে-কেটে হিসেব রাখতো, তাদের জাতের মধ্যে কজন মরলো কজন জন্মালো। পাগল বুড়োর নাম ছিল ফোরি। ফোরি মারা গেছে বহুদিন, আর তার কেটে রাখা দাগগুলির প্রায় সবই ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেছে, যদিও কঙ্কালের দাঁতের মতো কতগুলো রেখা এখনো জেগে আছে গুঁড়ি-গুলোর গোড়ার কাছে। সব মিলিয়ে এমন একটা পরিবেশ, যা দৃশ্যতঃ মনোরম হলেও ওদের মনে এখনো পর্যন্ত একটা আতঙ্কের ভাব সঞ্চারিত করে রেখেছে। এখানে নানান উপদেবতার বাস বলে ওরা মনে করে, তাই সচরাচর কেউ আসেও না এখানে।

শ্মশানের মতো পরিবেশটা বাঁয়ে রেখে আবার ওরা চলতে লাগলো, কিছুক্ষণ পরে উৎরাই, তারপর আবার চড়াই। এই রকম করে একটা টিলা পার হতে হবে। সেটা পার হওয়া মাত্রই শোনা গেল দূরাগত একটা কোলাহল। ওপর থেকেই দেখা যায়, একটা ফাঁকা জায়গা বেছে নিয়ে গাছগাছালি পরিষ্কার করে নিয়ে জনকয়েক লোক মিলে গড়ে তুলছে 'বন্ধু'র জন্য একখানা ঝুপড়ী, মাথার চালাটা তার সম্পূর্ণ গোলাকার, জানালা নেই, কিছু নেই—আছে শুধু হামাগুড়ি দিয়ে ঢোকার মতো ছোট্ট এতটুকু একটা দরজা।

ওরা দুজনে ওদের কাছাকাছি হবার আগেই 'বন্ধু' একটা হাঁক দিলো—পাহাড়ে-পর্বতে দূরের লোককে মানুষ যেমন করে ডাকে, ঠিক তেমনি। একটা 'ও-ও-ও' ধ্বনি পাথরে-পাথরে প্রতিহত হতে-হতে ওদের কানে গিয়ে পৌঁছলো। ওরা সবাই থম্‌কে গিয়ে ওদের দুজনের দিকে মুখ তুলে তাকালো।

টুরা-বুড়ী সে-সব দিনের কথা স্পষ্ট মনে করতে পারে। ছোটদের কাছে সেকালের গল্প করতে করতে বলে—আমাকে একটা পাথরের ওপর বসিয়ে রেখে 'বন্ধু'ও কাজে লেগে গেল। দেখতে-দেখতে বেলা গড়িয়ে যায়, ঘর-বাঁধা আর শেষ হয় না। লোকগুলো একসময় কাজে ভঙ্গ দিয়ে খেতে বসে। ওদেরই দুজন লোক অদূরে বসে রান্না করছিল। রান্না হয়ে যেতেই তারা ওদের ডাক দিলো। ওরা কাজ ফেলে রান্না যেখানে হচ্ছিল, সেখানে সবাই গোল হয়ে বসলো। বন্ধু একটা হাঁড়ি আর মাটির থালা নিয়ে আমার কাছে এলো। বললে, তুই এখানে বসেই খেয়ে নে। আমি ওদের কাছে যাই।

বলেই, ও চলে গেল ওদের কাছে। আমি চুপচাপ বসে রইলাম। আমার ডাক ছেড়ে কান্না আসছিল। পিনিকে ছেড়ে এ কোথায় আমায় থাকতে হবে। জানি, যা হয়েছে, তাতে অন্যায় কিছু নেই, আমাদের সমাজের এই-ই নিয়ম। তবু, মন মানতে চায় না। ওরা ঘর তৈরী করছিল আর বার বার আমাকে বলছিল, আয় না? নিজের ঘরে নিজেই হাত লাগা না?

আমি যাইনি। বন্ধু ওদের বললে, ঠিক আছে। জোর-জবরদস্তি করো না।

আমি বাঁচলুম। খাওয়া-দাওয়ার পর ওরা আবার কাজে লাগলো। বন্ধু এসে আমাকে দেখে অবাক হয়ে গেল। বললে, এ কী, খাসনি?

চোখের জল আর বাধা মানলো না, মুখ নীচু করে রইলাম, কোনো কথা বললাম না। বন্ধু এমন ভাবে দাঁড়ালো, যাতে করে খাবার শুদ্ধ মাটির থালাটা ওদের কারুর চোখে না পড়ে।

তারপরে, নীচু গলায় বললে—খাবি না ?

মাথাটা সজোরে নেড়ে জবাব দিলাম—না।

—সে কী ! না খেয়ে থাকবি কেন ?

কোন রকমে বলে উঠলাম—দোহাই তোর, আমাকে খেতে বলিস না।

—চুপ চুপ।—বন্ধু তাড়াতাড়ি বলে উঠলো তেমনি চাপা গলায়—আস্তে কথা বল, ওরা শুনতে পাবে। ওরা এ-কথা শুনলে নিন্দে করবে।

বন্ধু ওদের আড়ালে থালার ভাতগুলো জঙ্গলের দিকে ছুঁড়ে ফেলে দিলো। তারপরে খালি থালা তার ছোট হাঁড়িটা তুলে যারা রান্না করছিল, তাদের কাছে চলে গেল।

ঘর তৈরী যখন শেষ হলো, তখন সন্ধ্যে হয় হয়। ওরা চলে গেল। রান্নার লোক তুজন কিন্তু গেল না, তারা রাত্তিরের ভোজের জন্য তৈরী হতে লাগলো।

রাত্তিরের ভোজে আরো অনেক লোক এলো। বন্ধুর বাবা-মা-ও এলো। ওদের গাঁয়ের 'কুড়'রা এলো, প্রধান এলো। হৈ-হল্লা হতে লাগলো যেমন হয়। বন্ধু আমাকে নিয়ে একটা নির্জন গাছতলায় গিয়ে বসলো। শরীর মন ভেঙে পড়েছে, কিন্তু উপায় নেই, বন্ধুর কথা আমাকে শুনতেই হবে।

ছোটরা সংকোচবশতই টুরা-বুড়ীকে আর ঘাঁটাতো না, বুড়ীও আর কিছু বলতো না সে রাত্তিরের ব্যাপারে।

সে রাত্তিরে যা-ই ঘটে থাকুক না কেন, দিন কয়েকের মধ্যেই সব কিছু সহজ হয়ে এলো। ওদের ঘরের সামনে একটা একক ইউক্যালিপটাস গাছ দাঁড়িয়ে আছে, সোজা উঠে গেছে গাছটা। সাদা ধবধবে তার গায়ের বর্ণ—ঠিক ঐ পাদরী-বাবার বাড়ীর মেম তিনটির মতো। ঐ দিকে তাকিয়ে চুপচাপ অনেকটা সময় কেটে যায় টুরার। বন্ধু লোকটি অদ্ভুত। নিজের মোষগুলোকে গাঁয়ের টু-এল্ থেকে বার

করে নিয়ে গিয়ে ছেড়ে দিয়ে আসে, দুধ দুইয়ে নেয়। তারপরে চলে ওর বেসাতি। ঘি তৈরী, মাখন তৈরী, তারপরে সেগুলো বিক্রী করে বিনিময়ে অন্য কিছু জিনিসপত্র না এনে টাকা চেয়ে নেয়। সেই টাকা জমায় একটা মাটির হাঁড়িতে। হাঁড়িটা পুঁতে রেখেছে ঘরের কোণে। বাইরের থেকে কেউ বুঝতে পারবে না। বোঝে শুধু টুরা।

বঙ্কু হাসে, বলে—টাকার কথা কাউকে বলিস না যেন।

তারপরে হঠাৎ এক সময় বলে—পিনি সে রাত্তিরে এলো না কেন রে?

—কী জানি।

বঙ্কু বলে—ওকে খবর পাঠিয়েছি।

—কেন?

বঙ্কু বলে—মাঝে মাঝে আসবে না খোঁজ-খবর নিতে?

—কী দরকার?

বঙ্কু বলে—ছ'মাস পরে তোকে সে ছাড়িয়ে নিয়ে যেতে পারবে?

—পারবে বইকি!

বঙ্কু হাসে, বলে—কতো দেখলুম! ছাড়িয়ে নিয়ে যেতে বড়ো একটা কেউ পারে না।

—ও পারবে।

—দেখা যাক।

ঐ ইউক্যালিপটাস গাছের মাথার ওপর দিয়ে রাত্রি আসে, আর একটা কালো বাদুড়ের মতো ডানা মেলে তার দিকে ছুটে আসে প্রবল এক আতঙ্ক। সেই আতঙ্ক তাকে রাত্রি গভীর হবার আগে আর মুক্তি দেয় না। তার অধিকারের মাশুল বুঝে নিয়ে বঙ্কু এক সময় নিঃঝুম ঘুমে ঢুলে পড়ে, আর তার পাশেই নিস্পন্দের মতো কিছুক্ষণ পড়ে থাকে টুরা। চাদরটা পর্যন্ত গায়ের ওপরে টেনে নিতে ইচ্ছা করে না। নিরাবরণ দেহের ওপর দিয়ে রাত্রের হু-হু ঠাণ্ডা হাওয়া অজগরের নিঃশ্বাসের মতো বয়ে যেতে থাকে, অকম্পিত একটি ছায়ার মতো চুপ-চাপ পড়ে থাকে টুরা।

কিন্তু, সকাল হয়। শুরু হয় দিনের কাজ। টুরা একটা যন্ত্রের মতো তার করণীয় কাজটুকু করে যায়, আর অবসর মতো স্তব্ধ হয়ে বসে থাকে ঘরের সামনে, এক মনে কী যেন ভেবে চলে।

এক একদিন বন্ধু বলে—উঠে হেঁটে বেড়ালেও ত পারিস। গাঁয়ে চলে যা, আমার মা আছে, তোর মেয়ে আছে, তাদের সঙ্গে না হয় দু'দণ্ড গল্প করে আয়।

—না।

বন্ধু বলে—আমি গিয়ে তোর মেয়েকে পাঠিয়ে দেবো?

—না।

—কেন? না কেন?

টুরা বলে—মেয়ে শ্বশুর ঘর করছে, তাকে আবার আমার কাছে আসতে বলা কেন বাপু?

বন্ধু বলে—তাহলে যা না একদিন পিনির কাছে। দেখা করে আয়।

ওর দিকে মুখ তুলে তাকায় টুরা, তারপরে কী ভেবে নিয়ে এবারও উত্তর দেয়—না।

বন্ধু হেসে বলে—কী হয় জানিস? পুরানো বউকে আর কেউ ফিরিয়ে নেয় না। তার বদলে নতুন বউ যোগাড় করে নেয়—কাঁচা বয়সের।

টুরার বুকের ভিতরটা কেঁপে ওঠে। মনে মনে ভাবে—তাই কী? বত্রিশ বছর বয়স হলো তার, মেয়ে বড়ো হয়ে শ্বশুর ঘর করতে গেছে, তাই কি পিনি তাকে অবহেলা করছে? সত্যিই ত, একবার খোঁজও নিতে এলো না কেন?

বন্ধু মুচ্‌কি মুচ্‌কি হাসে, বলে—বুঝলি ত ব্যাপারটা?

টুরার মনে সংশয় দেখা দিলেও মুখে তা বলে না। বলে, পিনি তোদের মতো নয়।

বন্ধু হো-হো করে হেসে ওঠে এবার, বলে—আমাদের মতো নয় ত

কাদের মতো? যদি প্রাণের টানই থাকবে ত বউকে বাঁধা দিতে পারলো কী ভাবে?

টুরা বলে—কষ্টে পড়লে মানুষ কী করবে?

বন্ধু বললে—শত কষ্টে পড়লেও বউকে বাঁধা দেয় না কেউ, যদি প্রাণের টান সত্যিই থাকে। না খেতে পেয়ে মরে যাবে, তবু এ কাজ সে করবে না।

টুরা বলে—আহা! তোদের সমাজ করেছে এ নিয়ম, ওর দোষটা কী?

—দোষের কথা হচ্ছে না,—বন্ধু বলে—হচ্ছে প্রাণের টানের কথা। আসলে প্রাণের টান নেই। ওরও নেই, তোরও নেই।

মাথাটা দর্পিণী ফণিনীর মতো সঙ্গে সঙ্গে উঁচু করে টুরা, বলে—কী বললি! প্রাণের টান আছে কি নেই তুই কী করে বুঝবি?

বন্ধু তেমনি হাসে। বলে—পাদরীবাবার বাড়িতে যে তিনটি মেম থাকে, তার মধ্যে বড়োটি আমাকে একদিন ধরেছিলো। ধরে শুনে নিয়েছিলো সব কথা। তুই আমার কে, তাও সে জানে। বললে, তুই কী করে তোর বন্ধুর বউকে নিয়ে এলি?

আমি বললাম—বন্ধু বলেই বন্ধুর কাজ করেছি। বউকে রেখে ওকে মোষ দিয়ে সাহায্য করেছি। নইলে এত বয়সের বউ আবার নেয় কে?

মেম বললে—বউটা পালায় না ঘর ছেড়ে?

আমি বললাম—না। পালাবে কেন।

—উত্তরে মেম কী বললে জানিস? বললে, প্রাণের টান থাকলে নিশ্চয়ই পালিয়ে যেতো। আসলে মেয়েটার প্রাণেরই টান নেই।

চোখ ফেটে জল আসে টুরার, কিন্তু সে কিছু বলে না।

চোখে জল দেখে বন্ধু ওর কাছে এসে বলে—কাঁদছিস নাকি?

টুরা উঠে দাঁড়াতে যায়, বন্ধু ওর হাত ধরে ওকে জোর করে বসিয়ে দেয়, তারপরে বলে—অত প্রাণের টান থাকাও ভালো না। থাকলে

মানুষ মুশকিলে পড়বে যে? তার থেকে এই-ই ভালো। এই যে আমার কাছে আছিস, দিন চলে যাচ্ছে, ব্যস, আবার কী চাই? ভেবে দেখতে গেলে এটাই সঙ্গত কথা। কিন্তু মন তবু মানে কই? নানান ভাবনার ঝড়ে এলো-মেলো হয়ে দিনগুলো বয়ে যেতে থাকে।

টুরার আজকাল মনে হয়, পিনি যে আসছে না তাতে ভালোই হয়েছে। যদি তাকে ছাড়িয়ে না নিতে পারে? টুরা ধীরে ধীরে উঠে ইউক্যালিপ্‌টাস্ গাছটার কাছে যায়। গাছে বন্ধুর দা-টা দিয়ে সবার অলক্ষ্যে ও দাগ দিয়ে রাখে। কটা সপ্তাহ গেল? কটা সপ্তাহ কেটে গেল পিনির কাছ থেকে চলে আসবার পর?

টুরা দাগগুলো গোনে। মোটে ছটা দাগ পড়েছে। তার মানে দেড় মাস। এখনো অনেক বাকী ছাড়া পেতে। কিন্তু ছাড়িয়ে তাকে যদি না নেয়? আজকাল টুরার মনে হয়, ছাড়িয়ে না নিলেই ভালো। দু-দুটো দুধেল মোষ দিতে হবে পিনিকে। তার থেকে নতুন বিয়েই করুক পিনি। দুটো দুধলো মোষ দিলে আজকাল কাঁচা বয়সের বউ পেতে কষ্ট হবে না পিনির।

কথাটা ও ভাবছে বটে, কিন্তু বুকের ভিতরটা সঙ্গে সঙ্গে মোচড় দিয়েও উঠছে। একবার মনে হচ্ছে, পিনি তাই করুক, নতুন বউ এনে সুখে থাকুক। আবার মনে হচ্ছে—ঈস্, তাই বা কেন? সে কি ফ্যাল্‌না? ফ্যাল্‌নাই যদি হবে ত বন্ধু তাকে এতো আদর করতে আসে কেন? এতো খাওয়া-দাওয়ার ঘটাই বা করে কেন? বলে—তোর শরীর ভালোমন্দ খেয়ে খেয়ে দিন দিন সুন্দর হয়ে উঠছে!

কী লজ্জা! পিনির কাছ থেকে চলে আসবার পর তার দেহ হয়ে উঠছে সুন্দর!—টুরা ভাবে, না, ছেড়েই দেবো খাওয়া-দাওয়া।

কিন্তু, বন্ধুও কি তেমন মানুষ? একসঙ্গে সে খেতে বসাবে।—ভাত ফেলছো কেন? কতো কষ্টের ভাত। খেয়ে নাও। খাইয়ে দেবো নাকি?

লজ্জায় সে মুখ ফেরায়।

হো-হো করে হাসে বঙ্কু, বলে—মেমদের কাছে যাবি ?

—কেন ?

—আলাপ-সালাপ করবি। ওদের তোকে খুব ভালো লেগেছে।

টুরা বলে—বড়োটা ডাইনী না ?

—তাই ত লোকে বলে।

—তবে, তার কাছে যেতে বলছিস যে ?

বঙ্কু বললে—সে একটা কথা বটে। তবে ডাইনী তোর কী করবে ? ডাইনী নষ্ট করে বাচ্চাদের। তোর পেটে ত আর বাচ্চা নেই ?

টুরা কথাটা শোনামাত্রই মুখ নীচু করে। টক্‌টকে লাল হয়ে ওঠে মুখখানা। কিন্তু কতক্ষণের জন্য ? কয়েক মুহূর্ত পরেই মুখের ভাব ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হতে থাকে। ফ্যাকাশে বিবর্ণ হয়ে ওঠে মুখ, আর চোখের পাতায় টলমল করতে থাকে অশ্রুর বিন্দু।

অবাক হয়ে ওকে লক্ষ্য করতে থাকে বঙ্কু, অনেকক্ষণ সে কথাই বলতে পারে না। কতদিন তার কাছে এসেছে টুরা ? মাস দুয়েকও নয়। এরই মধ্যে—? তবে কি আগে থাকতেই ও—?

এগিয়ে এসে ওর একখানা হাত চেপে ধরে বঙ্কু, বলে—কী হয়েছে বল্ ত ?

টুরার চোখের জল আর বাঁধ মানে না। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকে সে।

বঙ্কু চুপ করে থাকে কিছুক্ষণ। তারপরে জিজ্ঞাসা করে—সত্যি বল্, পেটে তোর বাচ্চা ?

মাথা নেড়ে নীরবেই টুরা জানায়—হ্যাঁ।

—সে কী !

টুরা বলে—পিনিও জানতো না।

—পিনির ছেলে ?

টুরা জলভরা চোখ মেলেই তাকায় ওর দিকে, বলে—হ্যাঁ।

—কদিন ?

—তিন মাস।

—ওকে জানাসনি কেন ?

ক্লিষ্ট কণ্ঠে টুরা বলে—জানাবার সময় পেলাম কই ? বুঝে উঠতে না উঠতেই ত আমাকে তুই নিয়ে এলি।

বন্ধু চুপ করে থাকে। টুরা নিজেকে সামলে নিয়ে বলতে থাকে, সাধে কি আর আমি এসেছি ? পেটেরটা বেঁচে থাক, এটা আমি চাই। আমি না খেতে পেলে—

বলতে বলতে আবেগে ওর কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে যায়। বন্ধু বলে—তবে থাক, ডাইনীটার কাছে আর তোকে যেতে হবে না। এই জন্যই তুই কোথাও যেতে-টেতে চাস না বুঝি ?

টুরা মাথা নেড়ে জানায়—হ্যাঁ।

বন্ধু এবার বলে—একটা কথা বলবো ? তুই পিনির কাছে চলে যাবি ? আমি মোষ ফিরে চাইবো না, বা কোন কিছু দাবীও করবো না।

একটি চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে টুরা বললে—না। আমি যাবো না। ও যেদিন নিজে এসে নিয়ে যেতে চাইবে সেদিন যাবো।

বন্ধু গুম্ হয়ে বসে কী যেন ভাবে। লোকটা বিষয়ী, লোকটা হিসেবী, পিনির মতো অগোছালো নয়, আপন-ভোলাও নয়। পিনির মধ্যে একটু ছেলেমানুষী ভাব আছে, এর মধ্যে নেই। আশ্চর্য, ওর গম্ভীর মুখখানার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে একটা অদ্ভুত আকর্ষণও অনুভব করে টুরা। কোমল কণ্ঠে সে বলে ওঠে—ভাবছিস কী ?

বন্ধু ওর দিকে মুখ ফেরায়, তারপরে হঠাৎই উঠে দাঁড়ায়, বলে—কিছু না।

বন্ধু তারপরে বাইরে চলে যায় দেখে টুরা বলে ওঠে—কোথায় যাস ? এখন ?

—বারে, কাজ নেই ?

—কী কাজ ?

বন্ধু ওর মুখের দিকে তাকায়, বলে—তোর সঙ্গে সব সময় বসে বসে বক্‌বক্‌ করলে আমার চলবে ?

টুরা অল্প একটু হাসে, বলে—বক্‌বক্‌ করবি বলেই ত আমাকে এনেছিস ?

বন্ধু কয়েক পা এগিয়ে আসে ওর দিকে, বলে—আজ তোর হলো কী ?

—কী হলো ?

—এমন ধারা কথা ত কখনো বলিস না ?

টুরা বলে—কখনো বলি না বলে যে আজও বলবো না এমন কী দিব্যি দেওয়া আছে ?

—না, তা নয়—বন্ধু বলে—আচ্ছা দাঁড়া, আমি আসছি।

এবার আর ওকে বাধা দেয় না টুরা, ওর প্রস্থান-পথের দিকে তাকিয়ে চুপচাপ বসে থাকে। দেখতে দেখতে টিলার ওপরে উঠে যায় বন্ধু, একবার বুঝি ফিরে তাকায়, একখানা হাতও বুঝি নাড়ে, তারপরে টিলার বিপরীত দিকে অদৃশ্য হয়ে যায়। একখণ্ড সাদা মেঘ ভেসে যাচ্ছিল তখন টিলার পিছন দিককার আকাশের ওপর দিয়ে। মনে হলো সেই সাদা মেঘ যেন হাত বাড়িয়ে টেনে নিলো বন্ধুকে।

আর ঠিক সেই সময় একটা দম্‌কা হাওয়া এসে সামনের সেই শুভ্রদেহ তরুণ ইউক্যালিপটাস গাছটার মাথায় খেলা জুড়ে দিলো। পাতায়-পাতায় ঝিরঝির-ঝিরঝির একটা কাঁপন তুলে, মাথা হেলিয়ে ইউক্যালিপটাস যেন তাকেই ডাকতে লাগলো—আয় না ? আয় ?

মন্ত্রমুগ্ধের মতো উঠে দাঁড়ায় টুরা, ঘরদোর ভুলে গিয়ে ছুটে যেতে থাকে গাছটার কাছে। তারপর দুটি কোমল হাতে জড়িয়ে ধরে ইউক্যালিপটাসকে, ঠোঁট দুটি ছুঁইয়ে দেয় পরম মমতায়। তারপরে মৃদু—অতি মৃদু কণ্ঠে বলে ওঠে—পিনি, আমার পিনি !

গাছটার নাম রেখেছে ও—পিনি। কিন্তু সে কথা ইউক্যালিপটাস আর সে নিজে ছাড়া কেউ জানে না।

স্বপ্নের ঘোর-লাগা তন্দ্রাচ্ছন্ন মানুষের মতো সেই শুভ্রকায় বৃক্ষ-দণ্ডটিকে আশ্রয় করে ও যে কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে, তা ও নিজেই জানে না। হঠাৎ একটা শব্দে ও যেন জেগে ওঠে। চমকে তাকিয়ে দেখে, ওর ঝুপড়ীর সামনে দাঁড়িয়ে কে একটি মেয়ে কাকে যেন ডাকছে। ধবধবে সাদা পুটকলীর প্রান্তে গাঢ় লাল রঙের বর্ডার দেওয়া তুটো করে। মাথার বিনুনী করা চুলগুলো কালো কুচকুচে, আর রেশমের মতো নরম মনে হয়। ছিপছিপে তরুণ দেহখানা একটু হেলিয়ে সে তারই ঝুপড়ীর দিকে উঁকি দিচ্ছে।

—কে!

মেয়েটি সঙ্গে সঙ্গে মুখ ফেরায় ওর গলার স্বর শুনে। তারপরে ইউক্যালিপটাস গাছটার তলায় ওকে আবিষ্কার করে সবিস্ময়ে বলে ওঠে—মা!

পড়ে থাকে ইউক্যালিপটাস-রূপী পিনির স্পর্শ, পড়ে থাকে সব ভাবনা, সব কল্পনা—টুরা পড়ি-কি-মরি করে ছুটে আসে মেয়েটির দিকে। মেয়েটি যে তারই মেয়ে, তারই নাড়ি-ছেঁড়া ধন, তারই আত্মজা।

—তুই!

মেয়ে ছুটে এসে মাকে জড়িয়ে ধরে। মা বলে—এখানে এলি কেন?

মায়ের প্রশ্নে অবাক হয়ে যায় মেয়েটি। মুখ তুলে তাকায় মায়ের চোখের দিকে। মায়ের বড়ো বড়ো চোখ তুটি জলে ভরে আসে। সেই জল-ভরা বেদনার দিকে তাকিয়ে মেয়ে মায়ের মনটাকে বোঝবার চেষ্টা করে, তারপরে চাদরের আড়াল থেকে কোমরে-গোঁজা একটা

থলি-মতন কী যেন বার করে, আস্তে আস্তে দাওয়ায় নামিয়ে রাখে সেটা।

—কী ?

মেয়ে বলে—মাখন আছে থলির মধ্যে।

—মাখন! কেন ?

মেয়ে বলে—তোর জন্য পাঠিয়ে দিয়েছে।

—কে ? তোর স্বামী ?

—না।

—তবে কে ? তোর শ্বশুর ?

—না।

—শাশুড়ী ?

—না।

—তবে ?

মেয়ে হাত ধরে মাকে দাওয়ার ওপর বসায়, নিজেও তার পাশটি ঘেঁষে বসে পড়ে। বলে—কে দিয়েছে, আন্দাজ করতে পারো না ?

—না।

মেয়ে বলে—অদ্ভুত মানুষ তুমি।

—কেন! অদ্ভুত কেন ?

—এখনো বুঝতে পারছো না ?

—কী বুঝবো ?

মেয়ে মুখ ভার করে, বলে—আমার বাবাকে তুমি ভুলে গেছো!

মা এবার কিছু বলে না, মুখ নীচু করে, আর চোখ থেকে টপ টপ করে জল পড়তে থাকে নীরবে।

মেয়ে বলে—আমি এখ্খুনি ফিরে যাবো। ঘরের কাজ ফেলে রেখে এসেছি। তোমার জামাই বকবে।

মা কোন রকমে নিজেকে সামলে নিতে চেষ্টা করে, বলে—আবার কবে আসবি ?

—আসবো মাঝে-মাঝে।

—কেন? রোজই ত আসতে পারিস। ঘর ত কাছেই।

—তুমিও ত যেতে পারো?

দীর্ঘশ্বাস ফেলে টুরা বলে—না, আমি যেতে পারবো না। এ-ঘর থেকে নড়তে ভালো লাগে না।

—কেন?

—তুই বুঝবি না।

—কেন বুঝবো না? বড়ো হইনি?

মা বলে—তাহলে শোন্। ছ'মাসের জন্য আমাকে এখানে পাঠিয়েছে তোর বাবা। ছ'মাস না কেটে গেলে আমি কোথাও যাবো না, সে আমার ভীষণ লজ্জা করবে।

মেয়ে বলে—বেশ কথা। কিন্তু আমিই বা আসবো কেন? বন্ধু যদি রাগ করে?

মা বলে—না, তা সে করবে না। সে রকম মানুষই নয়।

মেয়ে বলে ওঠে—ভালো মানুষ হলেও আমার আসা উচিত নয়। বন্ধু কিছু মনেও করতে পারে ত? আর তাছাড়া, আমার বাবাই বা ভাববে কী? তুমি এখানে পরের ঘরে আছো, আর আমি খুসীতে ডগমগ হয়ে তোমার কাছে ঘোরাঘুরি করছি—খবরটা কি তার কানে মধু ঢালবে? আমার ত তা মনে হয় না।

টুরা এতক্ষণে বুঝি অধৈর্য হয়ে ওঠে। বলে—বেশ, না হয় নাই আসিস। তা হ্যাঁরে, তোর হাতে মাখনের থলি দিলো কখন?

—আজ সকালে।

—তোর বাড়িতে এসেছিল?

—হ্যাঁ।

—কী বললো?

মেয়ে বললে—কী আর বলবে? চুপিচুপি এটা আমার হাতে দিলো, বললে—পৌঁছে দিতে পারবি?

টুরা বললে—কী ছেলেমানুষী দেখ ত ?

—কেন ? ছেলেমানুষী কেন ?

টুরা বললে—বিক্রী করলে দুটো পয়সা আসতো।

মেয়ে রাগ করে বললে—হ্যাঁ। তুমি ঐরকমই ভাবতে থাকো। আমি চলি।

সত্যি-সত্যিই মেয়ে উঠে যায় দেখে, তাড়াতাড়ি ওর হাত ধরে কাছে বসায়, বলে—হ্যাঁ রে, শরীরটা কেমন আছে দেখলি ?

—আগেরই মতো।

—রোগা-রোগা দেখাচ্ছে, না ?

—না, তা ঠিক মনে হলো না। তবে, মুখ-চোখ একটু শুক্‌নো শুক্‌নো।

টুরা বললে—যা ভেবেছি, ঠিক তাই। ভেবে ভেবে অস্থির হচ্ছে। আচ্ছা, ভাবনার কী আছে বল তো ? আমি ত আর জলে পড়ে নেই !

মেয়ে বললে—বাবাকে বললুম এখানে আসতে। তা কিছুতেই এলো না, বললে, ছ'মাস পরে যাবো।

—তা-ই ভালো—মা বললে—একেবারে ছ'মাস পরে এসে আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে যাওয়াই ভালো।

মেয়ে বললে—সেদিন বন্ধুকে ছেড়ে যেতে তোমার কষ্ট হবে না ?

মা একটু অবাক হয়েই মেয়ের দিকে তাকায়। মেয়ে যে তাকে এমন প্রশ্ন করে বসবে, সেজন্য নয়। ওর বিস্ময় অন্যদিকে। মেয়ে আজকাল তাহলে বড়ো হয়েছে, এতদূর পর্যন্ত ভাবতে শিখেছে !

অল্প, ম্লান একটু হেসে টুরা বললে—কষ্ট হতে পারে। কিন্তু সেটাকেই কী বড়ো করে দেখবো ?

মেয়ে চুপ করে বসে থাকে। মা বলে—অন্য কথা বল ? তুই ভালো আছিস ত ?

—আছি।

—জামাই যত্নআত্তি করে ত?

—তা করে।

—কটা মোষ এখন তোদের?

—দুটো।

—দুটোই দুধ দেয়?

—হ্যাঁ।

—দুটোতে চলে?

—কষ্টেশিষ্টে কোনরকমে চলে যায়।

মা একটুক্ষণ থেমে থেকে আবার জিজ্ঞাসা করে—আকাল কতো-দিন চলবে রে?

মেয়ে বলে—কে জানে! বুনো মোষদের মধ্যে মড়ক এখনো চলেছে।

মা প্রশ্ন করে—হ্যাঁরে, আমাদের 'শান্তির পাহাড়'-এর কোনো খবর শুনতে পাস?

—পাই।

—কী খবর বল ত?

মেয়ে বলে—'শান্তির পাহাড়'-এর মানুষরা আরো দূরে দূরে সব চলে যাচ্ছে।

—সবাই?

—না, সবাই নয়। তবে অনেকেই।

—তোর বাবাও যাচ্ছে নাকি?

—না।

—ঠিক জানিস?

—ঠিক জানি। আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে।

—কী বললে?

—বললো মরে গেলেও 'শান্তির পাহাড়' ছেড়ে যাবো না, ওখানে বিন্নুর আত্মা আজও ঘুরে বেড়ায়।

টুরা বলে—বিশু কে, জানিস ত? আমার দাত্নু।

—জানি।

টুরা বলে—জামাইকে একদিন পাঠিয়ে দিস না আমার কাছে?

—কেন?

টুরা বলে—দেখবো।

—সে ত আমাদের ঝুপড়ীতে গিয়েও দেখে আসতে পারো।

মা বলে—ঐ যে বললাম, যেতে পারবো না।

মেয়ে বলে—তাহলে জামাই-ই বা আসবে কেন?

মার চোখ আবার দেখতে দেখতে সজল হয়ে আসে। বলে—ছেলে মায়ের কাছে আসবে না?

মেয়ে পাকা গিন্নীর মতো জবাব দেয়—টোডা মেয়ে হয়েও নিয়মটা জানো না? ভাইবোন না থাকলে ছেলে আসতে পারে?

মা বলে—সে কথা তুই নিজেও বলতে পারিস। এলি কেন?

মেয়ে বলে—আমার কথা ছেড়ে দাও। আমি এলাম প্রাণের টানে।

মা আর কিছু বলে না, মেয়ের মুখের দিকে কিছুক্ষণ ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে। তারপর হঠাৎ এক সময় বলে ওঠে—আমার জন্য একটা কাজ করতে পারবি?

—কী কাজ?

মা মেয়ের হাত দুটো ধরে বলে—তোর বাবাকে খুঁজে বার করতে পারবি? না হয় জামাইকে সঙ্গে নিয়ে শান্তির পাহাড়েই যাস।

—গিয়ে?

মা বললে—গিয়ে বলবি, আমি ডেকেছি, জরুরী কথা আছে।

—আসবে?

মা বললে—না আসতে চায় ত একটা কথা বলবি।

—কী কথা?

মা বললে—বলবি তোর ভাইবোন হবে। মা তাই কোথাও যায় না, ডাইনীর চোখ লাগতে পারে।

মেয়ে সোজা হয়ে বসে। চোখ বড়ো বড়ো করে বিস্ময়ের সঙ্গে বলে ওঠে—সত্যি !

মা বললে—ছ মাস পরে তোর বাবা যখন আসবে, তখন তোর বাবার সঙ্গে ঠিক ফিরে যেতে পারবো একা একা। আমার ছেলে বা মেয়ে যাই হোক না কেন, হয় যেন শান্তির পাহাড়ে।

মেয়ে এবার উঠে দাঁড়ায়। বলে—বাবা 'পুরুসুৎপুমি' করে ছিল না ?

—করেছিল।

—তবে আর ভাবনা কী ?

মা বলে—না হলেও ভাবনা ছিল না। যে আসছে, সে তোর নিজের ভাই কি বোনই বটে।

মেয়ের মুখখানা এতক্ষণে খুশীতে ঝলমল করতে থাকে। বলে, আমি যাই। বাবাকে খবরটা আমি দেবোই যেমন করে পারি।

মা-ও উঠে দাঁড়ায়, মেয়ের কাঁধে সস্নেহে হাতখানা রেখে বলে ওঠে—দিস। এ-খবরটা তার জানা দরকার।

মেয়ে আর কিছু বলে না। মায়ের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে যায়। টিলার উপরে উঠে একবার বুঝি থমকে দাঁড়িয়ে ফিরে তাকায়, হাতখানা নাড়ে, আর তার পরেই টিলার পিছনে অদৃশ্য হয়ে যায়।

হঠাৎ যেন ভারমুক্ত হয়ে যায় মনটা। আর তার ফলেই একটা খুশীর হিল্লোল বইতে থাকে শরীরের শিরায়-শিরায়। গুনগুন করতে করতে টুরা উঠে পড়ে, দৈনন্দিন গৃহকাজে নিমগ্ন হয়ে পড়ে। সেই ইউক্যালিপটাস গাছটা আর নড়ায় না তার পত্রপল্লব, যেন স্থির হয়ে নিঃশ্বাস রোধ করে টুরার কার্যকলাপ লক্ষ্য করতে থাকে। ভাবে—ওর আজ হয়েছে কী ? এমন উচ্ছল আর প্রাণবন্ত এর আগে ত কখনো দেখি নি ওকে !

বেলা যায়। যেমন প্রতিদিন ফিরে আসে, তেমনি ঘরে আসে বন্ধু, খাওয়া-দাওয়া করে, আর আজকাল যা হয়েছে, রাত হলে পিদ্দীম জ্বালিয়ে কী সব কাগজপত্র মেলে ধরে চোখের সামনে। তারপরে মন্দিরে 'পেলল' যেমন বিড়বিড় করে মন্তর পড়ে যায়, তেমনি করে আপন মনে গুনগুন করতে থাকে সে। টুরা ওর রকম-সকম দেখে প্রথম-প্রথম অবাক হতো, ভাবতো, লোকটা 'পেলল' হয়ে যাবে নাকি ?

না, তা নয়। বন্ধু অল্প-অল্প হাসে, বলে, তামিলদের ভাষা শিখছি। কাজকর্মের বড় সুবিধে হয়।

টুরা বলে—কী তোর কাজকর্ম, তা-ও বুঝি না।

বন্ধু হাসে, বলে, টাকা জমাচ্ছি, দেখছিস না ? এই টাকা দিয়ে অনেক কাজ করা যাবে।

—কী কাজ ?

বন্ধু বলে—টাকা দিয়ে টাকা টেনে নিয়ে আসা।

টুরা ওর দিকে অবাক হয়ে তাকায়। টাকা দিয়ে টাকা নিয়ে আসার চিন্তা টোডারা কখনো করে না। এই লোকটাকে এ-সব চিন্তা পেয়ে বসলো কী করে ?

সেই মানুষ আজও বাড়ি ফিরে কাগজপত্র নিয়ে বসেছে বটে অভ্যাসমতো, কিন্তু বেশ বোঝা যাচ্ছে মন দিতে পারছে না। কী যেন একটা ভাবনার ভার ওর চেতনার ওপরে পাষাণের মতো চেপে বসে আছে। এক সময় কাগজপত্র সরিয়ে রেখে ও উঠে বসলো। ডাকলো—টুরা ?

টুরা উৎসুক মুখে ওর দিকে তাকালো।

বন্ধু বললে—পিনির সঙ্গে দেখা হলো। ওকে নিয়ে আসতে চাইলাম, কিছুতেই এলো না।

টুরা অল্প একটু হাসলো, বললো—এই কথা! এইজন্য তুমি মুখ ভার করে বসে আছো ?

'বন্ধু' বললে—তোমার কষ্ট হয় না? ও এসে দেখাও ত করে যেতে পারে?

তেমনি টুকরো হাসির আলো জেগে আছে ওর ঠোঁটের কোণে, টুরা বললে—ও আসবে। আমি খবর পাঠিয়েছি, ও আসবে। মেয়ে এসেছিল। তার হাত দিয়ে কিছু মাখন পাঠিয়ে দিয়েছে, এই দেখ।

'বন্ধু' কেমন যেন বিহ্বল, কেমন যেন বিস্মিত হয়েই ওর মুখের দিকে তাকালো, একটা প্রচ্ছন্ন বেদনার কালো ছায়াও বুঝি খেলে গেল ওর মুখের ওপর দিয়ে। কিন্তু মুহূর্ত মাত্র, তার পরেই ঠোঁটের কোণে হাসি টেনে এনে বললে—যাক্, বাঁচা গেল। ও আসা-যাওয়া করলে তোর মুখে হাসি ফুটবে আর আমিও খুশী হবো।

টুরা বুড়ী আজও সেদিনকার সেইসব দিনগুলির কথা স্মরণ করে, চোখের জল রাখতে পারে না। বলে—জানিস? পিনি কিন্তু আমার মুখ রাখেনি, আসেনি আমার সঙ্গে দেখা করতে। ওর বদলে এলো আর একদিন আমার মেয়ে। বললে—বাবাকে সব বলেছি। বাবা শুনে খুব খুশী। কিন্তু ছ'মাস না কাটলে সে আসবে না। ছ'মাস না কাটলে তুমিও দেখা করতে যেও না যেন। টুরা বুড়ীর শ্রোতৃদল স্তব্ধবাক্ হয়ে ওর কাহিনী শোনে, টুরা বুড়ী সেই সব নীরব শ্রোতৃদের দিকে তাকিয়ে আবার বলে—কী আর তোদের বলবো, ছ'মাস কেটে গেল, তবু পিনি এলো না। আমার বড়ো সাধ ছিল, বাচ্চাটা আমার স্বামীর ঘরে প্রথম সূর্যের আলো দেখবে—তাও হলো না। ততদিনে 'বন্ধু' অনেক টাকা জমিয়ে নিয়েছে, যখন-তখন উটাকলমাণ্ডে চলে যায়, এমন কি ঐ তিনটি মেমসাহেবের সঙ্গেও বেশ মিশে যায় সহজে। তোদের বলবো কী, আমার বাচ্চা হওয়ার ব্যাপারে একটি মেম-সাহেবই ত বাড়িতে এসে সব করলে। হাসিমুখে সেই মেমটিই আমার কাছে এসে বললে—তোমার সন্ হয়েছে—সন্। 'সন্' মানে ছেলে, জানিস ত? কী বলবো, পিনি এ খবর পেয়েও এলো না। মেয়ের হাত দিয়ে ছোট্ট একটি পুটকলী পাঠিয়ে দিলো শুধু।

মেয়েকে দিয়ে অতো করে খবর পাঠালাম, এলো না। 'বন্ধু' নিজে গিয়ে পীড়াপীড়ি করলো, তবুও না। বলে পাঠালো—আজও যখন ধার শোধ করতে পারলাম না, তখন আজও ওকে আনবো না।

'বন্ধু' কচি শিশুটির মুখের দিকে তাকিয়ে সস্নেহে বলে—পিনির মতোই মুখখানা হবে, না?

টুরা রাগ করে বলে—ওর কথা আর বলিস না।

'বন্ধু' বলে—আজও ওর অবস্থা ও ফেরাতে পারলো না। আমি বললাম, ধার শোধ তোকে দিতে হবে না। ছ'মাস কেটে গেছে, তোর বউকে তুই ফিরিয়ে নে।

টুরা জিজ্ঞাসা করে—উত্তরে কী বললে সে?

'বন্ধু' বলে—রাজী হলো না। বললে—পুরোপুরি ধার শোধ যেদিন করবো, সেদিনই ওকে আনবো, তার আগে নয়।

শুনতে শুনতে একটা প্রচণ্ড রাগ এসে অধিকার করে টুরার মন। প্রচণ্ড রাগ, আর প্রবল অভিমান। চীৎকার করে সে বলে ওঠে—আর কখখনও তুমি তার কাছে যাবে না, আর কখখনও না! সে আমার কেউ না—কেউ না।

মুখে বলে বটে, কিন্তু যখন কেউ কোথাও নেই, সে আর তার শিশু, তখন বুকের ভিতরে মোচড় দিয়ে উঠতে থাকে একটা দুঃখ আর বেদনার সুর। নিজের মনেই বলতে থাকে টুরা—একবারও এলি না তুই? আমাকে না হয়, বাচ্চাটাকেও ত দেখে যেতে পারিস?

দুপুরের দিকে সেই ছোট মেমটি আসে। তাদের ভাষা টুরা বোঝে না। কিন্তু টুরার ভাষা তারা বুঝে গেছে, শিখে গেছে, কাছে এসে হেসে বলে—কী গো, খোকাকে আদর করা হচ্ছে? খোকার আসল বাপ এলো কই?

টুরার চোখের পাতা ভিজে ওঠে। একটু সামলে নিয়ে সে বলে—বড়ো একরোখা মানুষ, ধার শোধ না করে সে আসবে না।

মেমটি ততদিনে ওদের সব কথা জেনে গিয়েছিল। বললো—ভারী ত দুটি দুধেল মোষ। এতদিনেও যোগাড় করতে পারলো না?

—কই আর পারলো! আজও যে আকাল চলছে।

আকালের কথায় মেমটি চুপ করে যায়। টুরা ত ঘর ছেড়ে কাছের টিলাটির ওপরেও ওঠে না, নীলগিরির উপত্যকা ঘিরে আকাশ কী ভয়াবহ রূপ নিয়েছে, তার খবর ও কী করে জানবে? মুখে সে বললে বটে, 'দুধেল মোষ যোগাড় করতে পারে না?'—কিন্তু মনে মনে সে জানে, আজ দুটি মোষ যোগাড় করা গরীব টোডাদের মধ্যে কতো কঠিন কাজ! একে মোষদের মড়ক চলেছে, কী এক ভয়াবহ ব্যাধিতে ওরা পটাপট মরে যাচ্ছে। আর দ্বিতীয়ত, টোডাদের মধ্য দিয়েই একদল উঠে দাঁড়াচ্ছে, যারা সমতলবাসীদের সঙ্গে ব্যবসা করে টাকা জমাচ্ছে, ক্ষমতা অর্জন করছে। আর এই অর্থবান আর ক্ষমতাবানরা পক্ষপুটাশ্রয়ে গিয়ে দাঁড়াচ্ছে বৃটিশ প্রভুর।

তিনটি বিদেশিনীর মধ্যে এই ছোট মেমটি টোডাদের সঙ্গে মেশে, মনটাও স্নেহপ্রবণ, নাম,—মেরী। খাঁটি বৃটিশ নয়, আয়র্লণ্ডের মেয়ে।

মেরী ওকে বললে—তুমি ত তোমার স্বামীকে ভালোবাস খুব, তাই না?

টুরা মুখ তুলে বললো—একথা জিজ্ঞাসা করছো কেন?

বললে—দুটো মোষের বদলে টাকা দিয়ে ধার শোধ হয় না?

টুরা বলে—তা হয়। 'বন্ধু'রও টাকার ওপর ঝোঁক বেশী। কিন্তু পিনি টাকা পাবে কোথেকে?

মেরী উত্তর দেয়—আমি যদি টাকাটা দিই পিনিকে?

—ওমা, তুমি দেবে কেন?

—যদি দিই? আমার আছে।

টুরা বলে—তোমার কাছ থেকে পিনি নেবে কী? যে গোঁয়ার!

—আমি ধার হিসাবেও দিতে পারি ত?

টুরা হেসে বলে—আমাকে রেখে সে ধার নিতে পারে। কিন্তু তুমি আমাকে নিয়ে করবে কী?

মেরী হেসে ওকে দুহাতে জড়িয়ে ধরে। বলে—তোমাকে নিয়ে আলাদা একটা ঘরে না হয় বাস করবো। বাচ্চাটাকে মানুষ করবো দুজনে মিলে। কেমন?

টুরা হাসে, বলে—যতো সহজে বলছো, তত সহজ নয় ব্যাপারটা। একটা বাড়তি মেয়েকে খাওয়ানো পরানো—তার ওপরে এই বাচ্চা,—খরচ কী কম?

—তার জন্য তুমি ভেবো না।

টুরা বললে—তাছাড়া, তোমার সঙ্গে বাস করলে আমাদের সমাজের লোকেরা রেগে যাবে। ভাববে—খৃষ্টান হয়ে গেছি বুঝি। তখন পিনিই কি আমাকে ফিরিয়ে নিতে চাইবে?

এসব সমস্যার কথা মেরী ভাবেনি। সে কথাটা শুনে চুপ করে যায়। তারপরে এক সময়ে বলে—অবশ্য এখানে তুমি সুখেই আছো। তোমার 'বন্ধু' তোমাকে সুখেই রেখেছে।

টুরা বলে—তা রেখেছে।

মেরী বলে—এর পর হয়তো এমন হবে যে, তুমি আর পিনির কথা ভাববে না, পিনির কাছে যেতেও চাইবে না।

শিউরে উঠে টুরা বলে—না না—একী বলছো!

মেরী বলে—হতেও ত পারে! আর তাছাড়া 'বন্ধু'রও 'মন' বলে একটা জিনিস ত আছে? তারও হয়তো মন পড়ে গেছে তোমার ওপরে। ওকে ছেড়ে তুমিও বা যাবে কী করে?

টুরা-বুড়ী চোখ বুজে যেন তার মনের অন্তস্তলে তলিয়ে যায়। যে স্মৃতির মণিগুলি ইতস্ততঃ ছড়িয়ে আছে, তা যেন একে একে কুড়িয়ে নিতে থাকে সে। তারপর চোখ খোলে, শ্রোতৃদের সামনে মেলে ধরে যেন বলতে চায়—এই দেখ, কী আমি তুলে এনেছি।

বাচ্চাটার বয়স তখন মাস ছয়েক হবে। ওকে নিয়ে সেদিন দুপুর

বেলায় এই প্রথম তার ঘরের বাইরে পা বাড়ালো টুরা। প্রথমেই গেল সে খুঁজে খুঁজে তার মেয়ের কাছে। বললে—তোর বাপের খবর জানিস ?

মেয়ে ত মাকে দেখে অবাক ! বলে—আগে বসো দেখি, একটু জিরোও।

মা বলে—না, জিরোবো না। কোথায় তাকে এখন পাবো বল্ ?

মেয়ে বলে—কোথায় আবার ! শান্তির পাহাড়ে।

মা বলে—আমি চললাম। 'বন্ধু'র সঙ্গে দেখা হলে বলিস।

মেয়ে মার হাত ধরে বলে—পাগল হয়েছো ? বাচ্চাটার কষ্ট হবে যে রোদ লেগে ! বরং তুমি এক কাজ করো। তুমি এখানে বসো, আমি মাঠে গিয়ে তোমার জামাইকে ধরছি। সে শান্তির পাহাড়ে গিয়ে ডেকে নিয়ে আসুক আমার বাপকে।

—পারবি ?

—হ্যাঁ, পারবো। তুমি বসো।

বলে মেয়ে সত্যি সত্যিই ছুটে যায় মাঠে। ফিরে আসে তেমনি ছুটতে ছুটতে কিছুক্ষণ পরে। বলে—দাও মা, ভাইকে আমার কোলে দাও। তোমার জামাই ছুটেছে শান্তির পাহাড়ে।

—আসবে কি ?

—কেন আসবে না ? মেয়ে বলে—তাকে ত 'বন্ধু'র বাড়িতে আসতে হচ্ছে না ? এ আমার বাড়ি—আমার ঘর।

টুরা-বুড়ী এইখানে আবার একটু থেমে যায়। তার শ্রোতৃদের মুখের দিকে তাকিয়ে সে যেন কী বোঝবার চেষ্টা করে। ওরা সব নির্বাক্, ওরা যেন সবাই তার যুগে চলে গেছে। একজন বলে উঠলো—দেখা হলো তারপর ?

টুরা উত্তর দিলো—হলো। কঙ্কালসার একটা মানুষ এসে আমার সামনে দাঁড়ালো। তখন পাহাড়ে বড্ডো জ্বর দেখা দিয়েছে,

পটাপট লোক মারা যাচ্ছে। এমন কি, সেই পাতা সেদ্ধ করে খেয়েও দেখা গেছে, জ্বর সারছে না। মানুষ তখন উটকামণ্ডে যাচ্ছে সাদা-মানুষদের হাসপাতালে। কিন্তু, সেখানকার ওষুধেই বা ভালো হচ্ছে কই? জ্বরের প্রথম দিকে যদি গিয়ে পড়া যায় তাহলে ওষুধে একটু কাজ হয়, নইলে, আর কোনো উপায় নেই। পিনি সেরেছে বটে, কিন্তু শান্তির পাহাড় শ্মশান হয়ে গেছে।

টুরা জিজ্ঞাসা করেছিল—আমার কথা একটুও মনে পড়ে না? বাচ্চাটা ত তোরই, ওকে দেখতেও কি ইচ্ছে করে না?

পিনি নিস্পৃহ ভঙ্গীতে বলে—ইচ্ছে করলেই বা উপায় কী? আমি ত তোকে আজও ছাড়াতে পারছি না।

—কেন পারছিস না!

পিনি বলে—মোষ কই আমার? আকাল চলেছে এখনো।

—মোষ ধরতে পারিস না?

পিনি বলে—পারলাম আর কই? অনেক দূর বনে মোষ পাওয়া যায়, কিন্তু সে হচ্ছে ইরুলাদের এলাকা। সে বনে ঢুকলে আর রক্ষে আছে?

—তাহলে আমি কি করবো?

—যেমন আছিস, তেমনি থাক।

টুরা বলে—'বন্ধু' যদি ছেড়ে দেয়?

—তুই আসবি কেন?—পিনি বলে—ওভাবে এলে আমি নেবোও না।

টুরা-বুড়ী বলে—সে-সব দিনকার মানুষই ছিল এইরকম। আজকাল তোদের মধ্যে অনেকে স্বামীর কাছে পালিয়ে আসিস, আর সেই লোকটাও হৈ-চৈ বাধায়। তখন 'নিয়াম' ডাকো, বিচার হোক—এই সব সাত-সতেরো ব্যাপার। আমাদের সময়ে ছিল অন্য ব্যবস্থা। তার ওপরে পিনি। তার মতো মানুষই হয় না! তোদের বলবো কী, আর বছর দেড়েকের মধ্যে 'বন্ধু' নিয়াম-এর প্রধান হয়ে

গেল। ‘বন্ধু’র টাকা হলো, ‘বন্ধু’ সেই পাদরী-বাবার বাড়ির সামনের জমিতে বেশ বড়ো আর মজবুত ঝুপড়ী করলো। সেই মেম তিনটি তখনো আছে, তাদের মধ্যে মেরী যার নাম, সে প্রায়ই আসে, বলে—এবার একেবারে সামনে এসেছো। যখন-তখন আসতে পারছি। আর টিলা পার হতে হয় না। তোমাদের সেই ইউক্যালিপটাস-গাছটা দেখেছো? প্রকাণ্ড বড়ো হয়েছে। ঝাঁকড়া-মাথা বুনো মোষ যেন একটা। তোমাকে হারিয়ে একেবারে পাগলের মতো হয়ে গেছে।

টুরা বলে—এখানে এসে অবধি আর আমার যাওয়া হয় না।

মেরী বলে—সে ত দেখতেই পাচ্ছি, ‘বেবী’টাকে নিয়েই সব সময়ে তোমার কাটে।

টুরা বলে—খুব তুরন্ত।

মেরী হাসে, বলে—হবে না? বাচ্চাদের একটু তুরন্ত হওয়াই দরকার।

টুরাদের বাড়ির সামনে দাওয়ায় বসে তুজনে কথা বলছিল। ওদের ঠিক সামনে মেরীদের ‘চার্চ’ আর বাড়ি—আর তার ডানদিকে সেই সরু পথটা, যেটা ধরে ঝাউবনে ঢুকে ক্রমশ টিলায় উঠতে হয় ওদের সেই পুরনো ঝুপড়ীর দিকে যেতে গেলে। কে আছে পুরনো ঝুপড়ীতে এখন? টুরা মনে করতে চেষ্টা করে লোকটার মুখখানা। শান্তির পাহাড় থেকে পালিয়ে আসা একটি মানুষ, ‘বন্ধু’র কাছ থেকে ঘরখানা নিয়েছে ভিক্ষে করে। লোকটা যখন পারলো, পিনিও কী পারত না? আজও সে তেমনি ঘুরে বেড়ায়, পরের মোষ নিয়ে চরিয়ে আনতে যায়, কিন্তু সেই দেখা হওয়ার পর দেড়টি বছর কেটে গেল, তাকে নিতেও এলো না, একটিবার চোখের দেখাও দেখতে এলো না। যদি অন্য একটি বউ যোগাড় করতো, টুরা কিছু বলতো না, ভাবতোও না। কিন্তু একী ওর বাউণ্ডুলেপনা? প্রায়ই শুনি জ্বরে ভোগে। রোগা ডিগডিগে চেহারা।

মেরীর কাছে সব খুলে বলতে গিয়ে টুরা কেঁদে ফেললো। মেরী

ওকে সান্ত্বনা দেয়। বলে—আমাদের এখানে একটি ছোটখাটো হাসপাতাল হচ্ছে। ফাদারকে দিয়ে ওকে ধরিয়ে আনবো, চিকিৎসা করবো এখানে রেখে। তখন ও আর পালাবে কোথায়? রোজই দেখা হবে তোমার সঙ্গে।

হাসপাতাল মানে ওদের ঝুপড়ীর মতোই কতগুলি পাশাপাশি ঝুপড়ী। টোডাদের জন্যই করা। সাদা-মানুষরা নিজেরা কিন্তু থাকে পাকা ঘরে, টালি-বসানো ছাদের নীচে। ওদের নিজেদেরও একটা হাসপাতাল-ঘর আছে, লোহার খাট বসানো। কারুর কখনো জ্বরটর হলে ঐ ঘরে—ঐ খাটে গিয়ে শুয়ে থাকে।

মেরী মানুষটা খুব ভালো, ওদের ওপর তার সত্যিকার একটা ভালবাসা আছে। নতুন যে পাদরী-বাবা এসেছেন, তাঁকে দিয়ে সত্যিই একদিন ধরে নিয়ে এলো পিনিকে। আগে আগে চলেছেন পাদরী-বাবা, আর তার পরে মুখ নীচু করে চলেছে পিনি, বড়ো-বড়ো চুলে পাক ধরেছে, মাথাটা ঝুঁকে পড়েছে সামনের দিকে, গায়ের চাদরটা ছেঁড়া আর ময়লা। ছেলেটাকে কোলে নিয়ে রাস্তা পর্যন্ত ছুটে এলো টুরা, কিন্তু সে একবার মুখ ফিরিয়ে তাকালো না পর্যন্ত তার দিকে।

মেরীই দেখাশুনো করতো তার। বললে—না খেয়ে না খেয়ে শরীর ওরকম করেছে। দাঁড়াও না, খাইয়ে-দাইয়ে ওকে তাগড়াই করে দিচ্ছি। প্রথমেই করেছি কী জানো? একটা কাঁচি দিয়ে চুল আর দাড়িগুলো ছেঁটে দিয়েছি। কেমন দেখাচ্ছে, একবার দেখবে এসো।

মুখ ভার করে টুরা বললে—না। আমি দেখবো না।

মুখে দেখব না বললেও মন পড়ে থাকতো ঐ দিকেই। সকালে 'বন্ধু' বেরিয়ে যাবার পরই বাচ্চাটাকে কোলে নিয়ে টুরা এগিয়ে গিয়ে সামনের রাস্তাটার ওপর ঘুর-ঘুর করতো। একটু দূরেই নতুন তৈরী করা ঝুপড়ীগুলি, যার একটিতে সে আছে। মেরী ত বলে, ভালো

আছে। কিন্তু সত্যিই ভালো আছে কী? নইলে ধীরে ধীরে বাইরে এসে দাওয়ায় বসে না কেন?

না, তা সে বসে না। টুরা যে ছুটে ওদের ঝুপড়ীতে চলে যাবে, তাও পারে না, পা দুটো কে যেন অদৃশ্য বন্ধনে বেঁধে রাখে। নিজের অবস্থা দেখে নিজেরই রাগ হয়। মনে মনে বলে—আচ্ছা মানুষ ত, নিজের স্বামীও বটে! ছুটে গিয়ে পড়বি বুকের ওপরে, তাতে এতো চিন্তা-ভাবনার কী আছে?

কিন্তু কী এক দুর্জয় অভিমান ওর ভিতরে বন্দী অজগরের মতো গুম্‌রে গুম্‌রে উঠতে থাকে, ওকে ওর ইচ্ছামত কাজ করতে দেয় না।

মেরী সেদিন দুপুরে আসতেই ওকে বলে টুরা—ভালো আছে?

—আছে, কিচ্ছু ভেবো না।

—হাঁটতে পারে?

—কেন পারবে না?

টুরা বলে—তুমি একটি কাজ করবে? ওকে একদিন আমার কাছে নিয়ে আসবে?

মেরী বলে—আমি বলেছিলুম। আসতে চায় না কেন বলো ত?

মুখখানা পাংশু হয়ে যায় টুরার, বলে—তাহলে আমি যাবো?

—চলো না। এখনই চলো।

জোর করে নিজেকে যেন টেনে নিয়ে চললো টুরা। আগে চার্চ, তারপরে মেরীদের ঘরগুলো, তারপরে সাদা-মানুষদের জন্য টালিছাওয়া হাসপাতাল ঘরখানা, আর তারপরেই টোডাদের জন্য নির্দিষ্ট খুপরী-ঘর। ছেলেটাকে কোলে নিয়ে টুরা চলেছে মেরীর পিছন-পিছন। চার্চ-টার্চ পার হওয়া মাত্রই টুরা এক মুহূর্তের জন্য থম্‌কে দাঁড়ালো। টালি-ছাওয়া ঘরখানার বারান্দায় হেলানো চেয়ারে বসে আছে নতুন একটি সাদা মানুষ। নতুন পাদরী-বাবা নয়, এ অন্য মানুষ, একে আগে কখনো দেখেনি টুরা। রোগা-রোগা ফ্যাকাশে চেহারা, দুর্বল ক্লান্ত দেহটা এলিয়ে দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে আছে নিষ্পলক,

আর তার ঠিক পায়ের কাছে, মোটা চাদর দিয়ে শরীরটাকে বেশ করে ঢেকেঢুকে চুপচাপ বসে আছে পিনি। মুখের দাড়ি-গোঁফ আর মাথার লম্বা-লম্বা চুল অবিন্যস্ত। কোথাও-কোথাও অল্পবিস্তর পাক ধরেছে, দাড়িতেই বেশী, মাথার চুলেও—কানের দুই পাশে।

অস্ফুট কণ্ঠে টুরা ডেকে উঠলো—মেরী!

মেরী থমকে দাঁড়ালো। ডানদিকে চার্চ প্রভৃতির সীমারেখায় বেড়া দেওয়া আছে লতাপাতা দিয়ে।

এই বেড়া পথের সমান্তরাল চলে গেছে অর্ধ-বৃত্তাকার ঝুপড়ীগুলো পর্যন্ত। বেড়ার গায়ে গায়ে হালকা বেগুনী রঙের ফুল ফুটেছে। মেরী ভিতরের দিকে আর লক্ষ্য করেনি। নইলে অনেক আগেই চোখে পড়তো। টুরা হাত তুলে নির্দেশ করলো বেড়ার ভিতরে। মেরী ওদের দুজনকে দেখে নিলো এক পলকে, তারপর ঈষৎ তরল কণ্ঠে বলে উঠলো—আরে, যার কাছে যাচ্ছিস সে যে এখানে! কী করে এলো?

পিনি এতই অন্যমনস্ক ছিল যে, কিছুই লক্ষ্য করেনি। এইবার মুখ তুলতে গিয়ে সে-ও অবাক হয়ে গেল। শীর্ণকায় সাহেবটিও ওদের দিকে মুখ ফেরালেন। মেরী মাথা হেঁট করে ওদের ভাষায় কী যেন বললো, তার উত্তরে মাথা হেলিয়ে সাহেবটিও উচ্চারণ করলো অনুরূপ ভাষা। আর তারপরে মেরী ওর বাম কনুইটা ছুঁয়ে ইঙ্গিত করলো ভিতরে যাবার।

টুরা-বুড়ীর চোখে আবার জল এসে পড়ে সেদিনের কথা বলতে গিয়ে। পিনি আমার চোখের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলো, সে চোখে কী যে মমতা, কী যে মায়া ঝরে পড়তে লাগলো তা বলার নয়। আমার ভিতরটা যেন হু-হু করে উঠলো। ওর কাছে বসে পড়লাম ধপ করে। বাচ্চাটাকে ওর কোলে তুলে দিলাম। ও বললে—আমি সেরে গেছি, কিন্তু তবু এরা আমাকে ছাড়ছে না। আমাকে খাইয়ে-দাইয়ে মোটা করে তুলবে বলছে।

মেরী ততক্ষণে সাহেবকে নিয়ে ভিতরে চলে গেছে। আমি সামান্য টোডা মেয়েছেলে, আমি অতশত কী বুঝবো? চেয়ারটা ঠেলে ঠেলে সাহেবটাকে নিয়ে গেল। পিনি বললে—চেয়ারে চাকা লাগানো। একজনেই ঠেলে ভিতরে নিয়ে যেতে পারে। সাহেবটার খুব অসুখ জানিস? উটকামণ্ডে ছিলো, ওখান থেকে এখানে পাঠিয়ে দিয়েছে। এখানকার জল-বাতাস ভালো, খোলামেলা বেশী, লোকজনের ভীড়ও কম। সাহেব লোকজন একেবারে পছন্দ করে না। ওকে দেখতে উটকামণ্ড থেকে বড়ো-বড়ো সাহেবরা আসে, 'ডাক্‌তর'রা আসে, জানিস!

আমি ওসব কথা শুনলে ত? আমি অবাক হয়ে লক্ষ্য করছি বাচ্চাটাকে। সে পিনির কোলে গিয়ে একটুও কান্নাকাটি করছে না, দিব্যি হাত-পা নেড়ে খেলা করছে। পিনি বললে—ভারী সুন্দর হয়েছে ত!

চোখে জল এসে গিয়েছিল আমার, বলেছিলাম—আয় না ঘরে।

ও মুখ তুলে তাকালো আমার দিকে। যেন মুহূর্তে ওটা পাথরের মুখে পরিণত হয়েছে, কোন ভাব নেই, মায়া-মমতার লেশমাত্র নেই। বললে—আমি যাবো না।

—কেন?

পনি বললে—আমি ধার না শোধ করলে যাই কী করে?

আমি কেঁদে উঠলাম, বললাম—তাই বা তুই পারলি কোথায়? দুটো মাত্র দুধেল মোষ, তা-ও তুই যোগাড় করতে পারলি না!

পিনি বললে—তুই বিশ্বাস কর, আমি চেষ্টার ত্রুটি করিনি। বনের মধ্যে কতদূর চলে গেছি মোষ ধরতে। কিন্তু শরীরে আর সয় না, বুকে হাঁপ করে, মাথা ঘুরে যায়—যেন 'টিয়েকজ্রি'র রাগ আমার পিছু নিয়েছে।

আমি তখনো কাঁদছি, বললাম—আর আমার দিনগুলো কেমন করে কাটে, তুই বল্?

পিনি বলে—এমন আকাল আসবে কেমন করে বুঝবো? মোষ মরেছে, তার ওপরে মরেছে মানুষ। গা গরম হয়ে জ্বর হয়। কয়েকটা দিন জ্বরে ভোগে, আর তারপরে ধড়ফড় করে মারা যায়। আমাদের শান্তির পাহাড় শ্মশান হয়ে গেছে। আমার মা গেছে, বাবা গেছে, ভাইরাও কেউ নেই। আমিও যেতাম, সাহেবদের হাতে পড়ায় বেঁচে গেলাম।

চোখ মুছে, একটু স্থির হয়ে ওকে বললাম—সে না হয় গেল, চোখের দেখাটাও তো দেখে যেতে পারতিস।

পিনি বললে—'বন্ধু' বলেছিল, কিন্তু তোকে বলবো কী, আমার যেন কেমন ঘেন্না হলো।

—ঘেন্না?

পিনি বললে—'বন্ধু' লেখাপড়া শিখেছে, 'বন্ধু' সাহেবদের সঙ্গে ওদের ভাষায় কথা বলে, 'বন্ধু' তামিলদের সঙ্গে ব্যবসা করে, 'বন্ধু' আজ আমাদের প্রধান। কিন্তু গাঁয়ের প্রায় সব মোষ আজ সে সুযোগ বুঝে কিনে নিয়েছে, যার যতো ঘি-মাখন পাওনা, তারা তা সবটাই পায় না, 'বন্ধু' কেটে রেখে দেয় তার থেকে। বিক্রী করে পয়সা জমায়। উটাকলমণ্ডে পাকাবাড়ি করিয়েছে 'বন্ধু', সেখানেই তার কাজ-কারবার চলে। রোজ সকালে উঠেই ও চলে যায় কি না বল!

আমার কাছে এসব যেন এক নতুন জগতের খবর নিয়ে এলো। 'বন্ধু'র এত কথা আমি জানব কি করে? পিনি বললে—লোকে ভিতরে ভিতরে গজরায়, কেউ খুশী নয়, কোন্ দিন মানুষ ক্ষেপে গিয়ে ওর 'টু-এল' আক্রমণ করে মোষগুলো সব ছিনিয়ে নেবে।

—বলিস কী!

পিনি বলে—ওর লোভ বেড়ে গেছে—টোডাদের মধ্যে একা বড়ো হবো, এমন ধারণা কখনো কারুর মধ্যে ছিল না। আজ 'বন্ধু' সেই জিনিসটি করেছে। এ-গাঁয়ের যে 'পেলল', সে আবার ওর খুব

অনুগত—সেও ওর মতো লেখাপড়া শিখছে। এসব কী ভালো হচ্ছে, বল? তাই আমি খৃষ্টান হবো বলে সকালবেলা সাহেবটার কাছে এসে বসেছিলাম।

টুরা-বুড়ী কিছুক্ষণের জন্য আবার থেমে যায়। শ্রোতৃদের মধ্যে একজন বলে ওঠে—খৃষ্টান! পিনি শেষ পর্যন্ত খৃষ্টান হয়ে গিয়েছিল?

টুরা বলে—না। সেই কথাই বলছি শোন্। ওই যে রোগা সাহেবটা চেয়ারে বসেছিল গা এলিয়ে? ও-ই ওকে বুঝিয়েছে, খৃষ্টান কেন হবে? খৃষ্টান হয়ো না। ওর কথাতেই ওর মন ঘুরে গিয়েছিল বলতে পারো।

টুরা সেদিন, সেই ১৮৯৮ সালের জুন মাসের সকালে মেরীদের চার্চের সংলগ্ন কুটির-প্রাঙ্গণে পিনির সঙ্গে কথাবার্তা বলছিল, এমন সময় কী একটা দরকারে হঠাৎ বাড়ি ফিরেছিল 'বন্ধু'। ঘরে টুরাকে না দেখে সে চার্চের দিকেই আসছিল। সে জানতো, পিনি থাকে এখানে, হাসপাতালে। এবং এ-ও জানতো, ওকে দেখতে টুরা কখনো যায় না। সেদিন তাই, সেই বেগুনি-ফুলে-ভরা লতাপাতার বেড়ার আড়াল থেকে হঠাৎ ওদের দুজনকে ঘনিষ্ঠভাবে বসে থাকতে দেখে 'বন্ধু' একটু অবাকই হয়েছিল।

টুরাকে নিয়ে 'বন্ধু'র উদারতার সীমা-পরিসীমা ছিল না এ কদিন। কিন্তু আজ যখন সে অর্থ ও ক্ষমতা দুইয়েরই শীর্ষ বিন্দুতে সমাসীন, তখন তার মানসিকতা নিজের অজ্ঞাতেই কখন যে নতুন এক রূপ পরিগ্রহ করেছে, তা সে নিজেই জানতো না। বুকের ভিতরে একটা অননুভূত বেদনা যেন মুহূর্তে মোচড় দিয়ে উঠলো, আর তারপরেই একটা প্রবল হিংসা। মুহূর্তে ফণা তুলে সবটাই যেন বিষ করে তুললো। সবকিছু ভুলে সে প্রায় উন্মত্তের মতোই ছুটে এলো ওদের সামনে; এবং আশ্চর্য, যা কেউ কোনদিন স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি, তা-ই ঘটে গেল মুহূর্তে। কথা নয় বার্তা নয়, প্রশ্ন নয় কিছু নয়, ছেলেটাকে কেড়ে নিলো পিনির

কোল থেকে, ছেলেটা ককিয়ে উঠলো; ছেলেটাকে টুরার কোলে কোনক্রমে ফেলে দিয়ে পিনির দুটো বাহু ধরে ওকে দাঁড় করিয়ে দিল। আর তারপরে, কেউ কিছু বুঝে ওঠবার আগেই প্রচণ্ড এক ঘুঁষি বসিয়ে দিলো পিনির মুখের ওপর। ঘুঁষিটা পড়লো পিনির ডান গালের ওপর অংশে। পিনি পড়ে গেল। মুখ-নাক দিয়ে রক্ত বেরিয়ে এলো। কিন্তু, আরও অদ্ভুত ঘটনা। পিনি মুহূর্তে উঠে দাঁড়ালো। আর তারপরেই মনে হলো জঙ্গল থেকে একটা বুনো মোষ বেরিয়ে এসে যেন চোখের পলকে ঝাঁপিয়ে পড়লো 'বন্ধু'র ওপর। 'বন্ধু'কে চিত করে ফেলে তার বুকের ওপর হাঁটু গেড়ে বসে দুটি হাতে ওর গলা টিপে ধরেছে। হিংস্র জন্তুর মতো এইবার ওর মুণ্ডুটা বুঝি তীক্ষ্ণ নখে ছিঁড়ে আনবে, আর তারপরে করবে আকণ্ঠ রক্তপান।

এপাশ থেকে ওপাশ থেকে লোকজন ছুটে এলো। পাদরী-বাবা ছিলেন না, মেমরা ছুটে এলো। ঘরের ভিতর থেকে সেই রোগা সাহেবটা পর্যন্ত ছুটে এলো। সকলে মিলে সেদিন পিনিকে না ছাড়িয়ে দিলে কী যে সর্বনাশ হতো, তা ভাবা যায় না। বন্ধুর গাল-কপাল সব ছিঁড়ে গেছে। মার খেয়ে টলছে লোকটা। ওকে সবাই ধরে নিয়ে গিয়ে সেই ঝুপড়ী হাসপাতালে শুইয়ে দিলো, আর পিনিকে দিলো গালাগাল। পিনিকে যে 'বন্ধু'ই প্রথমে এসে আচমকা ঘুঁষি মারে, এটা ওরা দেখতে পায়নি। ওরা পিনিকেই সর্বদোষে দোষী করলো। এমন কি মেরী পর্যন্ত টুরার সাক্ষ্য শুনলো না। পিনিকে বললে—এক্ষুনি বেরিয়ে যাও, নইলে বেঁধে চালান দেবো উটকামণ্ডে।

টুরা ছুটে গেল পিনির কাছে, চোখে জলের ধারা বইছে, গলার স্বর অস্বাভাবিক। পাগলের মতো বলতে লাগলো—যা তুই বেরিয়ে। দুটো দিন তোকে সময় দিলাম—দুটো দিনের মধ্যে যেমন করে হোক দুটো মোষ ধরে নিয়ে আসবি। যদি না পারিস তাহলে তিন সত্যি করছি—ঐ উঁচু পাহাড় থেকে ঝাঁপিয়ে পড়বো—তোর বউকে আর তুই জীবনে ফিরে পাবি না।

সব ঝড়েরই একটা সমাপ্তি আছে, সব ঝড়ের শেষেই একটা শান্তি নেমে আসে। যাকে বলে 'ফার্স্ট এড', সেটা পাবার পর অনেকটা মাতালের মতোই টলোমলো পদক্ষেপে ঘরে ফিরে আসে 'বন্ধু'। অপরাধীর মতো আস্তে আস্তে ডাকে—টুরা ?

উত্তর দেয় না টুরা, কিন্তু ধীরে ধীরে কাছে এসে দাঁড়ায় হেঁট মুখে। 'বন্ধু' বলে—পিনি কোথায় ?

টুরা মুখ তোলে, চোখ দুটো তখনো তার অগ্নিবর্ষণ করছে যেন। বলে—সে গেছে জঙ্গলে মোষ ধরতে

—কেন ?

—দুদিনের মধ্যে আমাকে সে ছাড়িয়ে নেবে।

'বন্ধু' ম্লান হাসে, বলে—মোষের দরকার কী, 'ছাড়ান' তো এমনিতেই দিতে পারি। কতদিন বলেছি—

কথাটা শেষ না করে থেমে যায় 'বন্ধু'। টুরার মুখের দিকে তাকিয়ে বলে—আমি জানোয়ার হয়ে গিয়েছিলাম, না ?

টুরা মুখ ফেরায়, কোনো উত্তর দেয় না।

পরদিন ভোর হতে না হতেই মেরী ছুটে আসে ওদের কাছে। বলে—তোমরা দুজনেই আছো। সাহেব ডাকছে, একবার এসো।

তখন জুন মাস, কিন্তু ভোরের বাতাসে যথেষ্ট হিমেল ভাব। গায়ের চাদরটা ভালো করে টেনেটুনে 'বন্ধু' ছুটে গেল। মেরী টুরাকে বললে—তুমি যাবে না ?

—না। বাচ্চাটা ওঠেনি যে এখনো।

মেরী বললে—বাচ্চাটা উঠলে ওকে নিয়ে এসো। সাহেবের অবস্থা ভালো নয়, লোক পাঠিয়েছি উটকামণ্ডে, ডাক্তার সাহেবরা এলো বলে। দুরন্ত টাইফাস রোগ, সোজা কথা নয়! পাহাড়ে পাহাড়ে লোক ছারখার হয়ে যাচ্ছে ওই রোগে।

বাচ্চাটা উঠতেই ওকে খাইয়ে শান্ত করে সাহেবের কাছে গেল টুরা। সাহেব ঘরের ভিতরে তার বিছানায় শুয়ে আছে, তার শিয়রে

মেরী, আর পায়ের কাছে একটা মোড়ার ওপর বসে আছে 'বন্ধু' থমৃথমে মুখ নিয়ে। সে যেতেই মেরী এগিয়ে এসে তার হাত ধরে সাহেবের কাছে নিয়ে গেল। একটা মাদুর পেতে দিলো। সাহেব তার দিকে তাকিয়ে অল্প একটু হেসে আবার মুখ ফেরালো 'বন্ধু'র দিকে, তারপরে আস্তে বলে যেতে লাগলো তাদের ভাষায়, টুরা তা বুঝলো না, সে মেরীর পেতে দেওয়া মাদুরটার ওপর বসে অবাক হয়ে শুনতে লাগলো শুধু সেই আশ্চর্য শব্দগুলি। 'বন্ধু' ওদের ভাষা বোঝে, সে একমনে গম্ভীর মুখে সাহেবের কথা শুনে চলেছে।

মেরী ওর পাশে এসে বসলো। তার পরে ফিসফিস করে বললো—সাহেবের নাম জানিস ? মিস্টার গুডউইন।

টুরার জানবার কথা নয় গুডউইন কে, কোথা থেকেই বা এসেছে। ভগ্নস্বাস্থ্য ফেরাবার জন্যই সে উটিতে এসেছিল, কিন্তু স্বাস্থ্য ফেরবার আগেই টাইফাসের মহামারী তার করাল হস্ত প্রসারিত করলো তার দিকে। প্রথম ধাক্কাটাও সামলে উঠেছিল গুডউইন, উটির কর্তৃপক্ষ তাকে পাঠিয়ে দিয়েছিল এখানকার এই মনোরম পরিবেশে, কিন্তু গতকাল ধড়মড় করে উঠে 'পিনি' আর 'বন্ধু'র মারামারির মধ্যে তার না গিয়ে পড়লেই ভালো ছিল। হার্টের অবস্থা খারাপ ছিল, উঠে চলাফেরা করা পর্যন্ত বারণ ছিল—এই পরিস্থিতিতে নিজেকে ভুলে অমন করে দৌড়ে আসা তার পক্ষে বিপজ্জনকই হয়েছে বলা যায়।

মেরী বলে—এক হিন্দু সন্ন্যাসীর সেক্রেটারী ছিল এই গুডউইন। হিন্দু সন্ন্যাসী বক্তৃতা দিতেন, আর গুডউইন তা সঙ্গে সঙ্গে সর্টহ্যাণ্ডে লিপিবদ্ধ করে রাখতো।

গুডউইন সাহেব 'বন্ধু'কে কী বলেছিল টুরা তা জানে না। বলেছিল—তুমি তোমার জাতের মধ্যে 'প্রধান', কিন্তু তা বলে তোমাদের জাতের সব অর্থ সব সম্পদ একার অধিকারে আনবার চেষ্টা করছো কেন একে একে ? এতে করে তুমি একা বাঁচতে পারো, কিন্তু তোমার জাতের আর সবাই কী বাঁচবে ? খোঁজ নিয়ে দেখ,

তোমাদের জাতের মোট সংখ্যা এখন পাঁচশোরও বেশী নয়। সব যদি যায়, আর একা তুমি যদি থাকো, তাহলে তুমিও কি রেহাই পাবে শেষ পর্যন্ত ? অন্য জাতের লোকেরা এসে তোমার সব-কিছু লুটেপুটে খাবে, তা সে যে-ভাবেই হোক।

এই গুডউইন সাহেব আরও তুদিন বেঁচে ছিল। 'বন্ধু'র মধ্যে এসেছিল অদ্ভুত এক পরিবর্তন। সে হয়ত নিজেই একদিন তার সব অর্থ সব সম্পদ সবার মধ্যে বিলিয়ে দিতো, কিন্তু তার আগেই শোনা গেল এক বিপর্যয়ের সংবাদ। 'বন্ধু'র টু-এল্ থেকে খেতে-না-পাওয়া মরীয়া লোকগুলো সব মোষ জোর করে ছিনিয়ে নিয়েছে, আর তাদের নেতৃত্ব করেছে পিনি স্বয়ং। 'বন্ধু' সংবাদ শুনে স্থির নিশ্চল রইলো, ছুটে গেল না টু-এল-এর দিকে, বরং কী ভাবতে ভাবতে এগিয়ে গেল গুডউইন সাহেবের কাছে।

আর ওদিকে মাথার চুল এলোমেলো, সারা মুখে ঘাম, চাদরটা ছিন্নভিন্ন, তুটো মোষ টানতে টানতে পিনি নিয়ে এলো 'বন্ধু'র তুয়ারে। একটা খুঁটির সঙ্গে তুটোকে বেঁধে রেখে ধপ করে এসে বসে পড়লো ঘরের তুয়ারে। হেঁকে বললে—'বন্ধু', তোমার ধার শোধ। আমার বউকে ফিরিয়ে দাও।

ভিতর থেকে ঝড়ের মতো বেরিয়ে আসে 'বউ', বলে—লজ্জা করে না, ওরই মোষ চুরি করে আবার সেই মোষই ওকে ফিরিয়ে দিয়ে বলছিস—ধার শোধ ! যা, চলে যা—আমি কিছুতেই যাবো না।

পিনি অবাক হয়ে বলে—বারে, বনের মোষ পাবো কোথায় ?

—তা বলে চুরি ! ছি-ছি !

বলে মুখ ফিরিয়ে ঘরের মধ্যে চলে যায় টুরা। বাইরে থেকে বার বার ডাক দেয় পিনি—টুরা, টুরা !

কোন উত্তর আসে না। পিনি হতাশ হয়ে একসময় ফিরে চলে যায়।

গুডউইন বাঁচলো না। মেরীকে বলে গেল—লোকটাকে নিয়ে

আমার গুরুর কাছে যেতে পারো ? ম্যাড্রাসে যেতে পারো, কলকাতায় যেতে পারো, কোথায় তিনি এখন আছেন আমি জানি না। ম্যাড্রাসের ঠিকানাও আমার ডায়রীতে লেখা আছে, কলকাতারও আছে। দেখে নিও। ম্যাড্রাসে খোঁজ করবে মিস্টার আলাসিঙ্গার, আর কলকাতায় খোঁজ করবে সিস্টার নিবেদিতার। লোকটার পোশাক কিনে দিও কিন্তু, ওভাবে ওকে নিয়ে যেও না।

'বন্ধু' মানুষটাই বদলে গেছে গুডউইন সাহেবের মৃত্যুর পর। সারাদিন ঘুরে ঘুরে ধরে নিয়ে এলো পিনিকে, বললে—এই তোর ঘর রইলো, এই তোর বউ রইলো। আমি চললুম সিস্টার মেরীর সঙ্গে।

—কবে ফিরবে ?

—তা জানি না। 'বন্ধু' বললে—আমি একজনের সঙ্গে দেখা করবো।

—কে সে ?

'বন্ধু' বললে—একজন হিন্দু সন্ন্যাসী।

—কোথায় ?

'বন্ধু' বললে—ম্যাড্রাস, কলকাতা, যেখানে তাকে পাবো।

—সে আবার কোথায় ?

—জানি না, তবে অনেক দূর।

পিনি ওর হাত দুটো ধরে বললে—ফিরতে তোমাকে হবেই।

'বন্ধু' বলে—দেখা যাবে।

—যাচ্ছোই বা কেন ?

'বন্ধু' বললে—শান্তি পাবার জন্য। গুডউইন সাহেব বলেছে, সেই হিন্দু সন্ন্যাসী শান্তি দিতে পারেন।

ওকে সত্যিই কেউ আর আটকাতে পারলো না, এমন কি টুরাও না। একান্তে ডেকে নিয়ে বললে—যাচ্ছিস কেন ? তুই কি জানিস না আমার অবস্থা ?

'বঙ্কু' জানতো। বললো—ভাবনা কী? 'পুরুসুৎপুমি' করেছিল পিনি—তোর সব সন্তানের ও-ই ত বাপ।

টুরা বললে—কিন্তু আমার পেটে এখন যে এসেছে, সে ত তোরই।

এত বড়ো আকর্ষণকেও ছিন্ন করলো 'বঙ্কু'। পিনিকে আঘাত করার পর থেকেই ওর মধ্যে কিসের এক অনুতাপ বৈরাগ্যের বিষাণ বাজিয়ে চলেছিল। গুডউইনের আশ্বাস, গুডউইনের মৃত্যু যেন ওকে দ্রুত সেপিনের দিকে ঠেলে দিতে লাগলো। 'পরিব্রাজনা' ওদের রক্তে আছে, কিন্তু ওদের সেই মানসিকতা নীলগিরি পর্বতমালায় ঘুরে ঘুরেই তৃপ্তিলাভ করতো। এশিয়া মাইনর থেকেই আসুক অথবা সিন্ধু অববাহিকা থেকেই আসুক—ওরা নীলগিরির মায়ায় আবদ্ধ হয়ে গিয়েছিল। দোদাবেতার স্বর্ণকিরীট আর সিরুভবানীর রজতধারাই ওদের জীবনধারাকে নিয়ন্ত্রণ করছে কয়েক শ' বছর ধরে, তার বাইরে যাবার সাহস ওদের হয় না, স্বপ্নও দেখতে পারে না বাইরে যাবার। অথচ, এই ওদেরই মধ্য থেকে ছিটকে বেরিয়ে গিয়ে এক ইতিহাসই সৃষ্টি করেছিল 'বঙ্কু', যা এখনও ওদের মুখে-মুখে ফিরে বেড়ায়।

দিনের পর দিন কেটে গেছে তারপর। 'বঙ্কু' আর ফিরে আসে-নি। সেই হিন্দু সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দের দেখা সে পেয়েছিল কি না তাও কেউ জানে না। 'বঙ্কু'র ঔরসজাত সন্তান হয়েছিল একটি ছেলে, তার মধ্যে দেখা যেতো বঙ্কুর মতো ওইরকম বাইরে যাবার আকাঙ্ক্ষা। 'পাহাড়ের ওপারে কী আছে'? উটকামণ্ড থেকে যন্ত্রের গাড়ি চড়ে কোথায় যাওয়া যায়? এই সব কথা ক্রমাগত শুনতে হতো টুরাকে।

ক্রমে ক্রমে ওদের মুল গাঁয়েও এসে লাগলো মহামারী। দুটি পুত্রসন্তান নিয়ে, পিনিকে নিয়ে টুরা এলো শান্তির পাহাড়ে। পিনি আবার ঘর ওঠালো নিজের হাতে। টুরা-বুড়ী বলে—এই সেই ঘর, যেখানে বসে তোদের গল্প বলছি।

১৯২১ সালে মারা গিয়েছিল টুরা-বুড়ী। পিনি তার অনেক আগে। ছেলে তুটির বিয়ে দেওয়া হয়ে গিয়েছিল যথা সময়েই। তারা গাঁয়ের ভিন্ন দিকে গিয়ে ঝুপড়ী তুলেছিল। পিনি যতদিন বেঁচেছিল, ততদিন কারুর কোনো ব্যক্তিগত সম্পত্তি বলে কোনো পদার্থ ছিল না, কে 'টিভালিয়ল', কে 'টারথারল'—তা নিয়েও কোনো মাতামাতি ছিল না। কিন্তু সে চোখ বোজবার পর আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে লাগলো সবরকম বৈষম্য।

টুরা-বুড়ী যেদিন মারা যায় সেদিন আকাশটা ছিল মেঘে ঢাকা। বুড়ীর শরীর ভালো যাচ্ছিল না কদিন ধরে, তুপুরবেলায় মেয়েরা এসে বসতো, বলতো—গল্প বলবে না? বুড়ীর মুখ দিয়ে কথা বেরুতো না, ঘড়ঘড় করে ক্ষীণ কণ্ঠে কী যে বলতো, বোঝা যেত না, মেয়েরা বিরক্ত হয়ে ফিরে যেতো।

সেদিনও অমনি তারা ফিরে গেছে, টুরা একটা লাঠি হাতে ঠুকঠুক করে বেরুলো। এবং ভাবতে গেলে অবাক হয়ে যেতে হয়, অতোটা পথ হেঁটে রুগ্ন মানুষটা ওদের পরিত্যক্ত সেই মূল গাঁয়ে পৌঁছলো কেমন করে? সেই যেখানে পাগল ফোরি গাছের গায়ে কেটে কেটে দাগ করতো—সেইখানে এখন ইউক্যালিপটাসের জঙ্গল। সবাই খুঁজতে খুঁজতে এসে দেখে বুড়ী এরই একটি গাছের তলায় চুপচাপ নিশ্চল শুয়ে আছে আকাশের দিকে মুখ করে। মুখটা একটু খোলা, চোখ তুটো বোজা। ওটা পেরিয়ে কাছের টিলায় উঠেই আবার নামতে হয়। সেখানেই সে প্রথম এসেছিল 'বন্ধু'র সঙ্গে 'বন্ধু'র ঘরে। বুড়ীর কি শেষ ইচ্ছা হয়েছিল, নিজের চোখে ওই জায়গাটা একবার দেখে যাবার? তার সামনেই সেই শিশু ইউক্যালিপটাস এখন বেশ বড়ো হয়েছে। অনেক উঁচু হয়েছে। অনেকটা দূর সে যেন দেখতে পায় তখন। হয়ত বা দূরের ওই শান্তির পাহাড়ই সে দেখে—কে জানে!

'শান্তির পাহাড়' এখন অনেক অদৃশ্য বিধিনিষেধের বেড়া দিয়ে

ঘেরা। টুরার যে বড়ো ছেলে, তার একটি কন্যা ছিল, ছিল একটি ছেলে। কন্যাটিই বড়ো। কন্যাটি আবার একটি শিশুকন্যার জন্ম দিয়েছিল। কিন্তু মেয়েটা বছর কয়েক বড়ো হতে না হতেই মায়ের যে কী হলো মাথাটা খারাপ হয়ে গেল। লোককে অযথা যা-তা গালাগালি দিতো, যখন-তখন পরনের কাপড় খুলে ফেলে নিরাবরণ হয়ে যেতো। ধরে-বেঁধে উটকামণ্ডের হাসপাতালে নিয়ে যাবার কথা হচ্ছে, এমন দিনে পাগলিনী এক চরম বিপদ ঘটিয়ে বসলো। শিশুকন্যার বিয়ের 'বাগদান' পর্যন্ত করা হয়ে গেছে, পুটকলীও নিয়েছে নিজের হাতে—মন তখন খুশীতেই ভরা থাকবার কথা, অথচ কী যে ঘটে গেল—'হাসপাতালে নিয়ে যাবে' 'হাসপাতালে নিয়ে যাবে' শুনেই মাথা গরম হয়ে থাকবে হয়ত। ব্যস, আর যায় কোথায়—উঁচু পাহাড় থেকে এক লাফ।

বাচ্চা মেয়েটার নাম মুনিমা, সে অতশত বুঝতো না। রাত্রে মাকে না পেয়ে সে কাঁদতে লাগলো। বাপ মেয়েকে কাছে টেনে নিলো। বললে—ভয় কি?

মুনিমা সেই থেকে বাপের অতি আদরে মানুষ হতে হতে মাকে ক্রমশ ভুলে গেল। বাপ ছাড়া আর তার কোনো বাধাই নেই। যা আছে, তা কৌতূহল। মা যে বনের মধ্য দিয়ে গিয়ে পাহাড়ে উঠেছিল, সেই বনে কী আছে? কী আছে ঐ পর্বতমালার ওপারে? যেদিকে তাকাও পাহাড়। ঐ পাহাড় ছাড়িয়ে যাবার নিয়ম টোডাদের আর নেই। জঙ্গলে 'কুরুম্বা'রা থাকে, ওরা সাংঘাতিক লোক, দেখতে পেলেই ধরে নেবে।

'ইরুল' বলে অন্য পাড়ার একটি প্রায়-সমবয়সী ছেলের সঙ্গে আলাপ হয়ে গিয়েছিল মুনিমার। আলাপ কেন, ভাবও বলা যায়। মাঠে মোষগুলোকে সার দিয়ে নিয়ে যায় পুরুষরা, সঙ্গে ছোটছেলেদেরও অভাব নেই। ইরুলও যেতো অমনি তার বাপের সঙ্গে। ইরুল ওকে প্রথম প্রথম দিনকতক লক্ষ্য করলো, তারপরে একদিন থাকতে

না পেরে এগিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করলো—কে রে তুই, এই মেয়েটা? একা একা ছুটে ছুটে মাঠে আসিস? কুরুম্বারা দেখলে ধরে নিয়ে যাবে যে!

ঠোঁট উল্টে মুনিমা বলে—ইস্! ধরে ত তোকে ধরবে।

ইরুল এক-একদিন মোষের পিঠে চড়ে বাঁশী বাজাতে বাজাতে আসতো। বাঁশী দেখে ছোট মেয়েটারও চোখ দুটো বড়ো বড়ো হয়ে উঠতো, বলতো—এই, কোথা থেকে পেলি রে?

মোষের পিঠ থেকে নেমে তার কাছে চলে আসতো ইরুল, বলতো—বাবা এনেছে বাদাগাদের হাট থেকে। আমিও হাটে যাবো একদিন।

—আমাকে নিয়ে যাবি?

—যাবো।

শুধু হাটই নয়, নানান জায়গায় তারা ঘুরে ঘুরে বেড়াতো। দুজনেই প্রায় একবয়সী, দুজনেরই বয়স তখন প্রায় দশ। (১৯৪০ সালের কথা। উটকামণ্ড তখন শৈলাবাস হিসাবে যেমন বিস্তৃতি লাভ করেছে তেমনি খ্যাতিমান হয়েছে।) দুটিতে খুব ভাব হয়েছে। দুটিরই মনে এক ধরণের কৌতূহল। পাহাড়ের ওপারে কী আছে? অরণ্য পেরিয়ে কোন্ দেশে যাওয়া যায়?

সব থেকে কৌতূহল সৃষ্টি করতো পাহাড়ের চূড়াগুলো। তিন দিকের ওই পাহাড়শ্রেণী আর অন্য দিকের ওই ঘন অরণ্যানী যেন মূর্তিমান নিষেধের মতো দাঁড়িয়ে আছে তাদের সামনে। ভূতপ্রেত আর দত্যি-দানার ভয়ও দেখাতো ওদের অভিভাবকেরা। ওদের মনে হতো, ভূতপ্রেত আর দত্যি-দানারা যদি সত্যিই না থাকতো, তাহলে তারা একদিন ঠিক চলে যেতো ওই পাহাড়টা পেরিয়ে।

দুটিতে রোজই এই যুক্তি করে। কিন্তু, ঠিক ভরসা পায় না। মেঘ ডাকে, আকাশটা কালো হয়ে যায় মেঘে, ঝরঝর ঝমঝম করে বৃষ্টি নামে,—সে-ও নাকি ওই ভূতপ্রেতের কীর্তি। ইরুলেরও মা ছিল

না, মুনিমার মতন তার ছোটবেলাতেই মারা গিয়েছিল। তাকে মুনিমার বাবা যেমন মুনিমাকে ভালোবাসে, ইরুলের বাবা তেমন ভালোবাসে না। বরং এক একদিন ইরুলকে ধরে খুব মারে।

সেদিনও বেদম প্রহার খেয়েছে ইরুল তার প্রমত্ত পিতার হাত থেকে। সেদিন সে এসে মুনিমাকে বললে—চল্, চলে যাই।

মুনিমা একমুহূর্ত ভেবে নিলে, তারপরে বললে—আচ্ছা, চল্।

যেন ব্যাপারটা কিছুই নয়। মাঠে-মাঠে ছুটোছুটি করার মতোই সাধারণ ব্যাপার। চল্ বললেই যেন চলা যায়।

অন্য স্বভাবের দুটি ছেলেমেয়ে। অন্যের থেকে কৌতূহলের উগ্রতাও ওদের বেশী। মুনিমার মধ্যে ওর ঠাকুরদা পিনির রক্ত প্রবহমান, যে মানুষটিও ঐরকম যাই-যাই করতো সব সময়। আর ইরুল? কে জানে তার মধ্যেও অমন 'যাই-যাই' স্বভাব গড়ে উঠলো কেমন করে! সে এদের কেউ নয়, এমন কি এক গোত্রেরও নয় সে। প্রত্যেক জাতির মধ্যেই—সর্বকালে—এক একটি ছেলেমেয়ে এসে জন্মায়—যারা দলছাড়া, গোত্রছাড়া, ভিন্ন প্রকৃতির। যা করবার নয়, তাই ওরা করে বসে—যা ভাববার নয় তাই ওরা ভেবে বসে। শত নিষেধের উত্তুঙ্গ পর্বত, শত সংস্কারের গহীন অরণ্য—কিছুই ওদের পথ আটকাতে পারে না। শত প্রহারে জর্জরিত হয়েও ওরা একদিন হঠাৎই বাঁধন ছিঁড়ে ছুটে যায় দূরে—এ যে কোন্ নিগূঢ় প্রেরণা, তা কে বলবে?

সত্যিই অবিশ্বাস্য কাণ্ডটি ঘটেছিল সেই ১৯৪০ সালে,—নীলগিরি উপত্যকায়—ওদের সেই পাহাড়-ঘেরা ছোট্ট টোডা গ্রাম 'শান্তির পাহাড়'এ। দশ বছর বয়সের দুটি টোডা ছেলেমেয়ে সেদিন কিছু না জেনে কিছু না শুনে হঠাৎই এসে উপস্থিত হয়েছিল অরণ্য আর পর্বতের বাধা পেরিয়ে উটকামণ্ডের প্রান্তসীমায়। ক্ষুধার্ত, ভীত, সন্ত্রস্ত দুটি শিশু।

রেভারেণ্ড কুমারস্বামী তাদের স্থান দিয়েছিলেন প্রথমে। সেখান থেকে কেমন করে যেন আবার তারা ছিটকে পড়লো অনেক দূরে। একজন এক চা-বাগানের কর্মিণী হয়ে, অপরজন আরো দূরে—এক হোটেলের চাকর হয়ে—কিন্তু সে অন্য কাহিনী।

তার ঠিক পনেরো বছর পরে অতর্কিতে আবার ওদের দেখা হলো দুজনের। পঁচিশ বছরের দুটি যুবক-যুবতী। ১৯৫৫ সাল। ইরুল আর মুনিমা। ইরুলের পরনে ধুতি আর সার্ট, মুনিমার পরনে শাড়ি আর ব্লাউজ। দেখা সেই উটকামণ্ডেই।

—সুখে আছো?

মুনিমার এ-প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেনি ইরুল। ছোটবেলায় সেই যে কী খেয়ালে তারা দুটিতে বেরিয়ে পড়েছিল গ্রাম থেকে, আর ফিরে যেতে পারেনি। পথ হারিয়ে গিয়েছিল। কিংবা, যাদের কাছে এসে পড়েছিল, তারা সঠিক পথ দেখালো না, পথ আরো ভুল করিয়ে দিলো।

—তুমি সুখে আছো?

ইরুলের জিজ্ঞাসার উত্তর দিতে গিয়ে কেঁদে ফেলেছিল মুনিমা। দুজনেই ঘটনাচক্রে আবার হয়েছে কাছাকাছি। এ-ও কি দৈব নির্দেশ? একজন—এক দেশী সাহেবের বাড়ির আয়া, অন্য এক প্রতিবেশী দেশী সাহেবের খাস বেয়ারা।

সেদিন ওরা চলে গেল পরস্পরের কাছ থেকে। কিন্তু দেখা হতে লাগলো প্রায়ই। কাজের ফাঁকে ফাঁকে দূর থেকে দেখা হয় দুজনের, কখনো বা পথে।

দেখে মনে হয়, দিনরাত কী যেন ভাবে ইরুল গভীরভাবে। কী যেন আরও কিছু জানতে চায়, কী যেন জানবার তৃষ্ণা আজও ওর মেটেনি। মুনিমা প্রশ্ন করলো একদিন—কী ভাবো অত?

চমকে উঠেছিল ইরুল। বললে—কী ভাবি!

—তুমিই জানো।

আরেকদিন। মুনিমা বললে—আমার কিছু জানতে চাও না?

—না।

আরেকদিন। এদিনও প্রথম কথা বললে মুনিমা—আমি যে তোমার কথা জানতে চাই।

—জানবার মতো কিছু নেই।

—কেন? এ ক'বছর কোথায় ছিলে, কেমন ছিলে, তার মধ্য থেকে জানবার মতো কিছু নেই?

উত্তর দেয়নি ইরুল।

আরেকদিন। ইরুল বললে—ঐ যে দূর দিগন্তে উঁচু পাহাড়টা মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে, ওর নাম জানো? দোদাবেতা। এই নীলগিরি পাহাড়ের সর্বোচ্চ চূড়া।

দুটি আশ্চর্য মুগ্ধ চোখ মেলে ওর চোখের দিকে তাকালো মুনিমা।

—কী, দেখছ কী?

মুনিমা গাঢ় কণ্ঠে বললে—কতো জানো তুমি?

উত্তেজিত হয়ে মুহূর্তে উঠে দাঁড়ালো ইরুল; বললে—কিছুই জানি না। জানা আমার হলো না।

—আর কী জানতে চাও?

—ঐ আকাশটা যেখানে হুমড়ি খেয়ে পড়েছে পাহাড়ের ওপরে, ওর ওপারে কী আছে? আজও জানতে ইচ্ছা করে।

মুনিমা বলেছিল—তা যাও না কেন চলে?

উত্তর দেয়নি সে।

আরেকদিন বলেছিল—আমি সঙ্গে গেলে যাবে?

—না।

আশ্চর্য হয়ে উত্তর দিয়েছিল মুনিমা—কেন!

অল্প একটু হেসেছিল ইরুল, কিছু বলেনি।

কেঁদে ফেলেছিল মুনিমা—এই কথাটা তুমি বললে! অথচ তোমার জন্য—

—জানি।—ইরুল বলেছিল—আজও আমার সঙ্গে তোমার আপত্তি নেই আমি জানি। কিন্তু আমি ভাবছি অন্য কথা। অন্য দেশে যদি যাই ঐ পাহাড়টার চূড়োটা পেরিয়ে, তাহলে গিয়ে কী দেখব? এই একই মানুষ, একই তাদের ধরন-ধারণ, একই তাদের মনের অবস্থা। যদি অন্য কিছু না দেখতে পাই? আমার স্বপ্ন চুরমার হয়ে যাবে। সেইজন্যই ভয় হয়।

—আচ্ছা?

—কী?

—অন্য কোনো দেশে কি গিয়েছিলে এই উটকামণ্ড ছেড়ে?

—হ্যাঁ, তা গিয়েছিলাম।—ইরুল বললে—এই একই ব্যাপার। একই ছাঁচে ঢালা মানুষ—শুধু ভিন্ন ভাষায় তারা কথা বলে, আর ভিন্ন পোশাক পরে।

আরেকদিন।

ইরুল বললে—এর থেকে আমাদের ঐ টোডাগ্রাম অনেক ভালো। আমাদের পরনে পোশাক নেই, পেটে নানারকম খাদ্যও যায় না, কিন্তু তবু আমরা ভালো।

হু-হু করা কান্নায় এতক্ষণে ভেঙে পড়ে মুনিমা।

—চল্, আমরা চুপিচুপি পালিয়ে যাই দেশে।

মুখের দিকে কান্না-ভরা চোখেই তাকালো মুনিমা—আমার সাহেব যদি মারে?

—মারবে!

—হ্যাঁ, ছাখ্ আমার পিঠ।

ইরুল কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে তারপর বললে—তুই না আয়া? তোকে মারে?

—হ্যাঁ। অন্য কারুর সঙ্গে ভালোভাবে কথা বললেই মারে।

—সাহেবের বউ নেই?

—না।

—ও, বুঝেছি। সাহেবের ছেলেপিলেদের দেখিস বুঝি তুই ?

মুনিমা বললে—ছেলেপিলে কই সাহেবের ?

—নেই !

—না। সাহেবের আমি ছাড়া কেউ নেই।

মুনিমার মুখের দিকে চুপচাপ অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইল ইরুল। ওর দেহের বর্ণ কোনোদিনই খুব কালো নয়। আজকাল বেশ ফর্সাই দেখায় ওকে। চোখ দুটি খুব বড়ো নয়—কিন্তু টানা-টানা—ভুরু দুটি বাঁকা আর ঘন। মাথায় একরাশ চুল, পাতলা ঠোঁট, বাঁশীর মত নাক। নাকে ছোটবেলাকার সেই ছোট্ট সাদা পাথরের নোলকটি আজও ঝুলছে।

—একটা কথা বলবে ?

—কী ?

ইরুল বললে—তোমার ছেলে হয়েছিল ?

আবার কেঁদে ফেলল মুনিমা—সাহেব কী ওষুধ খাইয়েছিল—ছেলে বাঁচেনি, আমিও মরতে বসেছিলাম।

হঠাৎই এই সময় ওর হাতটি চেপে ধরেছিল ইরুল। বলেছিল, এসব আমারই জন্য। পাহাড় পেরিয়ে সভ্য দেশে কাদের আমরা দেখতে বেরিয়েছিলাম ?

আরেকদিন।

ইরুল বললে—সেই সন্ন্যাসীকে মনে আছে ? কুমারস্বামী ? তিনি মারা গেছেন। তাঁর অনাথ-আশ্রম থেকেই তো আমাদের নিয়ে আসে ?

—আমাকেও।

ইরুল বললে—অনেক রাত। লোকটা বললে—এসো খোকা। সন্ন্যাসী বললেন—যাও এঁর সঙ্গে। এখানকার শিক্ষা তো শেষ হলো। এবার ইনি তোমাদের কাজ শেখাবেন। জনা পাঁচ-ছয় ছেলে নিয়ে ইনি বেরুলেন। বললাম—মুনিমা ?

সন্ন্যাসী বললেন—সে এখানে থাকবে।

বলেছিলাম—আমি যাব না।

কিন্তু জোর করে হিঁচড়ে টেনে আমাদের নিয়ে এসেছিল লোকটা।

মুনিমা বললে—আমাকে নিয়ে এসেছিল একটি মেয়েলোক। চা-এর বাগানে। কী ভাবে যে সেখানে বড়ো হয়েছি, কী ভাবে যে সেখানে থেকেছি—সে আর শুনতে চেয়ো না। শেষকালে এই সাহেব ওখান থেকে আমাকে আয়ার কাজ দেবে বলে নিয়ে এসেছিল।

আরেকদিন।

ইরুল বললে—যাবে?

—কোথায়?

—আমাদের সেই গাঁয়ে। না না, তোমাকে যেতেই হবে। যা হয় হোক, এভাবে থাকলে তুমি মরে যাবে।

ওর কোলে মুখ রেখে অনেকক্ষণ ধরে কেঁদেছিল মুনিমা, বলেছিল তা-ই চলো।

কিন্তু, যাত্রা করার প্রাক্কালে আরেকবার থমকে দাঁড়িয়েছিল মুনিমা—আমাদের যদি সমাজে আর স্থান না দেয়?

—কেন!

দুটি ভীত আতঙ্কিত চোখের দৃষ্টি ওর চোখের ওপরে স্থাপিত করে মুনিমা বলেছিল—যদি আমাদের চিনতে না পারে!

ওর একটা হাত চেপে ধরেছিল ইরুল; বলেছিল—পারবে রে, পারবে।

—পোশাকটা বদলে নেবে?

—কী? এই ধুতি আর শার্ট ছেড়ে, খাটো ধুতি কোমরে জড়ানো? তা আমি পারি।

—কিন্তু, আমি?

ওর দিকে ভালোভাবে তাকালো ইরুল। সাহেবের বাড়িতে থেকে যেমন ঝকঝকে চেহারা হয়েছে ওর, তেমনি ভব্য ওর পোশাক।

মাথার চুল রীতিমতো সযত্নে লালিত, বেণীবদ্ধ। গায়ে লাল রঙের পাতলা কাপড়ের ব্লাউজ, অন্তরাল থেকে উঁকি দেয় অন্তর্বাস। পরনের হালকা গোলাপী শাড়িটা মাদ্রাজী ধরনে কুচি দিয়ে পরা। গলায় সরু সোনার হার, হাতে দুগাছা করে চুড়ি। একেবারে এক কাপড়ে বেরিয়ে আসা।

কিছুদূর পর্যন্ত নিশ্চুপে চলবার পর ইরুল হঠাৎ থমকে দাঁড়ালো; বললে—এইবার তোর প্রশ্নের উত্তর দেবো। ও-ভাবে শাড়ি পরা চলবে না, জামাও টান দিয়ে খুলে ফেলতে হবে।

মুহূর্তে লজ্জায় আরক্ত হয়ে গেল মুনিমার মুখখানা, মুখ নামিয়ে কোনক্রমে বললে—যাঃ! তা হয় নাকি?

কীরকম কঠোর নিষ্প্রাণ চোখে যেন কিছুক্ষণ তার দিকে তাকিয়ে ছিল ইরুল, কিন্তু আর কিছু সে বলেনি। নীরবেই শুরু করেছিল চলা, আগে-পিছে সংকীর্ণ বন্ধুর পথে।

সংকীর্ণ একটা গিরিবর্ত্ম পার হতেই অদ্ভুত দৃশ্য চোখে পড়ে। ঢেউয়ের পর ঢেউ তুলে পাহাড়গুলি চলে গেছে—কোনো-কোনো পাহাড়ে ওপর-নীচ করে সিঁড়ির মতো সাজিয়ে চাষ করা হয়েছে চা-এর অথবা কফির। তার ওপরে নীল-আকাশে-ভেসে-যাওয়া শরতের হালকা সাদা মেঘের ছায়া পড়েছে এসে। দূরে, সীমান্তে, গহীন এক অরণ্য-রেখা ধূসর লিপির মতোই চোখে পড়ে—তারই পরপারে আরেক পর্বতমালার সাক্ষাৎ মিলবে। চড়াই পথে সেই পর্বতে উঠে, এক চূড়া পেরিয়ে উৎরাইয়ের পথে তাদের গ্রামের সেই উপত্যকা। নীচে, বাদাগাদের কৃষিক্ষেত, তাদের আর কোটাদের গ্রাম। ওপরে তাদের নিজেদের একান্ত নিজস্ব গ্রাম—টোডা গাঁও। মাঝখানে শহুরে মেয়ের সিঁথির মতো সমান্তরাল এক রেখা টেনে দুধারে একই গ্রামের দুই বিভিন্ন বসতি—বাঁয়ে থাকে 'টারথারল' গোষ্ঠীর টোডারা, ডাইনে—'টিভালিয়ল' গোষ্ঠী।

টারথারলরা টোডাদের মধ্যে উঁচু জাতের মানুষ, আর টিভালিয়লরা নীচু জাতের। দু'জাতের মধ্যে বিয়ের প্রচলন নেই। যে-জাতের ভিতরে এক মেয়ের বিয়ে হয় বহু স্বামীর মধ্যে—পঞ্চপাণ্ডবের মতো ভাইরা মিলে বিয়ে করে এক স্ত্রীকে—যেখানে সভ্য জগতের মেয়েদের সতীত্বের সংজ্ঞার সঙ্গে এদের সংজ্ঞা মেলে না, সেখানেও একই সম্প্রদায়ের দুই জাতের মধ্যে বিবাহ-বিধি নেই। টারথারল মেয়ে ভাব করতে পারে টিভালিয়ল ছেলের সঙ্গে, সেটা নিন্দনীয় নয়, কিন্তু বিয়ে করতে পারে না।

মুনিমা টারথারল আর ইরুল টিভালিয়ল। বিয়ে ওদের হতে পারে না, হলোও না। কিন্তু ওদেরও কি সে ইচ্ছা ছিল? থাকলে ওরা অন্যত্র চলে গিয়ে একত্র থাকতে পারত—সভ্যজগতে পনেরো বছর কাটিয়ে মনের দৃঢ়তা ওরা অবশ্যই অর্জন করেছে। ইরুল আজ মুখ ফুটে বললেই ত হয়ে যায়।

কিন্তু ইরুলের মনের ভাব কিছুতেই বুঝতে পারলো না মুনিমা।

নীলগিরি পেরিয়ে যে নির্জনতম বন্ধুর চড়াই-উৎরাই পথ দিয়ে তারা আসছিল, সে-পথে কিছুটা অগ্রসর হতেই রাত্রি নেমে এসেছিল।

পিছন থেকে মুনিমা ওর হাত ধরে ফেলেছিল ভয় পেয়ে—কী করে চল্‌বি! যদি বাঘ-ভালুকে—

অদ্ভুত শান্ত আর দৃঢ় কণ্ঠে উত্তর দিয়েছিল ইরুল—যে বাঘ-ভালুকের হাত থেকে পালিয়ে এলাম, তাদের তুলনায় বনের বাঘ-ভালুক কিছুই নয়। তুই ভাবিসনি।

আতঙ্কের মধ্যেও একটা কৌতুকের হাসি জেগে ওঠে মুনিমার ঠোঁটের কোণে। কখনো 'তুমি' কখনো 'তুই'—ওদের সম্বোধনে কোনো সমতা থাকছে না। আর, থাকছে না বলেই বুঝি কথা বলে এতো মজা পাওয়া যাচ্ছে।

—এই, তুই তো আগে-আগে যাচ্ছিস, তোর পিছন থেকে আমাকে যদি বাঘে নিয়ে যায়!

দাঁড়িয়ে পড়ল ইরুল। বললে—পনেরো বছর আগে এই রাস্তা দিয়েই দুজনে চলে এসেছিলাম। সেদিন ত এ ভয় তোর মনে জাগেনি? আজ কেন ভয়? নাকি মনে-মনে ফেরার ইচ্ছা নেই?

মুখের হাসি গোপন করে মুনিমা বললে—আমার ইচ্ছা-অনিচ্ছা শুনছেই বা কে?

ওর হাত চেপে ধরলো ইরুল—তোর সব ইচ্ছা শুনবো, গাঁয়ে ফিরে যা ইচ্ছে তুই করিস, কিন্তু যা-ই তুই মনে করিস, তোকে গাঁয়ে আমি ফিরিয়ে নিয়ে যাবই।

—ফিরে? ওদের কথাও হয়তো ভালো বুঝব না। নিজেদের ভাষাও তো ভুলে গেছি।

ইরুল বললে—দূর, তা হয় নাকি! এই তো কথা বলছি আমরা দুজনে।

মুনিমা বললে—এই কথাই কি সব নাকি! আরো কতো কথা আছে।

—কী কথা?

—কী জানি! থাকতেও তো পারে? পারে কেন, আছেই। আমরা যা জানি না, যা বলতে পারছি না, এমন কথা কি নেই সংসারে?

ইরুল এ-কথা শুনে চলা থামিয়ে ঘুরে দাঁড়ালো; বললে—তোর মাথা খারাপ হয়েছে।

—হয়েছে তো হয়েছে। এ অন্ধকারে ভয়ে-ভয়ে আর কতক্ষণ মাথা ঠিক রাখব!

—বললাম না, ঠিক আমার পিছন-পিছন আসতে? এমন অন্ধকার নয় যে কাছের মানুষটিকে তুই দেখতে পাচ্ছিস না। ঐ তো কেমন চাঁদ উঠেছে!

—খুব চাঁদ দেখাচ্ছ যা হোক! ওর আলোতেও কাছের মানুষকে কাছে পাচ্ছি না।

এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে ইরুল বললে—পাগলামি করো না। এখনো অনেক পথ বাকী।

হেসে ফেললো মুনিমা, আবার 'তুমি' কেন? বেশ ত 'তুই' হচ্ছিল?

ঈষৎ লজ্জিত হলো ইরুল; বললে—কেমন যেন সেই পনেরো বছর আগেকার কথা মনে হচ্ছিল। সেই পনেরো বছর আগের তুই আর আমি।

বলতে-না-বলতেই বসে পড়লো একটা পাথরের ওপর; পকেট থেকে বার করলো দেশলাই আর একটা চ্যাপ্টা শিশি।

—কী করবি?

—মশাল তৈরী করব। কেরোসিন তেল নিয়ে এসেছি শহর থেকে।

জামাটা খুলে ফেললো ইরুল গা থেকে। তারপরে গাছের একটা ডাল ভেঙে নিয়ে জামাটাকেই তাড়াতাড়ি ছিঁড়ে মশালের মতো করে জড়ালো তাতে।

—একী করলে! জামাটা ছিঁড়ে ফেললে! পরবে কী?

—জামা আর পরব না।

পরনের ধুতিটা তাদের গাঁয়ের টোডাদের মতো খাটো করে পরে ছেঁড়া জামায় তেল ঢেলে দেশলাই দিয়ে মশালটা জ্বালিয়ে ফেললো ইরুল। তারপরে ছুঁড়ে ফেলে দিলো খালি শিশিটা। কোন পাথরে লেগে যেন চুরমার হয়ে গেল কাচ—তারই ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরতে লাগল কিছুক্ষণ পাহাড়ের গায়ে-গায়ে।

অন্ধকারের বুকে দাউদাউ করে জ্বলে উঠলো অগ্নিশিখা। তারই আলোয় অদ্ভুত দেখাচ্ছিল ইরুলের মুখটা। যেন 'কুরুম্বা'দের মতো কোনো অরণ্যচারী মানুষ—যাদু করে নিয়ে চলেছে কোনো এক মানবীকে—এক অরণ্য থেকে আরেক অরণ্যে—এক গুহা থেকে আরেক গুহায়। এখুনি বল্লম হাতে সম্বর-হরিণ মেরে আনতে পারে

সে, এখুনি লেলিহান অগ্নিশিখায় সেই মৃত পশুটাকে পুড়িয়ে তার মুখের সামনে ধরতে পারে মাংসের টুকরো, বলতে পারে—খা, পেট ভরে খা।

এখুনি টান মেরে খুলে ফেলতে পারে তার জামা, তার সযত্ন-লালিত বেণী, হাত বা তার শাড়ির আঁচলেও দিতে পারে টান।

মুহূর্তে ওর ধরা-হাতটা ছাড়িয়ে নিলো মুনিমা, অদ্ভুত আর্তকণ্ঠেই বলে উঠলো—ছেড়ে দে।

ছেড়ে দিয়ে অবাক হয়েই ওর মুখের দিকে তাকিয়েছিল ইরুল, কিছু বলেনি।

থেমে থেমে চলতে চলতে একসময় ভোর হয়ে এলো রাত্রি। পাখীর ডাক। উপত্যকার বিস্তৃত সেই মাঠ। কচি কচি সবুজ ঘাস। দূরে দূরে অদ্ভুত তাদের সেই গোলাকার ঘর।

বাদাগা আর কোটাদের অনেকেই কৌতূহলাক্রান্ত হয়ে পিছু-পিছু এসেছিল ওদের। টিভালিয়ল গোষ্ঠীর গাঁও-বুড়ো ঠিক চিনতে পেরেছিল তাদের ইরুলকে। কিন্তু ও-মেয়েটি কে? অমন বিচিত্র পোশাক-পরা?

সমস্ত গ্রামের লোক ঘিরে ধরেছিল ওদের। কারা এরা?

পরিচয় দিতে আর অচেনা থাকবার কথা নয়। কিন্তু তবুও কতগুলি প্রশ্ন থেকে যায়। পনেরো বছর পরে ওরা যে ফিরে এলো, তাতে সমাজে ওদের গ্রহণ করার ব্যাপারে কিছু আটকায় না। কিন্তু, আসল কথা হচ্ছে মেয়েটিকে নিয়ে। ইরুলের সঙ্গে ওর বিয়ে হয়েছিল কি? না, তা কেমন করে হবে। তবুও এতদিন ও বাইরে ছিল, গিয়েছিল ইরুলের সঙ্গে, এসেছেও ইরুলের সঙ্গে। অতএব ও ইরুলেরই। কিন্তু টারথারল-এর মেয়ে টিভালিয়ল-এর ঘর করবে কী রকম?

ডাকো নিয়াম অর্থাৎ পঞ্চায়েৎ। শুধু ওদের গাঁ নয়, আশেপাশের সমস্ত গাঁয়েই বিচিত্র এক উত্তেজনা। ওদের খবরের কাগজ থাকলে

তার প্রথম পৃষ্ঠাতেই ওরা বড়ো-বড়ো করে ছাপিয়ে দিতো এই আশ্চর্য সংবাদ।

কিন্তু, নিয়াম ডেকে তার পূর্ণাঙ্গ অধিবেশন বসাতেও সময় লাগলো সাতদিন। এই সাতদিন ধরে নানান দিকে নানান তর্ক-বিতর্ক, নানান আলোচনা। ততদিন সাময়িক ব্যবস্থাক্রমে টিভালিয়লদের গাঁও-বুড়োর ঘরেই রইলো মেয়েটি। ইরুলের বাপ বেঁচে নেই, কিন্তু খুড়োরা ছিল—তার স্থান হলো সেখানে। মেয়েটি ছিল কড়া পাহারায়, বন্দিনীর মতো—ইরুলের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের কোনো অবকাশই ছিল না।

নিয়াম-এরও নিয়ম আছে। বাদাগাদের মধ্য থেকে এলো একজন, টিভালিয়ল থেকে এলো গাঁও-বুড়ো, আর বাকী তিনজন টারথারল থেকে। রীতিমতো গুরুগম্ভীর আয়োজন। টারথারলদের গাঁও-বুড়ো প্রায় রাজার মতো। সম্মানে সে সবার থেকে বড়ো।

টারথারলদের একজন 'কুড়' অর্থাৎ প্রধান-স্থানীয় একসময় উঠে দাঁড়ালো—মেয়েটির সে মামাও বটে, শ্বশুরও বটে। তার তিন ছেলের বউ ঐ মেয়েটি।

সমস্ত সভা মুহূর্তে স্থির হয়ে গেল।

শ্বশুর বললে—মেয়েটি যখন তিন বছরের, তখন আমি আমার বোন, অর্থাৎ ঐ মেয়েটির মায়ের কাছে দিয়ে এসেছিলাম লাল রঙের ছোট একটা শাড়ি। ওর মা নিয়েছিল। আর কোটাদের একজন উল্কিওয়ালাকে ডেকে আমি ঐ মেয়ের বাম বাহুর গোড়ায় দিয়েছিলাম উল্কি এঁকে—একটা শিংওয়ালা মোষ। দেখুন তো আছে কিনা ?

প্রধানের আদেশে একজন এসে ওর জামার হাতা সরিয়ে সত্যি সত্যি দেখে গেল। বললে—হ্যাঁ, ওর কথা ঠিক।

—তবে ঐ মেয়েই !—শ্বশুর বলতে লাগলো—সেই ছোটবেলাতেই আমার ছেলেদের সঙ্গে ওর হয়েছিল 'ম্যাট্‌সুনি' অর্থাৎ বিয়ে। সমর্থ হবার পর ঐ মেয়ের এসে ওঠবার কথা আমার ঘরে। ইতিমধ্যে

মারা গেল ওর মা, ও-ও কোথায় চলে গেল। টিয়েকজ্রি অর্থাৎ দেবতার কৃপায় ও যখন ফিরে এসেছে, তখন ওকে আমার কাছে দিয়ে দেওয়া হোক।

কেউ কোনো প্রতিবাদ করেনি, এমন কি ইরুলও না। ইরুলদের গাঁও-বুড়ো বার বার তাকাতে লাগলো ইরুলের মুখের দিকে। অবশেষে বলেও ফেলেছিল—তোমার কোনো বক্তব্য নেই?

নিরুত্তাপ কণ্ঠে উত্তর দিয়েছিল ইরুল—না।

মনে মনে চমকে উঠেছিল মুনিমা—তবে কি সত্যিই ওকে চায় না ইরুল? তবে এমন করে তাদের গাঁয়ে ফিরে এলো কেন দুজনে?

বারংবার প্রশ্ন করেও কেউ সদুত্তর পেলো না। তার সেই এক উত্তর—না।

কোনো বক্তব্যই তার নেই।

নিয়াম-এর নির্দেশ শোনা গেল। ইরুলকে একটি মহিষ দিলেই ইরুল মেয়েটিকে সর্বস্বত্ব ত্যাগ করে আনুষ্ঠানিকভাবে দিয়ে দিতে পারে তার শ্বশুরের হাতে।

ওদের গাঁও-বুড়ো তবু বিয়ের কথা তুলেছিল। কিন্তু টারথারল-এর সঙ্গে যে টিভালিয়লদের বিয়ে হতে পারে না, এ তো শিশুতেও জানে। টিয়েকজ্রির আদেশ-মতো তৈরী এই নিয়ম, এ কি কেউ ভাঙতে পারে?

পঁচিশ বছর বয়সের মেয়েটির তিনটে স্বামী। বড়োটি তিরিশ বছরের। রীতিমতো স্বাস্থ্যবান কর্মনিষ্ঠ পুরুষ। দ্বিতীয়টি তারই বয়সী, দোহারা চেহারা, ওরই মধ্যে একটু শৌখীন, বাঁশী-বাজানোর শখ আছে। আর তৃতীয়টি নেহাতই ছেলেমানুষ—বছর দশেক বয়স। এককথায় নাবালক।

সংসারে শাশুড়ী নেই, কিন্তু শ্বশুর বেঁচে; বৃদ্ধ, জরাগ্রস্ত, কিন্তু এখনো নুয়ে পড়েনি। দীর্ঘ ছ'ফিট দেহ এখনো বনস্পতির মতো

সোজা দাঁড়িয়ে আছে। নিয়াম অর্থাৎ পঞ্চায়েতের বিচারে ইরুলের সঙ্গে তার বিয়ে যখন কিছুতেই হতে পারে না বলে স্থির হলো, তখন ইরুল কোনো প্রতিবাদ করেনি, একটি মহিষের বদলে তাকে দিয়ে দিলে তার শ্বশুরের হাতে। দড়ি-হাতে মোষটাকে টানতে টানতে ইরুল চলে গেল একদিকে, আর শ্বশুরের পাশাপাশি তার তিন ছেলের সঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে গাঁয়ের অন্যদিকে চলে এলো মুনিম্মা, আমরা যাকে এ-কাহিনীতে মুনিমা বলেছি। শ্বশুর বললে—আমাদের কথা সব তুমি ভুলে গিয়েছিলে, না?

মুনিমা অবাক হয়ে তাকালো শ্বশুরের দিকে।

শ্বশুর বললে—তোমার নিজের মাকে মনে আছে? ঐ যে পাহাড়ের নীচে জঙ্গলের মধ্যে কুরুম্বাজাতের মানুষগুলো থাকে, নিশ্চয়ই ওদের কেউ যাদু করেছিল তোমার মাকে, নইলে অমন উঁচু পাহাড় থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ে অমন বেঘোরে কেউ প্রাণ দেয়? বাদাগারা বলে, সে পাগল হয়ে গিয়ে ছল। আমি বলি, তা না হয় হলো, কিন্তু জঙ্গলের ঐ কুরুম্বারা যাদু না করলে কেউ কি হঠাৎ অমনি পাগল হয়ে যায়?

মুনিমা বললে—আমার মাকে আপনি চিনতেন?

—চিনতাম না!—আশ্চর্য হয়ে শ্বশুর বললে—সে যে আমার মায়ের পেটের বোন।

মুনিমা চলছিল ওর পাশাপাশি, হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে গেল, বললে—তাহলে আপনি আমার মামা!

—হ্যাঁ, তা বলতে পারো।—শ্বশুর বললে—এখন তোমার শ্বশুর।

তারপর পিছন-পিছন হেঁটে-আসা তিন ছেলের দিকে একবার তাকিয়ে ওর দিকে ফেরালো চোখ, আবার চলা শুরু করে বললে—এই তিন স্বামী তোমার। আরও দুটি হতো, কিন্তু তারা মারা গেছে সেই ছোটবেলাতেই। বড়ো, মেজো ঠিকই আছে, গেছে ওদের পরের দুটি ভাই—তারপরে এই ছোটটি—তিস্‌সু এর নাম।

শ্বশুর হাত বাড়িয়ে ছোটটিকে সামনে আনতেই, অপাঙ্গে তার দিকে একবার তাকালো মুনিমা। –বছর দশেকের ছোট্ট ছেলে—দুটি সরল ভীরু চোখ। দেখে মনে হলো, ঠিক এরই মতো বয়স হবে, যখন সে ইরুলের হাত ধরে পালিয়ে গিয়েছিল দূরে।

দূরে, ঐ পর্বতের চূড়া পেরিয়ে অন্য এক জগতে।

এলো রাত, এলো দিন। দিন গেল, আবার এলো রাত। এমনি করে করে কেটে গেল আরও সাতটা দিন। গাঁয়ের উত্তেজনা ততদিনে স্তিমিত হয়ে এসেছে, ওকে দেখার কৌতূহলও ধীরে ধীরে গেছে কমে। এ সাতদিনে ইরুলের মুখ ও একবারও দেখতে পায়নি। সে কি তাকে গাঁয়ে পৌঁছে দিয়ে নিজে আবার পালিয়ে গেল পাহাড়ের চূড়ো পেরিয়ে ?

তিসৃসু এসে সংবাদ দিলো—ঐ পাহাড়ের কোল ঘেঁষে একটা বড়ো গাছের ছায়ায় বসে বাঁশী বাজাচ্ছে ইরুল, তার মহিষটাকে যথেচ্ছ চরতে দিয়ে।

মনে মনে নিশ্চিন্ত বোধ করলেও বাইরে তার দেখা গেল প্রচণ্ড রাগ। ইরুলের উল্লেখে হঠাৎই সে ক্ষেপে গেল তিসৃসুর ওপরে—তোমাকে খবরদারি করতে কে বলেছে! কে চায় তোমার কাছে ইরুলের খবর ?

অবাক হয়ে তিসৃসু তাকিয়ে থাকে বউ-এর মুখের দিকে। সবাই বলে, মেয়েটি তার বউ। 'বউ' বলতে ঠিক কী বোঝায় কে জানে, কিন্তু ভা-রী ভালো লাগে মেয়েটিকে। সব সময় ইচ্ছা করে এমন কিছু করতে, যাতে খুশী থাকবে মেয়েটি।

সন্ধ্যা হলেই তার ঘুম পায়, খাওয়ার পালা কোনক্রমে সেরেই সে গিয়ে শুয়ে পড়ে তার বাপের পাশে। তারপর সারারাত বউ কী করে কে জানে। কিন্তু দিনমানে সে তার সঙ্গ ছাড়তে চায় না।

'দিশা' তার মেজো ভাইয়ের নাম। বউকে নিয়ে দূরে পাহাড়ের

দিকে চলে যায় সে জল তুলে আনতে ঝরনা থেকে, তার বড়ো ইচ্ছা করে, তখন সে বউ-এর সঙ্গ নেয়—কিন্তু 'দিশা' তাকে তেড়ে মারতে আসে, ভয়ে ভয়ে যাওয়া আর হয় না।

বড়ো ভাই ভয়ানক গম্ভীর প্রকৃতির লোক, তার মুখের দিকে তাকাতে পর্যন্ত বুক কাঁপে। তাকে বউ-এর কাছে দেখলে দূর থেকেই ছুটে পালায় তিস্‌সু। তবে সে ভয়ানক ব্যস্ত লোক। গোটা-দশেক মহিষ তাদের—একটা ইরুলকে দেবার পর আছে মাত্র নয়। সকাল-বেলা মহিষের ঘর থেকে তাদের মহিষগুলো বার করে দুধ-দোওয়ার কাজ করে বুড়ো বাপের সঙ্গে সে একাই। তারপর মাঠে চরাতে নিয়ে যাবার পালা। সে কাজটা সাধারণত করে থাকে দিশা—সঙ্গে কখনো-সখনো তিস্‌সু-ও থাকে। বিকেলে মাঠ থেকে মহিষরা ফিরে এলে আবার দুধ-দোওয়ানোর পালা। দুবেলায় এই যে দুধ পাওয়া যায়, খাবাব জন্য আলাদা করে রেখে, বাকীটা থেকে তৈরী করা হয় মাখন, ঘি ইত্যাদি। এ-কাজ করে থাকে বড়ো ভাই একা। বুড়ো বাপ সাহায্য করে মাত্র। তারপরে সেই মাখন আর ঘি নিয়ে বাদাগাদের গ্রামে গিয়ে বদল দিয়ে চাল বা দরকারমতো কাপড়-চোপড় নিয়ে আসা—সে-ও বেশীরভাগ করে থাকে ঐ বড়ো ভাই—বউ যাকে নাম দিয়েছে 'বড়ো স্বামী'।

মহিষের পরিচর্যা, দুধ-দোওয়া বা মাখন-ঘি তৈরী—এসব হলো পুরুষের কাজ, মেয়েদের ওতে থাকতেও নেই।

চোঙ-এর মতো টানা লম্বা ওদের ঘর। সেই ঘরখানা আবার দু ভাগে ভাগ করা। এক ভাগ মেয়েদের রান্নাবান্না আর গৃহস্থালির জন্য, অন্য ভাগ দুধ থেকে মাখন-ঘি তৈরীর জন্য—সে-ঘরে মেয়েদের প্রবেশ নিষেধ। দুটি ঘরেই কোনো জানালা নেই, ছোট্ট একটি দরজা মাত্র।

ঘর থেকে কলসীটা বার করে নিয়ে এসে অত সকালবেলাতে অসময়েই ঝরনা থেকে জল আনতে চললো মুনিমা। সঙ্গে দিশা নেই।

দিশা মাঠে। সে গেল একা। তিসৃসু এগিয়ে এলো; বললে—আমি যাব।

তীব্রস্বরে বলে উঠলো মুনিমা—না।

আকস্মিক এ ধমক খেয়ে মুখখানা এতটুকু হয়ে গেল তিসৃসুর, একটা গাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলো সে। আর, দেখতে লাগলো বউকে—সাপের মতো আঁকাবাঁকা পথ দিয়ে সে চলেছে পাহাড়ের দিকে, ঝরনার জল আনতে।

গ্রাম পেরিয়ে একটা টিলায় উঠে আবার নামতে হয়। নেমেই দেখা হয়ে যায় তার বড়ো স্বামীর সঙ্গে। কতগুলি দড়িদড়া আর খড়ের আঁটি সে বয়ে নিয়ে আসছিল বাদাগাদের কাছ থেকে।

—কোথায় চললি বউ?

বুকটা যেন হঠাৎই ঢিপঢিপ করে উঠলো ওকে দেখে। শহরের সেই সাহেবটাকে মনে পড়লো, যে ওকে অপর পুরুষের সঙ্গে কথা বলতে দেখলেই ঘরের ভিতরে টেনে নিয়ে এসে বেত দিয়ে মারতো।

—একা যাচ্ছিস জল আনতে? দিশা কোথায়?

—মাঠে।

—একা যাওয়া তো ঠিক নয়—বড়ো স্বামী বললে—আমাদের মেয়েদের উপরে কুরুম্বাদের ভয়ানক চোখ। তিসৃসু কোথায়?

—গাঁয়ে।

বড়ো স্বামী বললে—অবশ্য ভয় নেই। একটু এগিয়ে দেখবি, গাছতলায় বসে ইরুল বাঁশী বাজাচ্ছে। তাকে সঙ্গে নিবি।

ইরুল!—মনে মনে ভয়ানক চমকে উঠলো মুনিমা। তিসৃসুর কাছে ওর খবর শুনেই তো যাচ্ছে সে—কিন্তু, একা সে যে ওর কাছে যাচ্ছে—এতে কোনো ঈর্ষা বোধ করছে না তার স্বামী?

খড়ের আঁটিটা মাথার ওপরে উঠিয়ে নিশ্চিন্ত মনে চলে গেল বড়ো স্বামী—তাড়াহুড়ো করিসনি বউ, আমি তো চলে যাচ্ছি, তোর কাজ করে রাখবখন।

শ্যামল আর হরিৎ ফার্ন-জাতীয় গাছ-গাছালি ভেদ করে রুপোলী ধারা নেমে এসেছে ঝরনার মতো নানান উপলখণ্ডে প্রতিহত হয়ে। তারই তীর ঘেঁষে বসে পড়লো মুনিমা, গুমরে-ওঠা কান্নার মতো স্বরে বললে—অসহ্য! এ কোথায় তুমি নিয়ে এলে! পরপুরুষের সঙ্গে কথা বলতে এসেছি, তাতে ওরা বেত দিয়ে মারা তো দূরের কথা, একটু হিংসাও করলো না।

ইরুল ওর পাশ ঘেঁষে বসতে বসতে বললে—কেমন সংসার করছ বলো? মন বসেছে?

—না না, আমার একেবারেই ভালো লাগে না।—মুনিমা কান্না-ভরা কণ্ঠে বললে—তিস্‌সু তো একেবারেই ছোট, তাকে স্বামী বলে ভাবতেও পারা যায় না। আর যে দুজন—তাদের মধ্যে থাকতে হয় দুদিন এর কাছে, দুদিন ওর কাছে। অসহ্য!

—কেন!—ইরুল বললে—লোক কি ওরা খারাপ?

বিচিত্র মেয়েমানুষের মন। এ-কথায় হঠাৎই হেসে ফেললো মুনিমা; বললে—দিশা একেবারে তোমারই মতো। ডানপিটে, বাউণ্ডুলে। তোমারই মতো বাঁশী বাজায়।

—বুঝেছি।

—কী?

ইরুল বললে—দিশার দিকেই মনটা ঝুঁকেছে বেশী।

—ধ্যেৎ!—মুনিমার মুখখানা লজ্জায় হলো আরক্ত; বললে—দিশাকে বলেছিলাম।

—কী?

—বলেছিলাম এই, দুজনে পালিয়ে যাই চলো। ঐ পাহাড়ের চূড়ো পেরিয়ে।

রুদ্ধ নিশ্বাসে শুনছিল ইরুল; বললে—কী উত্তর দিলে সে?

—কী আর? ভয় পেয়ে গেল।

ইরুল গম্ভীর কণ্ঠে বললে—এসব চিন্তা আর করো না। এখানেই তুমি সুখে থাকবে। অন্য পাঁচটি মেয়ে থাকছে না?

মুনিমা লীলায়িত ভঙ্গীতে ওর দিকে মুখ ঘুরিয়ে বললে—অন্য পাঁচটির সঙ্গে আমার তুলনা করবে বুঝি?

কিন্তু অন্য প্রসঙ্গে চলে গেল ইরুল। বয়সের হিসাবে সে যেন যথেষ্ট প্রবীণ, যথেষ্ট গম্ভীর। বললে—বাইরে সুখ নেই, বাইরে যা আছে তা বিষ। এখানকার সহজ সরল জীবনে তোমার মন মুক্তি পাবে।

এমন ভারী গলায় বিজ্ঞের মতো কথা বলছে ইরুল, ঠিক যেন তার বড়ো স্বামী। হঠাৎ খিলখিল করে হেসে উঠলো মুনিমা; বললে—তোমার হাতের বাঁশীটা বাজাও না? দেখি, দিশার মতো সুর ওঠে কিনা?

একটু হেসে ইরুল বললে—পারি না তোমার দিশার মতো বাজাতে?

—ছাই পারো।

দিশার মতো মাথা ঝাঁকিয়ে ছুটি দুষ্টুমি-ভরা চোখে ইরুল বলে উঠলো—শোনো এবার।

সত্যিই দিশার সুর। শুনতে শুনতে হঠাৎই অদ্ভুত আনন্দে ভরে গেল মুনিমার মন। একবার তার মনে হলো, পরনের ব্লাউজ আর অন্তর্বাস খুলে ফেলে অন্য টোডা-মেয়ের মতোই খাটো করে শাড়ি পরে ওর সুরে সুরে প্রমত্ত হয়ে নাচতে আরম্ভ করবে সে।

কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই মনে হলো—সব—সব মিথ্যে। বড়ো স্বামীর গম্ভীর স্বরের উপদেশ, দিশার বাঁশী—সব। সত্যি শুধু সেই পনেরো বছর আগেকার বয়স, সত্যি শুধু সেদিনকার সেই দশ বছরের ইরুল, সত্যি শুধু সেদিনকার স্বপ্ন, সত্যি শুধু সেদিনকার শত নিষেধের অরণ্য আর পর্বত পেরিয়ে দূর-দূরান্তে দুজনের হাত-ধরাধরি করে ছুটে পালিয়ে যাওয়া!

বড়ো বড়ো অবিন্যস্ত মাথার চুল, বড়ো বড়ো দুটি চোখের অদ্ভুত বিস্ময়—তিসৃসুর দিকে তাকাতে তাকাতে বার বার সেই পনেরো বছর আগেকার দশ বছরের ইরুলের কথাই মনে পড়ে যায়।

—একি, তোমার চোখে জল!

চমকে তাড়াতাড়ি মুখ ফেরায় মুনিমা।

—কী হয়েছে!

চোখ মুছে তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ায় মুনিমা, ঝরনার জল হাঁড়িতে ভরে নিয়ে গাঁয়ের পথে পা বাড়াতে বাড়াতে মুখ ফিরিয়ে মুনিমা বলে, তিসৃসুকে আসবার সময় মিছিমিছি বকে এসেছি। ও হয়ত কাঁদছে।

দিন যায়, রাত যায়—এমন করে করে তারপর কেটে গেল একটি মাস। এই একটি মাসে কটি বারই বা দেখা হয়েছে মুনিমার সঙ্গে?

যতবারই দেখা হয়েছে, ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সেই একই কথা—নিয়ে চলো আমাকে এখান থেকে।

তীব্রস্বরেই উত্তর দেয় ইরুল—উটকামণ্ডের সেই সাহেবটার কাছে?

মুহূর্তে আতঙ্কিত হয়ে ওঠে মুনিমা; আর্তস্বরে বলে—না না।

—তবে?

—আরও দূরে, অন্য কোনোখানে।

—না।—ইরুল দৃঢ়কণ্ঠে বললে—বাইরের জন্য তুমি নও। বাইরের হাওয়ার জন্য তুমি নও। কোনো মেয়েই বুঝি নয়।

—ইস! কটি মেয়ের মনের খবর জানো তুমি?

গম্ভীর হয়ে যায় ইরুল, ঠিক তার বড়ো স্বামীর মতোই বলতে থাকে—না না, ঠাট্টার কথা এ নয়। মন দিয়ে ঘর করো, স্বামীরা তোমার খারাপ নয়।

—আর তুমি?

—আমি?—একটু হাসল ইরুল—বেশ ত আছি। তোমাকে স্থিতি করতে পারলেই আমার সুখ।

—কেন ? অতো সুখ খোঁজো কেন ?

একটুক্ষণ থেমে থেকে তারপর ইরুল বললে—সেই দশ বছর বয়সে তোমাকে গাঁয়ের বাইরে—দেশের বাইরে নিয়ে গিয়েছিলাম। আমার সেটা অপরাধ।

—বেশ তো, প্রায়শ্চিত্ত করো না ? একটা মহিষ নিয়ামকে দিলেই চলবে আশা করি।

ইরুল বললে—সে তো বাইরের। মনের ভিতরে যে অপরাধ-বোধটা কুরে-কুরে খাচ্ছে, তার প্রায়শ্চিত্ত হবে কেমন করে ?

অবাক হয়ে ওর দিকে তাকায় মুনিমা ; বললে—তুমি কি লেখাপড়া শিখেছিলে ?

—তা একটু-একটু। কেন ?

মুনিমা বললে—তাই অতো বড়ো-বড়ো কথা বলতে পারো !

—না। তার জন্য নয়। আমি বসে বসে এই সবই ভাবি।

—কী সব !

ধ্বক্ করে জ্বলে উঠলো ইরুলের দুটি চোখ ; বললে—আমার পিঠের দিকে ভালো করে তুমি তাকিয়ে দেখোনি। এই দেখো, এখনো দাগ খুঁজে পাবে।

আরো কাছে সরে এসে ঝাঁপিয়ে পড়লো ওর পিঠের ওপর মুনিমা ; আর্তস্বরে বলে উঠলো—কী সর্বনাশ ! কী করে হলো ! এতদিনে একটিবারও জানতে দাওনি !

নিজেকে ধীরে ধীরে ছাড়িয়ে নিয়ে সরে বসলো ইরুল ; বললে—সভ্যজগতের মানুষ লোহা পুড়িয়ে ছ্যাঁকা দিয়েছে।

—কেন !

—মিথ্যে চোর বদনাম দিয়ে মুখ দিয়ে চুরির কথা কবুল করিয়ে নিতে চেয়েছিল। আমি বলিনি। আর এক মেমসাহেবের কথা শুনবে ? আমি তার চাকর ছিলাম, সাহেবের অনুপস্থিতিতে আমাকে সে কানে-শোনা-যায়-না এমন এক প্রস্তাব করেছিল। আমি রাজী

হইনি। কিন্তু সাহেবকে সে যা-তা বলে দিয়ে আমাকে এমন মার খাইয়েছিল যে, আমাকে হাসপাতালে থাকতে হয়েছিল কয়েকদিন।

হু-হু-করা কান্নায় ভেঙে পড়লো মুনিমা; বললে—আর বলিস না। আমারও যে কী দিন গেছে! চা বাগানের কতো লোক! আমাকে নিয়ে তারা ছিনিমিনি খেলেছিল—পশুর মতো।

—তবে?— ইরুল বললে—তুলনা করে দেখ্, এইখানেই তোর মুক্তি। কিছুদিন কাটুক, মনে যেটুকু দ্বিধা আছে, তা-ও কেটে যাবে।

চুপ করে থাকে মুনিমা। মনে-মনে চিন্তা করে দেখে, ইরুলের যুক্তিই ঠিক। কোথায় ও যাবে এই গাঁ ছেড়ে? কোথায় গিয়ে বাঁচবে?

কিন্তু তবু কেন যেন এখানে মন বসতে চায় না—কিসের এক ভালো-না-লাগার অপ্রসন্ন সুর মনের মধ্যে গুঞ্জন করে ফিরতে থাকে।

ওরা বসেছিল চুপচাপ, এমন সময় দূর থেকে হঠাৎই ভেসে এলো একটি পরিচিত বাঁশীর সুর। চমকে উঠলো মুনিমা। দিশার বাঁশী। দিশা যদি জানতে পারে, এই ঝরনার ধারে লুকিয়ে সে এসেছে ইরুলের সঙ্গে দেখা করতে? তা হলে?

চট্ করে উঠে দাঁড়িয়েছিল মুনিমা। ওর হাত ধরে ওকে আবার টেনে বসালো ইরুল। বললে—ভয় করিস না, আমার সঙ্গে মিশলে কেউ কিছু মনে করবে না।

একটু আশ্চর্য হয়েই মুনিমা বলে—এটা কী করে হয় বলো ত? ওরা জেনেশুনেও কিছু বলে না। একটু হিংসাও জাগে না ওদের মধ্যে। আগে আগে দিশা আসত আমার সঙ্গে ঝরনার ধারে জল আনার সময়। এখন আর আসতে চায় না। বলে—যা না একা। ওখানে ইরুল আছে, কোনো ভয় নেই।

ইরুল হাসলো; বললো—জানিস না বুঝি? এই-ই নিয়ম। পরপুরুষের সঙ্গে মিশতে না দেওয়াটা সমাজে ভয়ানক নিন্দনীয় ব্যাপার। এতে ওদের একেবারেই আপত্তি নেই।

—সেকি !

—হ্যাঁ। আমাদের এই টোডাদের মধ্যে মেয়ের সংখ্যা খুব কম, তাই মেয়েদের ব্যাপারে কোনো কড়াকড়িই এদের নেই।

হঠাৎই ফিক্ করে হেসে ফেললো মুনিমা—তোর সঙ্গে যদি ভাব করে সারাদিন এখানে কাটিয়ে দিই, তাতেও না ?

—না। সত্যিই না। শুধু ওরা যাতে অযথা না ভাবে, আসবার সময় কাউকে জানিয়ে আসবি যে আমার কাছে আসছিস।

—আসতে ওরা দেবে ?

—কেন দেবে না। অভাবে পড়লে অনেক সময় ওরা বউ বাঁধা দেয়, তা জানিস ?

মুখ টিপে হাসলো মুনিমা ; বললে—তা আমার স্বামীদের অভাবটা কিসের যে তোর কাছে বউ বাঁধা দিতে যাবে !

ঠোঁটের কোণে হাসি টেনে এনে ইরুল বলে—বাঁধতে আমি চাইছিই বা কই ? তবে, দিনান্তে তোকে একবার দেখলে ভালো লাগে, কথা বললে ভালো লাগে।

—তাই নাকি !—ঠোঁট উলটে মুনিমা বললে—নতুন খবর। তা কথা কইবার অতোই যদি শখ, ত আমাদের বাড়ি এলেই পারো।

—লাভ কী ? তাছাড়া টিভালিয়লরা অতো ঘন ঘন টারথারলদের বাড়ি যায় না, যেতে নেই।

মুনিমা বলে উঠলো—তাই বুঝি আমাকে তোমার পেতে হবে এই নির্জন পাহাড়ের কোলে, ঝরনার ধারে ?

হাসলো ইরুল ; বললে—টোডা ছেলেদের তা-ই রীতি। তারা পাহাড়ের গুহায় বা বনের অন্তরালে, কিংবা এইরকম কোনো ঝরনার ধারেই আদর আর ভালোবাসা জানাতে চায় তাদের প্রিয়াকে।

—বুঝেছি।— তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ায় মুনিমা—আমার ওভাবে বিয়ে দেওয়াটা তোমার ছল, আসলে আমাকে তুমি পেতে চাও এই ভাবে। কেন, অতোই ইচ্ছা যদি, নিজে রাখতে পারোনি কাছে ?

এখানে না হয় অন্য কোথাও? কে আসতে চেয়েছিল এখানে? কিংবা এখানে এসে কে পেতে চেয়েছিল এই অদ্ভুত জীবন!

—এখানকার জীবনটা অদ্ভুত?

—নয়? ছোটোটা কাছ ছাড়তে চায় না একদণ্ড, মেজোটা সর্বক্ষণ এটা-ওটা বলে জ্বালাতন করে। বড়োটা পশুর মতো ওত পেতে থাকে রাতের আধারের জন্য। এই কী জীবন? ছিঃ!

উঠে দাঁড়ায় ইরুল। একটুক্ষণ থেমে থেকে তারপরে বলে—কী তুই চাস বল্ ত?

—এখান থেকে আবার ছিটকে বেরিয়ে পড়তে চাই। ভালো লাগে না—কিছুই ভালো লাগে না। সেই ছোটোবেলায় দুজনে বসে যে স্বপ্ন দেখতাম, সে কি এই?

চুপ করে থাকে ইরুল। মুনিমা আবার বলে—পারো না? পারো না জোর করে আমাকে কাছে টেনে রাখতে?

—রাখছিই ত।—ইরুল বললে—আমি কি দূরে আছি! এই ত দেখা হলো। এই ভাবেই চলুক না সারাটা জীবন।

—এই ভাবে? এই চুরি করে দেখা হওয়া?

—চুরি কেন?—ইরুল বললে—এই যে তুমি এসেছো আমার কাছে, এর একটা অর্থ ই ওরা করবে। আমি তোমাকে ভালোবাসছি। ভালোবাসায় তো ওদের আপত্তি নেই।

রাগে-দুঃখে-ক্ষোভে-অন্তর্দ্বন্দ্বে যেন মুহূর্তে পাগল হয়ে গেল মেয়েটা; তীব্র, তীক্ষ্ণ স্বরে বলে উঠলো—কিন্তু আমার আপত্তি আছে। এভাবে দেখাসাক্ষাৎ আর নয়। হয় আমাকে তোমার পেতে হবে একেবারে, নয় ত আমাকে তোমায় ছাড়তে হবে চিরকালের জন্য।

উত্তরের অপেক্ষা না রেখে দুমদাম পা ফেলে দ্রুত পায়ে ঘরে ফিরে আসে মুনিমা।

আরো কেটে যায় কিছুদিন। গায়ের জামাটা খুলে ফেলেছে মুনিমা। বড়ো স্বামী নীল রঙের খাটো একটা শাড়ি এনে দিয়েছে, সেটা টোডাদের মতো করে পরে দিশার সঙ্গে যায় ঝরনা থেকে জল তুলে আনতে।

পথেই পড়ে সেই গাছটা, যার নীচে বসে ইরুল বাঁশী বাজায়—তার মোষটা চরতে থাকে কাছেই।

কিন্তু পথ ছেড়ে মাঠ ভেঙে একটু ঘুরেই যায় মুনিমা, সঙ্গে দিশা। ঝরনার কাছে এসে বসে সেই পাথরটারই ওপর। দিশাকে বলে—বাজা তোর বাঁশী। লম্বা বাঁশের একটা বাঁশী। দুটো কি তিনটে মাত্র স্বর বাজে একঘেয়ে সুরে। কিন্তু সেই স্বরই কানে যেন মধু বর্ষণ করে। মনে হয়—দিশা নয়, ইরুলই যেন বসে আছে তার পাশে—বাজাচ্ছে ওদের সেই চিরপরিচিত মেঠো সুর।

শুনতে শুনতে চোখে জল এসে পড়ে একসময়। হাঁড়িটা জলে ভরতি করতে করতে ভাবে—না হয় রাগই করলো মুনিমা, প্রচণ্ড রাগ। কিন্তু ও কি নিশ্চিন্তে এমন করে গাছতলাতেই বসে থাকবে? কী ও চায়? ওকে পেতে, না, ছাড়তে? পেতে চায় ত নিক ওকে টেনে, না হয় এভাবেই নিক কোনো চতুর প্রেমিকের মতো তার স্বামীদের আড়াল করে! আর না হয় ত ছেড়ে দিক ওকে—আর কখনো কোনো অবস্থাতেই যেন সে দেখা না করে, কথা না বলে। দিনান্তে একবার দেখতে চায়, একটু কথা বলতে চায়? না, এক মুহূর্তের জন্যও দেখা দেবে না মুনিমা, একটি কথা ভুলেও বলবে না। জল-ভরতি হাঁড়িটা মাথায় তুলে নিয়ে মুনিমা বললে—আয় দিশা।

আরো কিছুদিন কেটে গেল। মনটা যেন অনেকটা শান্ত হয়ে এসেছে মুনিমার। এর মধ্যে একটিবারও দেখা হয়নি ইরুলের সঙ্গে। কেমন আছে কে জানে! ভালোই আছে নিশ্চয়। ওদের গাঁও-বুড়ো কি ওকে এতদিনে একটা বউ যোগাড় করে দেয়নি!

তিসৃসু পিছন থেকে এসে ওর গলা জড়িয়ে ধরে বলে—বউ ?

—কী ?

—গল্প বল্। ঐ পাহাড়টা পেরিয়ে—

—ঐ পাহাড়টা পেরিয়ে আছে এক দেশ। অদ্ভুত সব বাড়ি, অদ্ভুত সব আলো !

ছুটি বিস্ফারিত চোখ মেলে শুনতে থাকে দশ বছরের শিশু।

—আচ্ছা, বউ ?

—কী ?

তসৃসু বলে—যাওয়া যায় না পাহাড় পেরিয়ে ?

—কেন যাবে না ? খুব যায়। যেতে ইচ্ছা করে বুঝি ?

—হ্যাঁ, খুব করে। যাবি ?

—আমি ?

—হ্যাঁ। তুই সঙ্গে না থাকলে যাবো না।

—অবাক হয়ে ওর দিকে তাকিয়ে থাকে মুনিমা। ঠিক যেন সেই পনেরো বছর আগেকার সেই ইরুল ! তেমনি অদ্ভুত চোখের দৃষ্টি ! তেম্নি দূর-দিগন্তের নেশা মেশানো ছুটি বন্য চোখ !

সব-কিছু মুহূর্তে বিস্মরণ হয়ে যায়। ছুটি হাতে তিসৃসুকে জড়িয়ে ধরে কাছে টেনে নেয় নিবিড় করে, অস্ফুট স্বরে বলতে থাকে—ইরুল—ইরুল !

চমকে ওঠে তিসৃসু ; বলে—কাকে ডাকছিস ? ইরুল তো সেই মাঠের ধারে, গাছতলায়-!

কিন্তু সাড়া আসে না মুনিমার কাছ থেকে, নিষ্প্রাণ পাষাণ-প্রতিমার মতোই বসে থাকে সে চুপচাপ।

তিসৃসু ওর গলা জড়িয়ে ধরে বলে—বউ ?

—কী

—ইরুলকে ডেকে আনব ?

মুহূর্তে চমকে ওঠে মুনিমা। মনের কথা কেমন করে বুঝতে পারে এই শিশু! বললে—চল্ তিস্সু।

—কোথায়?

—ঐ গাছতলায়।

—ইরুলের কাছে?

—হ্যাঁ।

সত্যিই তিস্সুর হাত ধরে এগিয়ে চলে মুনিমা। সারা আকাশটা ঘন নীল। দুটি একটি সাদা মেঘের টুকরো এদিক-ওদিকে ভেসে আছে। শুধু অরণ্য পেরিয়ে যতদূর দৃষ্টি যায়, দিগন্তের সারি সারি মেঘ চলেছে নিরুদ্দেশের দিকে—যেন কার শৈশব-স্বপ্ন! মুছে গিয়েও যা মোছেনি, ভেঙে গিয়েও যা ভাঙেনি।

ওদের দেখে তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ালো ইরুল। বললে—দূর থেকে চিনতেই পারিনি যে তুমি। এতদিন দূর থেকে তাহলে যাকে দেখেছি, সে তুমি? খাটো নীল শাড়ি পরে খালি গায়ে ঝরনায় যে একটি ছেলের সঙ্গে রোজ জল আনতে যায়, সে তবে তুমি?

তীক্ষ্ণ স্বরে উত্তর দেয় মুনিমা—তুমি জানতে না?

—কী করে জানব!

অকারণ ক্রোধে যেন অন্ধ হয়ে যায় মুনিমা; বলে ওঠে—তুমি কি চাও, আমি শহুরে মেয়ে হয়ে ঘুরে বেড়াবো?

—না না, সে আমি চাইব কেন?

—হ্যাঁ, তুমি তা-ই চাও।—উন্মত্তের মতো বলতে থাকে মুনিমা—তুমি যা চাও, মুখে তা বলতে পারো না, কাজে তা করতে পারো না বলেই মনে মনে জ্বলে মরছ, আমাকেও জ্বালিয়ে মারছ।

বলতে বলতে, কী আশ্চর্য, একেবারে কেঁদেই ফেলে মুনিমা, তারপরে তিস্সুর হাতটা শক্ত করে ধরে—চল্ তিস্সু।

তাহলে সত্যিই কি কোনো ভুল করল ইরুল? ও কি এভাবে

সুখী হবে না? গাঁও পেরিয়ে, বাদাগাদের উধাও মাঠও পেরিয়ে, পাহাড়ের পথে উঠে কিছুদূর চলবার পর এক অতি সংকীর্ণ বাঁকের মুখে দাঁড়িয়ে সোজা-নেমে-যাওয়া নীচেকার ভয়াবহ খাদের দিকে তাকিয়ে নানান প্রশ্ন জাগে ইরুলের মনে। এখান থেকে পা ফস্‌কে গেলেই পাথরে ধাক্কা লেগে-লেগে হাড়-গোড় ভেঙে কোথায় যে মুহূর্তে তলিয়ে যাবে এই দেহটা, তার কেউ খোঁজ পাবে না। কিন্তু শেষ করে দেওয়াতেই কি সব-কিছুর শেষ?

এই সংকীর্ণ বন্ধুর পথ ধরেই সে আর মুনিমা আজ থেকে পনেরো বছর আগে পালিয়ে গিয়েছিল দূর সভ্যজগতে, আবার পনেরো বছর পরে এই পাথর-ছড়ানো পথ বেয়েই ফিরে এসেছে তারা দুজনে। বিকেলের দিকে মাঝে মাঝে সে আসে এদিকে অন্যমনস্ক উদাসী মন নিয়ে। বিপজ্জনক এই বাঁকটার মুখে লাল চ্যাপ্টা পাথরটার ওপরে চুপচাপ সে বসে থাকে। পাখী ডাকে মাথার ওপরে, পাহাড়ের কোনো এক নাম-না-জানা গাছের ডালে বসে ডালপালার অন্তরাল থেকে কোথায় যেন কোন্ ঝোপের আড়ালে কাঠবিড়ালী নেমে এসে খেলা করে। সর্‌সর্ সন্‌সন্ হাওয়া এসে লাগে কোথাকার কোন্ বেনুবনে—হুড়িতে হুড়িতে নাড়া দিয়ে কোথায় বুঝি কোন্ ঝরনার রজতধারা সঙ্গোপনে সঙ্গীতে ঝংকার তোলে।

গাঁও-বুড়ো স্নেহ করে ইরুলকে। বলে—তোর একটা বউ এনে দি।

হেসে বলে ইরুল—কোত্থেকে?

—তা আমি পারি। আমি তোর সম্পর্কে দাদা হই। কারুর বউকে যোগাড় করে দেবো।

—কার বউ?

বুড়ো হেসে বলে—আমাদের টিভালিয়ল-গোষ্ঠীর। টারথারলদের থেকে পারব না বাপু। সে আবদার তুমি করো না। অনেক গরীব আছে, একটা মোষ দিলে বদলে বউ দিয়ে দেবেখন।

ইরুল গম্ভীর হয়ে বলেছিল—এসব কথা তুমি কখনো তুলো না।

এসব আমার ভালো লাগে না। যার বউ নিয়ে আসব, তার মনের অবস্থাটা ভেবে দেখো ?

বুড়ো অবাক হয়—মনের আবার কী অবস্থা হবে ! কিছুই হবে না।

আর কিছু কথা বলেনি ইরুল, বুড়োর কাছ থেকে উঠে গিয়েছিল। সত্যিই সে ভালোভাবে লক্ষ্য করে দেখেছে, ওদের কাছে এসব কোনো সমস্যাই নয়। বহুদিনের অভ্যাসে ব্যাপারটা এমন সহজ ওরা করে ফেলেছে যে, সভ্য মানুষের পক্ষে এসব জিনিস কল্পনারও বাইরে।

এদের 'সভ্য' করে তুললে কেমন হয় ? লেখাপড়া শিখিয়ে, কাপড়চোপড় পরিয়ে, মেয়েদের এক-পতিত্বের ব্যবস্থা করে ?

কিন্তু করবে কে ? স্বয়ং টিয়েকজ্রি দেবীর এ ব্যবস্থা। এর বাইরে যাবে এমন কে সংস্কারবিহীন ব্যক্তি আছে এই টোডা-গাঁয়ে ?

যদিই-বা বিপ্লব আনা যায়, যদি উটকামণ্ড থেকে পাদ্রী সাহেবদের নিয়ে আসা যায় পথ দেখিয়ে—এদের সমাজে আমূল পরিবর্তন এনে লাভ কী হবে শেষ পর্যন্ত ? আজ ওদের পয়সার দরকার হয় না, দৈনন্দিন প্রয়োজনীয়তাও কম—কিন্তু সেদিন সব কিছুই বাড়বে। স্বল্প বস্ত্রেও চলবে না, স্বল্প বিহারেও চলবে না। টোডাদের মধ্যে মানুষ খুন করা নিষিদ্ধ, চুরি করা কাকে বলে এরা আজও জানে না, একের মুখের কথাতেই বেদবাক্যের মতো বিশ্বাস করে অপরে। 'সভ্যতা' এলে এসব কি থাকবে ? না না—সে বিভীষিকায় দরকার নেই—নিজের পিঠের ছ্যাঁকা-পড়া দাগের ওপরে হাত বুলোতে চেষ্টা করে ইরুল—বেশ আছে, বেশ আছে ওরা।

মুনিমাকে এ গাঁয়ে না ফিরিয়ে আনা পর্যন্ত তার মন স্থির হচ্ছিল না। তাকে নিয়ে সে উটকামণ্ড থেকে পালিয়ে যেতে পারতো অন্য দিকে, অন্য শহরে—মুনিমার 'কালো সাহেব' টেরও পেতো না। কিন্তু তারা ? দারিদ্র্যের প্রহারে প্রহারে জর্জরিত হয়ে কোন্ রসাতলে যে তলিয়ে যেতো কে জানে !

সব থেকে বড়ো কথা, 'সভ্যজগৎ' সম্পর্কে এমন এক বিতৃষ্ণা

জেগেছে ইরুলের মনে যে, সেখানে ফিরে যেতে, কিংবা মুনিমাকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে কিছুতেই মন চায় না। এখানে, এই টোডা গাঁয়ে, পেয়েছে সে শান্তি—পরম শান্তি। বাইরের ছাঁচে-ঢালা মানুষদের সঙ্গে এদের ধরন-ধারণ কিছুই মেলে না বলেই যেন এখানকার বাতাসে বুক ভরে নিশ্বাস নিতে পারা যাচ্ছে।

কেটে গেল আরো কিছুদিন। বড়ো স্বামী একদিন মুনিমাকে আদর করতে করতে বলে—ইরুলের সঙ্গে দেখা করো না কেন? মেশো না কেন ওর সঙ্গে?

মুনিমা বিরক্ত হয়েই উত্তর দেয়—ভালো লাগে না মিশতে।

—কেন?

এ 'কেন'র উত্তর মুনিমাই কি জানে? ভালো লাগে না আর ইরুলকে। যেন ঝরনার স্রোত কলসীর মধ্যে ধরা পড়ে আছে। সেই ইরুল, যার মুখ মনে পড়তেই মনে হতো—দুরন্ত বেগে সে ছুটে চলছে। আর তার হাত ধরে বার বার ডাকছে—আয়, চলে আয়।

গত পনেরো বছর ধরে এই একান্ত এক স্বপ্ন দেখেছে মুনিমা। কালো সাহেবের অত্যাচারে যখন কান্না পেতো, ভেঙে যেতো বুকের ভিতরটা, তখন কল্পনা করতো সে ইরুলকে। যেন তার হাত ধরেছে সে এসে। বলছে—ভয় কী? আয়, চলে যাই। ছুটে চলে যাই। কে জানে, ক্রমাগত ছুটে চলার নেশা এমন করে তার রক্তে ঢেলেছিল কে! সেই দশ বছর বয়সে, যা কারুর করার কথা নয়, তাই তারা করে বসেছিল। সমস্ত ভয় আর শাসন উপেক্ষা করে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে চলা।

আর আজ? বড়ো স্বামীর বাহুবন্ধনে ঝরঝর করে কেঁদে ফেলে সে একসময়। চমকে ওঠে বড়ো স্বামী—একি! কী হলো?

বিরক্ত হয়ে ওর হাতটা সরিয়ে দেয় মুনিমা। ঠিক যেন ইরুল। বিচক্ষণ, প্রবীণ ইরুল। উপদেশ অনুরোধ আর অযাচিত স্নেহ দিয়ে তার অশান্ত মনটাকে মিছিমিছি শান্ত করতে চায়, কিন্তু পারে না।

পরদিন ছুটে যায় খুব ভোরবেলায় সে দিশার সঙ্গে—একেবারে টেনে নিয়ে সেই পাহাড়ের পথে। নীচে ভয়াবহ খাদ—মাথার ওপরে উত্তুঙ্গ পাহাড়। বলে—বাঁশী বাজা তুই, আমি নাচি।

কিন্তু জামা খুলে খাটো শাড়ি পড়লেই কি খাঁটি টোডা-মেয়ে হওয়া যায়? রেভারেণ্ড কুমারস্বামী সামান্য লেখাপড়া শিখিয়েছিলেন, চা-বাগানে আর উটকামণ্ডের নানান লোকের সঙ্গে মেশবার ফলস্বরূপ নানান অভিজ্ঞতার আস্তরণের নিচে কোথায় চাপা পড়ে গেছে তার মধ্যে সেই টোডা-মেয়ের আদিম মন, তার সন্ধান কে দেবে!

সেই একই একঘেয়ে সুরে বঁশী বাজায় দিশা; বলে—কই, নাচ্?

—পারছি কই?

—আয়, তোকে শিখিয়ে দি। সামনে আমাদের পরব। সেদিন মোষ মারা হবে, বাদাগারা আসবে, কোটারা আসবে, ইরুলরাও আসবে সম্বর-হরিণ কাঁধে নিয়ে, সারারাত চলবে খাওয়া দাওয়া, গানবাজনা আর নাচ। তোকেও নাচতে হবে।

কিন্তু, কতক্ষণ? পাহাড়ের সেই বিপজ্জনক বাঁকটা ছেড়ে দিয়ে ওরা দুজনে চলে গেল সেই ঝরনার ধারে। গানও জমে না, নাচও জমে না। দিশাকেও মনে হচ্ছে ইরুলের মতো—যে কিছু দাবি করতে জানে না, জোর করে কিছু পেতে চায় না, শুধু একটু সঙ্গ পেলেই যে খুশী। দিনান্তে একবার চোখের দেখা পেলেই হলো—দিশাকে দেখতে দেখতে মনে হচ্ছিল, এক্ষুনি সে ইরুলের প্রতিধ্বনি করে ঐ কথাই বলে বসবে। হঠাৎই উঠে পড়লো মুনিমা।

—কী হলো?

বিরস মুখে মুনিমা বললে—ঘর চল্।

পরবের আয়োজন শুরু হয়ে গেল টোডা-গাঁয়ে। সারারাত ধরে গান-বাজনা-নাচের মরসুম পড়লো বলে। কিন্তু কিছুতেই উৎসাহিত হয় না মুনিমা। বড়ো স্বামীকেও ভালো লাগে না, দিশাকেও

লাগে না। ওরা যেন দুজনেই ইরুল। ইরুলের দুটি বিভিন্ন রূপ। ভালো লাগে—তার সত্তার প্রতিটি অণুপরমাণু দিয়ে ভালো লাগে—আজকাল ছোট্ট তিসৃস্থকে। ছোট্ট তিসৃস্থও ইরুলের অন্য এক রূপ—সেই ছোটো-বয়সের দশ বছ রর ইরুল যে ও!

ওকে কোলে নিয়ে এক এক সময় আদরে-আদরে অস্থির করে তোলে মুনিমা; বলে—আমি মরে যাবো তিসৃস্থ।

দুটি নিষ্পাপ শিশুচোখ তুলে তার দিকে বড়ো-বড়ো করে তাকায় তিসৃস্থ; বলে—কেন?

—অতো 'কেন-কেন' করিস না। তুইও ওদের মতো করবি?

কী ভেবে যেন হেসে ফেলে তিসৃস্থ, তারপরে দুহাতে ওর গলা জড়িয়ে ধরে বলে—বউ!

সমস্ত শরীরটা যেন শিরশির করে ওঠে ওর এই মিষ্টি করে 'বউ' বলে ডেকে ওঠায়। ওকে প্রাণপণে দুহাতে জড়িয়ে ধরে মুনিমা বলে—আবার ডাক্।

—বউ?

—আরো—আরো। অনেক বার।

ও যেন তিসৃস্থ নয়—ও যেন তার সেই হারিয়ে-যাওয়া দশ বছর বয়সের স্বপ্ন।

ফিসফিস করে তিসৃস্থ বলে—যাবি?

ফিসফিস করা স্বরেই সাড়া দেয় মুনিমা—কোথায়?

তিসৃস্থ বলে—ঐ বড়ো পাহাড়ের চূড়োটা পেরিয়ে—

—তারপর?

তিসৃস্থ বলে—বাদাগাদের মাঠ পেরিয়ে পাহাড়ের রাস্তায় উঠে অনেক উঁচুতে, রাস্তার একটা বাঁকে—সেই যে নিচের দিকে তাকালে মাথা ঘুরে যায়—সেখানে একটা চ্যাপ্টা লাল পাথরের ওপর রোজ বিকেলে গিয়ে একা একা বসে থাকে ইরুল।

রুদ্ধশ্বাসে প্রশ্ন করে মুনিনা—তুই কী করে জানলি?

—জেনেছি।

—কী করে? আমায় বলবি না?

ওর কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিসফিস করে তিস্‌স্থ বলে—কাউকে বলবি না তো?

—না।

—তাহলে শোন্। আমি না, পরশুদিন লুকিয়ে লুকিয়ে ইরুলের পিছন-পিছন গিয়েছিলাম। কেউ আমাকে দেখতে পায়নি।

—ইরুলও না?

—না।

—দিশাও না?

—দাদারা কেউ না, বাবাও না। দেখলে কী হতো?

—জানিস্ না?

—না।

—টিয়েকজ্রির কাছে পুজো দিতে হতো। ছোটোদের পাহাড়ে যাওয়া বারণ।

—কে বললে?

—আমি জানি। ঐদিকে বাদাগাদের গাঁও পর্যন্ত আমরা যেতে পারি, তার বেশী গেলেই পাপ হবে।

পনেরো বছর আগেকার দিনগুলিকে মনে পড়লো মুনিমার। পাপ যে হয়, সে তো তারাও জানতো। তবু যেতে চাইতো। ইরুল বলতো—আয় আয়, চল্।

আজও রাত্রে, ঘুমের ঘোরে চমকে চমকে ওঠে মুনিমা। সেই দশবছরের ছেলেমানুষ ইরুল যেন আজও ডাকছে—আয় আয়, চল্।

কিন্তু, এক এক সময় নিজেরই ওপর অসীম বিরক্তিতে মন ভরে যায়। কেন? এতো ছুটে চলার নেশাই বা কেন? মেয়ে হয়ে—এক সংসারের বউ হয়ে—কেন তার এই গণ্ডীর বাইরে যাবার নিষিদ্ধ আকর্ষণ? এ কী অদ্ভুত মন তার! এ কী জ্বালায় জ্বলছে সে

অনুক্ষণ! আর কোনো মেয়ে তো এমন করে না! হাসিমুখেই তো ঘর করছে তারা। তবে? তার কেন এমনটি হল? কে বলে দেবে? যে বলতে পারত, তার কাছে যাওয়া তো দূরের কথা, তার মুখখানাও দেখতে ইচ্ছা করে না। সেই পনেরো বছর আগেকার ছোট্ট ছেলেটিকে সে যেন গ্রাস করে বসে আছে।

—বউ!

দুহাতে তার গলা জড়িয়ে ধরলো এসে তিসৃসু।

যাকে সে অতো ভালোবাসে, যাকে না দেখলে তার মনটা অস্থির-অস্থির করে, হঠাৎ সেই তিসৃসুকেই দুহাতে ঠেলে দেয় মুনিমা; বলে—সরে যা। এখন বিরক্ত করিস না।

চুপচাপ কিছুক্ষণ অদূরে দাঁড়িয়ে থাকে তিসৃসু পাথরের খণ্ডের মতো। তারপরে এক সময় পায়ে-পায়ে আবার কাছে আসে সে মুনিমার; বলে—আমি জানি।

—কী?

হঠাৎই তিসৃসু বলে ফেলে—ইরুলের সঙ্গে দেখা না হলে তোর মন ভালো থাকে না।

তড়িৎস্পৃষ্টবৎ উঠে দাঁড়ায় মুনিমা—কে বললে তোকে?

কৌতুকে হাসি-হাসি মুখে বলতে থাকে তিসৃসু—আমি জানি। দাদারা বলাবলি করছিল নিজেদের মধ্যে।

—কী বলছিল?

—ইরুলকে ঘরে ডেকে আনবার কথা।—বলতে বলতে ওর খুব কাছে এসে দাঁড়ায় তিসৃসু, ওর হাতটা ধরে বলে—বউ?

সুপ্তোত্থিতের মতো ব'লে ওঠে মুনিমা—উঁ?

—আমি ডেকে আনবো ইরুলকে? বিকেল হয়ে এলো। ঐ দেখ্‌ না পাহাড়ে-পাহাড়ে বনে-বনে কেমন ছায়া পড়ে এসেছে। ও নিশ্চয়ই গেছে সেই পাহাড়ী রাস্তায়, সেই খাদের ধারে চ্যাপ্টা লাল পাথরটার কাছে। যাব?

দুহাতে ওকে মুহূর্তে জড়িয়ে ধরে মুনিমা, টেনে নেয় কোলের কাছে, কান্নায় অবরুদ্ধ কণ্ঠে কোনোক্রমে বলে—কাকে ডাকবি? সে কি আর বেঁচে আছে? মরে গেছে রে, একেবারে মরে গেছে!

ওর কথা কিছুই বুঝতে পারে না তিস্সু, তার অবাক হওয়া বড়ো-বড়ো দুটি চোখ মেলে তাকিয়ে থাকে মুনিমার দিকে। ডাকে, বউ? তুই কাঁদছিস্!

—না।—চোখ মুছতে মুছতে মুনিমা বলে—কাল পরব, না রে?

—হ্যাঁ।—পরবের কথায় মুহূর্তে উৎসাহিত হয়ে উঠে তিস্সু বলে—কাল রাতে কতো গান, কতো নাচ! তুই নাচবি তো?

—আমি নাচলে তুই খুশী হবি?

—হ্যাঁ।

—না।—মুনিমা বললে—যারা খুশী হবার হোক, তুই হোস না। তোর বউ কারুর সঙ্গে নাচবে না, কারুর সঙ্গে কথা বলবে না, শুধু গল্প করবে সারারাত তোর সঙ্গে। তোকে আমি ঐ পাহাড়ের গল্প করব। ঐ পাহাড়ের চূড়োটা পেরিয়ে—

—মুনিমা!—যেন মুহূর্তে বজ্রপাত হলো ঘরের মধ্যে। প্রচণ্ড চমকে কেঁপে উঠলো মুনিমা। দরজা পেরিয়ে একেবারে ঘরের মধ্যে এসে পড়েছে ইরুল।

—দিশা আমাকে ডেকে নিয়ে এলো।

—কেন?

অল্প একটু হেসে ইরুল বললে—তোর নাকি মন ভালো নেই, তুই নাকি লুকিয়ে লুকিয়ে কাঁদিস!

—কে বললে!—মুনিমা বলে—আমার মনের খবর জানালো কে এতো?

—কেন? তোর স্বামীরা?

—খুব জেনেছে তারা!—মুনিমা বলে—কিন্তু তুমি এলে কেন এমন করে?

—দেখা করতে। দেখা তো পাই-ই না।

তীব্রস্বরে বলে উঠলো মুনিমা—পেতে হবে না দেখা। যাও এখান থেকে। এখুনি যাও।

—তাড়িয়ে দিচ্ছিস?

—হ্যাঁ হ্যাঁ, তাই দিচ্ছি।—মুনিমার কণ্ঠ আবেগে রুদ্ধ হয়ে যায়,—তুমি যাবে কিনা?

রুদ্ধবাক চুপচাপ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে ইরুল, তারপর ধীর কণ্ঠে বলে—যাচ্ছি।

বলেই আর দাঁড়ায় না, দ্রুত পায়ে ঘর থেকে বেরিয়ে আসে তাড়াতাড়ি ইরুল।

—বউ?

দু হাত বাড়িয়ে ওকে বুকে টেনে নেয় মুনিমা; বলে—তিসৃস্থ, তুই কিন্তু ওর মতো বড়ো বয়সে এ রকম বাঁধা পড়ে থাকবি না। যে যতই মারুক, তুই বুক টান করে সোজা হাঁটবি। চলে যাবি ঐ পাহাড়টা পেরিয়ে—ঘুরবি এ দেশ থেকে ও দেশ—

ওকে থামিয়ে দিয়ে তিসৃস্থ বললে—ঠিক বলছ?

—কী?

—পাহাড়ের ওপারে ভালো দেশ আছে?

—আছে। ভালো মানুষও আছে। আমি খুঁজে পেলাম না। কিন্তু তুই ত খুঁজবি ইরুল! তোর কি এভাবে চুপ করে এক জায়গায় বসে থাকা সাজে? আমি যে তোকে এমন ভাবে দেখতে চাই না—কোনোদিন চাইওনি।

তিসৃস্থ অবাক হয়ে বললে—আমাকে ইরুল বলছ কেন?

একটুক্ষণ ওর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থেকে মুনিমা বলে—তাই ত রে! বড্ড ভুল হয়ে যায়।

পরবের দিন। যতো বেলা পড়ে আসে, উৎসবের তত ঘটা।

আজ সমস্ত বিধি-নিষেধ শিথিল। টিভালিয়ল টারথারল সব একাকার। অরণ্যের দিক থেকে ছু-একজন ইরুলা সত্যিই আসে সম্বর-হরিণ বিক্রি করতে। আর আসে কোটারা, বাদাগারা।

লাল টকটকে একটা শাড়ি তাকে এনে দিয়েছে বড়ো স্বামী। দিশা বললে—এই কাপড় পরে আজ তোকে আমার সঙ্গে সারারাত নাচতে হবে বউ, বুঝলি ?

ওদেরও দেশী প্রথায় তৈরি করা মদ আছে। সেই মদ্যপান মধ্যাহ্ন থেকেই চলেছে সারা গাঁয়ে। তিস্‌সু বললে—খাবি বউ ?

নাক টিপে কোনোক্রমে তা পান করে মুনিমা। গলা দিয়ে যেন এক অগ্নিস্রোত নেমে যায়। দিশা ছুটে আসে, বলে—একেবারে অমন করে খেতে নেই, ভীষণ নেশা হবে।

মুনিমা তিস্‌সুকে জড়িয়ে ধরে বার বার বলতে থাকে—ইরুল—আমার ইরুল! তুই যা, পাহাড় পেরিয়ে তুই চলে যা। ফিরে এসে অন্তত এই খবরটি আমায় দিস যে, ভালো লোক এখনো সংসারে আছে। সেই কালো সাহেব আর চা-বাগানের সেই পশু-গুলো ছাড়াও লোক আছে দেশে, যারা আজও মানুষকে স্নেহ করতে জানে, ভালোবাসতে জানে, জংলী বলে দূরে ঠেলে রাখতে চায় না, বা জংলী বলেই টোডারা যে মানুষ নয়, এ কথাটা বিশ্বাস করতে চায় না। ওরা আমাদের ওপর অনেক অত্যাচার করেছে রে, আমার বাচ্চা ছেলেটিকে পর্যন্ত মাটির মুখ দেখতে দেয়নি।

দিশা এসে ওকে তুলে ধরে—ইশ! ভয়ানক নেশা হয়েছে দেখছি! আয়, নাচের আসরে আয়, মেয়েদের সঙ্গে নাচবি।

সন্ধ্যার সঙ্গে সঙ্গে মশাল জ্বলে উঠেছে সারি সারি। লম্বা ধরনের ঢোলের মতো বাজনা আর বাঁশী, আর বিচিত্র লতা-পাতা, পাখীর পালক আর মোষের শিং মাথায় কাপড় দিয়ে বাঁধা পোশাকের মানুষগুলো। সত্যিই অদ্ভুত নেশায় যেন আচ্ছন্ন করে ফেলে মুনিমাকে। তিস্‌সুকে জড়িয়ে ধরে বলে—ইরুল, ইরুল কই ?

সারা আসরে ইরুলকে কেউ দেখতে পায়নি। তিসৃস্থু বলে—আমি দেখছি বউ।

—না, তুই যাস না।—মুনিমা ওর হাতটা চেপে ধরে, তারপরে ওর গালে নিজের গাল দৃঢ়ভাবে সংলগ্ন করে আবেগ-কম্পিত কণ্ঠে বলতে থাকে—এই ত, এই ত আমার ইরুল!

কিন্তু তিসৃস্থুর মনে আজ জাগে অন্য এক ভাব। বার বার তার আজ মনে হয়, বউ তাকে ভালোবাসে না—কোনওদিন ভালোবাসেনি। বউ চায় ইরুলকে—শুধু ইরুল আর ইরুল!

টোডাদের দশ বছরের ছেলের মনেও অদ্ভুত ভাব জাগে,—আসুক না ইরুল। বউ ভালোবাসুক না ইরুলকে, তাতে হয়েছে কী? আসলে বউ তো রইল তাদেরই হয়ে, তাদেরই ঘরে?

নাচতে নাচতে সত্যিই জাগে অদ্ভুত প্রমত্ততা। আদিম টোডা নারীই যেন জেগে ওঠে মুনিমার মধ্যে। টোডাদের নিয়ম অনুসারে মাত্র তিন চার বছর বয়সেই শিশুকালে যাদের হয়ে যায় 'ম্যাট্‌স্থুনি' অর্থাৎ বিয়ে—যৌবনে পা দিয়েই যারা আসে পূর্ব-নির্ধারিত স্বামী-ঘর করতে, বহুপতিত্বের বন্ধনে নিজেকে বিলিয়ে দিয়ে সহজভাবেই জীবন কাটিয়ে দেয়, মানসিক তেমন গভীর কোনো সমস্যাই বোধ করে না—দাম্পত্যজীবনের কোনো নিদারুণ মানসিক সংঘাতই বাজে না যাদের মধ্যে—ঘর করে, হাসে, কাঁদে,—পরব উপলক্ষে মিলিত নৃত্যসভায় উদ্দাম হয়ে নাচে!

দু হাতে দিশাকে টেনে নিয়ে একটা টিলার আড়ালে গিয়ে বসে মুনিমা। পূর্ণিমা চাঁদের উদ্ভাসিত জ্যোৎস্নায় নীলগিরির টোডা-উপত্যকা এক অপরূপ স্বপ্নরাজ্যের মতোই প্রতিভাত হয়।

কতো পল, অনুপল, দণ্ড কেটে যায় কে জানে, হঠাৎ চৈতন্য হয় সমস্ত টোডা পল্লীর। নিচে থেকে বাদাগাদেরই একটি লোক এসে দিয়ে যায় দুঃসংবাদটা। সেই পাহাড়ী পথের বিপজ্জনক

বাঁকের মুখে সেই যে চ্যাপ্টা লাল পাথর, তারই কাছে ঘটেছে এই শোচনীয় দুর্ঘটনা। আকস্মিক, অভাবনীয় শোকে নিথর নীরব হয়ে যায় মুহূর্তের সমস্ত টোডা গাঁওয়ের লোকেরা।

ওরা দুজনে বুঝি টের পায়নি, টিলার বুকে মাথা এলিয়ে দুজনে চুপচাপ শুয়ে ছিল পাশাপাশি।

খুঁজতে খুঁজতে সমস্ত দলটা এসে দাঁড়ায় ওদের মুখোমুখি। শত শত টোডা। সেই চ্যাপ্টা লাল পাথরের তলাকার খাদের নীচ থেকে রক্তাপ্লুত নিষ্প্রাণ দেহটা দু হাতে বয়ে নিয়ে এসে ওদের দুজনের সামনে যখন দাঁড়ায় বড়ো স্বামী,—মুনিমা সব কিছু লক্ষ্য করে কেমন যেন বিহ্বল হয়ে যায়,—এ যেন অবিশ্বাস্য কোনো এক নিদারুণ দুঃস্বপ্ন মূর্তিমান হয়ে তার সামনে উপস্থিত হয়েছে। একি কখনো হতে পারে! অসম্ভব। তার সামনে অনর্থক একটা বিভীষিকার সৃষ্টি করে টিয়েকজ্রি দেবী তাকে ভয় দেখাচ্ছেন।

তার সামনে কাপড়ে মোড়া মৃতদেহটা সাজিয়ে রেখে হাঁটু গেড়ে বসে আছে বড়ো স্বামী। আশেপাশে বসে আছে আরও কে কে যেন। আর সমস্ত লোক চিত্রার্পিতের মতো দাঁড়িয়ে আছে—নিশ্চুপ—নিশ্চল। কত দূরে কোথায় যেন একটা রাতজাগা পাখী ডাকছে, কোথা থেকে যেন ভেসে আসছে কোনো এক গিরিনন্দিনী ঝরনার কলস্বর। কিন্তু কী হলো মুনিমার? তার মনে হচ্ছে, দুরন্ত নেশায় সে এখনো আচ্ছন্ন, দুরন্ত নেশাই তার চোখে এঁকে দিচ্ছে বিভীষিকা,—প্রচণ্ড ভীতি—দুর্দমনীয় আতঙ্ক! অকস্মাৎ তীব্র তীক্ষ্ণ একটা চীৎকার করে সেই মৃতদেহের ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে মুনিমা, বুকফাটা আর্তনাদ করে ওঠে—ইরুল, আমার ইরুল!

মুহূর্তে গুঞ্জন ওঠে সমস্ত দলে। কোথায় ইরুল? কাকে ও ডাকছে ইরুল বলে? ভিড় ঠেলে এতক্ষণে সত্যিই সামনে এসে দাঁড়ায় ইরুল—কোথায় সে যে ছিল সারা সন্ধ্যা কে জানে!

—এই যে আমি।

ধীরে ধীরে তার দিকে মুখ তুলে তাকালো মুনিমা, তারপরে উঠে দাঁড়ালো এক প্রেতিনীর মতো, কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বলে উঠলো—কে মেরেছে আমার ইরুলকে !

—ইরুল নয়, ও তিস্‌সু।

ওদের গাঁও-বুড়োই বোধ হয় উত্তর দেয়—মেরেছেন স্বয়ং টিয়েকজ্রি। ছোটো ছেলেদের পাহাড় পেরুনো বারণ।

বাদাগাদের যে-লোকটি এনেছিল দুঃসংবাদ বয়ে, সে প্রতিবাদ করে বলে ওঠে—না না, পা পিছলে পড়ে গেছলো খাদের মধ্যে।

—কিন্তু ওখানে ও একা গিয়েছিল কেন ?

—শয়তানের ডাকে।

—না।—বজ্রকণ্ঠে চীৎকার করে ওঠে ইরুল ; বলে—কেউ জানো না, আমি ওকে মেরেছি।

সমস্ত দলের মধ্যে দেখা দেয় মুহূর্তে তীব্র এক উত্তেজনা। রুখে দাঁড়ায় মুনিমার বৃদ্ধ শ্বশুর, রুখে দাঁড়ায় বড়ো স্বামী—মারমুখো হয়ে তেড়ে যায় দিশা।

গাঁও-বুড়ো থামিয়ে দেয় সকলকে। মানুষ খুন করা টোডাদের রীতি নয়।

টিভালিয়লদের গাঁও-বুড়ো বলে—সব মিথ্যে। ইরুল সারাটা বিকাল থেকে চুপচাপ তার ঘরে বসে। ও আজ বাইরেই বেরোয়নি।

অন্য সবাই সহজেই সেটা বিশ্বাস করে, কিন্তু মুনিমা নয়। তাকে কেউ ঠেকাতে পারে না। হিংস্র আদিম নারীর মতোই সে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লো ইরুলের ওপর, দুটি দৃঢ় হাতে ওর গলা টিপে ধরে উন্মত্তের মতো বলতে থাকে—কেন মারলি আমার ইরুলকে—কেন মারলি !

বড়ো স্বামী আর দিশা মিলে কোনোক্রমে ছাড়িয়ে নিয়ে আসে নেশাচ্ছন্ন নারীকে। আকুল হয়ে সে কাঁদতে থাকে, পাগলের মতো সে নিজের মাথা ঠুকতে থাকে টিলার পাথরের ওপরে।

টিঙালিয়লদের গাঁও-বুড়ো ইরুলকে একান্তে ডেকে নিয়ে গিয়ে বলে—কেন মিছিমিছি নিজের ঘাড়ে টেনে নিলি সব দোষ!

—মিছিমিছি নয়।—ইরুল দীর্ঘশ্বাস ফেলে উত্তর দেয়—আমি রোজ বিকেলে ওখানে গিয়ে বসি, অনেক রাত অবধি ওখানেই এক-একদিন আমার কেটে যায়। তিস্‌সু তা জানতো। ও বোধ হয় আমাকেই আজ ওখানে খুঁজতে গিয়েছিল একা-একা। আমি যদি রোজকার মতো আজও ওখানে থাকতাম, তাহলে এ দুর্ঘটনা ঘটতো না।

—ও তোকে একা-একা খুঁজতে গিয়েছিল কেন? কেউ কি ওকে পাঠিয়েছিল?

—না।

—তবে?

—ও নিজেই গিয়েছিল।

—কেন?

এই 'কেন'র উত্তর দিলো না ইরুল। সে জানে তার হিসাবে ভুল হয়ে গেছে। পনেরো বছর পরে 'সভ্য' মেয়েকে তার পূর্বতন সংস্কারের সীমান্তে ফিরিয়ে আনা যায়,—মিলিয়ে দেওয়া যায় না, মিশিয়ে দেওয়া যায় না।

কিন্তু এটাও কি সত্যি? কিছুদিন পরে, জলাশয়ে বুদ্বুদ উঠে আবার মিলিয়ে যাবার মতো সব-কিছু যখন স্থির হয়ে গেল আগেকার মতো, তখন একদিন সকালে হঠাৎই মুনিমার ঘরে এলো ইরুল। স্তম্ভিত পুত্তলিকার মতো চুপচাপ বসে ছিল মুনিমা একা। ইরুল বললে—যাবে? ঐ পাহাড়টা পেরিয়ে—

যেন ইরুল নয়, তিস্‌সুই কথা বলছে। সর্বাঙ্গে শিউরে উঠে মুনিমা বললে—কোথায়!

—শহরে। আবার পালিয়ে। দুজনে।

তড়িৎস্পৃষ্টের মতো উঠে দাঁড়ালো মুনিমা, ধারে কাছে কে [illegible] কিনা লক্ষ্য করে সাগ্রহে ঈষৎ চাপাস্বরে প্রশ্ন করলো—কখন [illegible]

—ঠিক সন্ধ্যায় আসব। তৈরি থেকো।

দ্রুতপায়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যায় ইরুল। সেই দিকে [illegible] থাকতে থাকতে ঝড় ওঠে মুনিমার মনে—কিন্তু সে কোথায়? কোথায় তার সেই দুহাতে গলা জড়িয়ে ডাকা—বউ?…ব[illegible]

তাই, সন্ধ্যায় এসে মুনিমার কোনো সন্ধানই পায় না [illegible] শুধু পথ চলতে চলতে সেই ঝরনার কাছ থেকে শুনতে পা[illegible] [illegible] সেই পরিচিত বাঁশীর সুর, আর ঝরনারই মতো কোনো [illegible] নারীর প্রমত্ত কলকাকলি।

শৈলশিখরের অন্য সীমান্তের দিকে লক্ষ্য রেখে একাই এবার পথ চলতে থাকে ইরুল, একটা জিজ্ঞাসার গুঞ্জনকে বারংবার এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করে। এবারেও কি তার বোঝবার ভুল হলো মুনিমার মনকে?…

* * * *

বিম্বু, সুঞ্জা, পিনি, 'বন্ধু', ইরুল—এরা যেন অমোঘ কোনো নির্দেশের ধারা, যুগের পর যুগ ধরে এরা আসে, আর সৃষ্টি করে যায় একই ইতিহাস। টুরা, পিলুবাণী, মুনিমা—এরাও তাই। এরা ইতিহাস সৃষ্টি করে, ইতিহাসও এদের সৃষ্টি করে। এই বিবর্তনের মধ্য দিয়ে এটুকুই চরম সত্য—সভ্যতার সীমান্তে দাঁড়িয়ে ওরা ওদের শিবির রক্ষা করে চলেছে আজও। আবার আসবে টুরা, পিলুবাণী, মুনিমার দল, আবার আসবে বিম্বু, 'বন্ধু', পিনি, ইরুল, তিস্সুর দল, আবার হাসবে, কাঁদবে, স্বপ্ন দেখবে—আর রক্ষা করে চলবে ওদের শিবির। ওদের পরাভূত করবে সাধ্য কার?

সমাপ্ত